সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২

২৩-২৯ জুলাই

নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২
২৩-২৯ জুলাই

নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মাহবুবুল হক	মহাপরিচালক	উপদেষ্টা
মাসুদ আরা মনি	উপপ্রধান	সভাপতি
মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী	উপপ্রধান	সদস্য
মনিষ কুমার মন্ডল	উপপ্রকল্প পরিচালক	সদস্য
ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোহাম্মদ শরীফুল আজম	উপপ্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ আজিবুর রহমান	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. রাজু আহমেদ	সহকারী পরিচালক	সদস্য
এস এম আবুল বাসার	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ চৌধুরী	উপপ্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
তনুয় কুমার দাশ	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মাহবুব উল হক	সহকারী পরিচালক	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর

প্রকাশকাল
জুলাই ২০২২

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মঈন রুমি

প্রচার সংখ্যা
১০,০০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ ও অলংকরণ
Kinsman Printers
54, Fakirapool, Motijheel, Dhaka-1000
ইমেইল: colorreflections.bd@gmail.com
ফোন: ০১৬২৫৫৭০৯৬০

Citation: DoF2022. National Fish Week 2022 Compendium (*in Bangla*). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 160p.

'আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ, এই দিন আমাদের থাকবে না'।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

'মাছ হচ্ছে সবথেকে নিরাপদ খাদ্য'।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

০৯ শ্রাবণ ১৪২৯
২৪ জুলাই ২০২২

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের সুচিন্তিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাঙ্ক্ষিত প্রণোদনা প্রদান, কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতকরণ এবং চাষি ভাইদের প্রযুক্তি নির্ভর চাষ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত মাছের মোট পরিমাণ ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন যা মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ২৬.৫০ শতাংশ। মৎস্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ সারাবিশ্বে আলোচিত ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরও দৃঢ় ও স্বনির্ভর করার পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২৩-২৯ জুলাই দেশব্যাপী 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২' উদযাপিত হতে যাচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি মৎস্যপণ্যের রপ্তানি প্রসারেও মৎস্য অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্মত মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান বাস্তবায়ন, খামারে গুড অ্যাকুয়াকালচার প্র্যাকটিস প্রবর্তন, ভ্যালু চেইনে জিএইচপি, হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি ইত্যাদি মাধ্যমে মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং রপ্তানিতব্য পণ্যের মান যাচাইয়ে তিনটি অ্যাক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

মাছ ও চিংড়ি চাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারক, সম্প্রসারণ কর্মী, পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক এবং মৎস্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পেশাগত ও ব্যবহারিক কাজে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী এ সংকলনটি সংগ্রহের জন্য জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনের প্রাক্কালে তাঁরা আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে থাকেন। এ মূল্যবান সংকলনটি যাঁদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে আমরা তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে স্থানাভাবে কিছু লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি, এমনকি কিছু লেখা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিগত সময়ের ন্যায় সংকলনটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ প্রকাশনার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের মৎস্যসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়নে সকল উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণকর্মী, মৎস্যবিজ্ঞানী, উন্নয়ন সহযোগী, মৎস্যচাষের সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবো- 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২' উদযাপনের সন্ধিক্ষণে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

খঃ মাহবুবুল হক

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের রূপায়ন : দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মৎস্যখাতের সাফল্য ২১
থঃ মাহবুবুল হক

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট : গবেষণায় সাম্প্রতিক অর্জন ৩১
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর কার্যক্রম ৩৮
মোঃ হেমায়েৎ হুসেন

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্যসম্পদের মজুদ এবং ব্যবস্থাপনা ৪৫
ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন, সাইদুর রহমান চৌধুরী ও মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি ৪৯
ড. মোহ্যা সাইনার আলম

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প : ইলিশ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন প্রেক্ষিত ৫৪
মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী, মোঃ মাহবুবুর রহমান ও মোছাঃ শিরিন শীলা

দেশি মাছের বিলুপ্তি : বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ৬০
ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শহ

ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা সরকারি-বেসরকারি হ্যাচারিতে কার্প জাতীয় মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন ৬৪
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার, ড. মোহাম্মদ মতিউর রহমান ও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

মৎস্যখাতে খাদ্য নিরাপদতা বিধানে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও অর্জনসমূহ ৬৭
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া

ইলিশ পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম এর অবদান ৭২
ড. মোঃ জলিলুর রহমান ও ড. মোঃ নাহিদুজ্জামান

মৎস্যখাত যান্ত্রিকীকরণে এনএটিপি-২ প্রকল্পের এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড এর সফল ব্যবহার ৭৫
এস এম মনিরুজ্জামান ও শিলা রায়

মৎস্য বর্জ্য : সম্ভাবনাময় মূল্যবান সম্পদ ৮০
ড. কাজী আহসান হাবীব, মোহাম্মদ রাশেদ ও মোঃ মাসুদ রানা

মৎস্যখাদ্যে এনজাইমের ব্যবহার : বর্তমান প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা ৮৪
ড. এস এম রফিকুজ্জামান, নাজিয়া তাসনিম ও মোঃ হাবিবুর রহমান

গলদা চিংড়ি হ্যাচারির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : সেফটি-উইন্নরক এর উদ্যোগ ৮৮
Sukumar Biswas and Dr. Mohammad Mokarrom Hossain

এসপিএফ হ্যাচারিতে উৎপাদিত হাই হেল্‌থ পিএল : জৈব-নিরাপদ চিংড়ি নার্সারির গুরুত্ব ৯২
Aung Kyaw Mra

সূচিপত্র

মাছসহ সকল জলজ প্রাণীতে অ্যান্টিবায়োটিকের দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ ব্যবহার ৯৫
সুজিত কুমার চাটার্জী ও মুহাঃ নওশের আলী

বাংলাদেশে সী–উইড হতে জৈব-উপাদানের আহরণ সম্ভাবনা এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার ৯৮
ড. মোঃ মহিবুল্লাহ, ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আবছার খান

বাগদা চিংড়ির ডিএনএ বিশ্লেষণ : পপুলেশনের গঠন ও এর ব্যবস্থাপনা ১০১
ড. এম এম মাহবুব আলম

বটম ক্লিন রেসওয়ে : আধুনিক মাছ চাষে নব দিগন্তের সূচনা ১০৫
জয়দেব পাল

আপেল শামুক চাষের সম্ভাবনা, প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা ১০৮
মোঃ শরিফুল ইসলাম, রাখি দাশ ও নিলুফা বেগম

ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিট্রোফিক অ্যাকুয়াকালচার : মাছ চাষের একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি ১১২
সঞ্চিতা জামান চৌধুরী, ড. এ. এফ. এম. হাসানুজ্জামান ও ড. খন্দকার আনিছুল হক

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং, কন্ট্রোল এবং সার্ভিল্যান্স ১১৫
ড. মোঃ আব্দুল আলীম, ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম ও বিপুব দাস

জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা : টেকসইকরণের দায়িত্বশীল পদচারণা ১১৮
ড. উম্মে কুলসুম, সমীর কুমার সরকার ও ড. আবুল হাছানাত

ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম : নিরাপদ এবং রোগমুক্ত মাছ উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ার ১২১
মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ চৌধুরী ও মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ, নিবৃত্তি ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ১২৪
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী, আ.ন.ম. নাজিম উদ্দিন ও শওকত কবির চৌধুরী

জলাভূমি সম্পদের সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা ১২৯
মোঃ আবুল হাসেম সুমন ও মোঃ তৌহিদুর রহমান

ক্ষুদ্রচাষি ক্লাস্টার : নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে টেকসই উদ্যোগ ১৩৩
সরোজ কুমার মিস্ত্রী ও মনিষ কুমার মণ্ডল

মেটাজিনোমিক্স : অ্যাকুয়াকালচার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি উদীয়মান প্রযুক্তি ১৩৮
নুসরাত জাহান পুনম, শাওন আহম্মেদ ও ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান

মাছচাষে ভারীধাতু দূষণ এবং জলজ পরিবেশ, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব ১৪১
মোঃ শাফিউজ্জামান, আনোয়ার হোসেন ও শংকর চন্দ্র মন্ডল

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ ১৪৩

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১৪৯

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের রূপায়ন : দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মৎস্যখাতের সাফল্য

Bangabandhu's Dream : Irresistible Development of Fisheries Sector

খাঃ মাহবুবুল হক

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেই স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আস্থার সাথে ঘোষণা করেছিলেন- 'আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ, এই দিন আমাদের থাকবে না'।

সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন। উল্লেখ্য, ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন। কাজেই ৫ দশকের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ছয় গুণ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অনস্বীকার্য। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মৎস্যখাত অন্যতম অংশীদার।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ শীর্ষক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, স্থায়িত্বশীল নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও সর্বোত্তম উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সংবেদনশীল অঞ্চলে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল আহরণ, সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা বিকাশে সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণ, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল আহরণ, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণ এবং মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি: মৎস্যখাতের ভূমিকা

দেশের মোট জিডিপির ৩.৫৭ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপি'র ২৬.৫০ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি আয়ের ১.২৪ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। মৎস্যখাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.৭৪ শতাংশ। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১)। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০১৬)। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশের অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।

মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বপরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'The State of World Fisheries and Aquaculture ২০২২' প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান ধরে রেখে বিগত ১০ বছরের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান গত ছয় বছরের মতোই ধরে রেখেছে। পাশাপাশি বিশ্বের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১২তম স্থান অধিকার করেছে। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

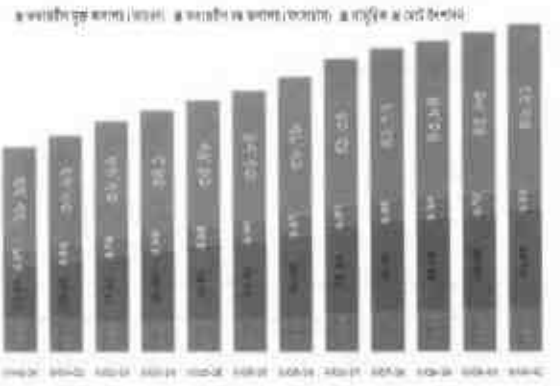

চিত্র: বিগত ১২ বছরে খাতওয়ারী মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন)

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মৎস্য অধিদপ্তরকে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৩'-এ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্যসমূহ

মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট হলো মৎস্য, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ সম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা। মৎস্য সেক্টরের এই কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ চাহিদার বিপরীতে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৫০.৯১ শতাংশ বেশি হয়েছে। বর্তমান সরকারের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কৈ, পাবদা, গুলশা ও শিং-মাগুর মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

ইলিশ আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.২২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে।

দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক এবং একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। 'বাংলাদেশ ইলিশ' শীর্ষক ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ আহরণকারী বাংলাদেশ এখন থেকে বিশ্বে

চিত্র: বিগত ১২ বছরে ইলিশ আহরণের ক্রমধারা

চিত্র: ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য 'বাংলাদেশ ইলিশ'

উপস্থাপিত হবে ইলিশের দেশ হিসেবে। 'বাংলাদেশ ইলিশ' নামে ভৌগোলিক নিবন্ধনের ফলে পণ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণগত মানসম্পন্ন ইলিশ মার্কেটিং-এ দেশ-বিদেশে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে।

সরকার ইলিশ সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো:

- নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহণ ও মজুদ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন;
- প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন;
- জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা;
- জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন জেলেদের চার মাস ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান; এবং
- জাটকা আহরণে বিরত অতিদরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান।

২০২০-২১ অর্থবছরে ৫.৬৫ লক্ষ মে.টন ইলিশের উৎপাদন হয়েছে, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (৩.৪০ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৬৬.১৭ শতাংশ বেশি। Hilsa Fisheries Management Action Plan (HFMAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত গড়ে ৩.৫% হারে বৃদ্ধি পায়। ২০১৫ সালের পরে ২০১৯-২০ পর্যন্ত ৩.৫% থেকে ৯.০% বৃদ্ধি পায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৪ মাসে ২০টি জেলার ৯৬ উপজেলার জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩,৯০,৭০০টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৫৯,১৪১.০৪

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বকনা বাছুর বিতরণ

মে.টন চালসহ ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৪,৭০,৭৪৬.৫৬ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২০২১ সালে ৩৭টি জেলার ১৫১টি উপজেলার ৫,৫৫,৯৪৪টি জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে ১১,১১৮.৮৮ মে.টন ভিজিএফ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রমে মোট ৫২,৫৯০.১০ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এ সম্পদের উন্নয়নে ২৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং নিরাপদ মাছ উৎপাদন

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট। এ লক্ষ্যে

চিত্র: চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ

বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice- GAP) এবং প্রক্রিয়াকরণের সকল স্তরে Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে ২০০৮ সাল হতে National Residue Control Plan- NRCP বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ হতে প্রধানত গলদা, বাগদা, হরিণাসহ বিভিন্ন জাতের চিংড়ি: স্বাদুপানির মাছ যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, আইড়, টেংরা, বোয়াল, পাবদা, কৈ প্রভৃতি এবং সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ভেটকি, দাতিনা, রূপচাঁদা, কাটল ফিস, কাঁকড়া ইত্যাদি রপ্তানি হয়ে থাকে।

এছাড়াও শুঁটকি মাছ, মাছের আঁইশ এবং চিংড়ির খোলসও রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়াসহ প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরিত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের প্রায় ৭০% ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস। বাংলাদেশ হতে সাধারণত আইকিউএফ, কুকড, ফিস ফিলেট, ইত্যাদি ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫০টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের প্রধান বাজার।

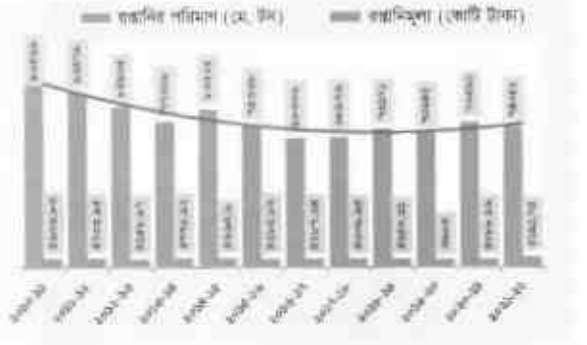

চিত্র: বিগত ১২ বছরের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ এবং রপ্তানিমূল্য

বর্তমানে মোট ১০৭টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা লাইসেন্সভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ৭৭টি ইইউ-ভুক্ত দেশসমূহে মৎস্য রপ্তানি করে। পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার ফিলে উৎপাদন ও রপ্তানির নিমিত্ত ইতোমধ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে মেসার্স ভার্গো ফিস অ্যান্ড এগ্রো প্রসেস লি. ও মেসার্স সেভেন ওশানস ফিস প্রসেসিং লি. এবং গাজীপুরে মেসার্স আর্থ এগ্রো ফার্মস লি. নামীয় তিনটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত

চিত্র: মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা পরিদর্শন

হচ্ছে এবং ল্যাবরেটরি তিনটি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে।

মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছচাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনা কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত 'Fish and Fishery Products Official Controls Protocol' প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হচ্ছে।

Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, ১৯৮৩ রহিতক্রমে এর বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিগত ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তা গেজেটে প্রকাশিত হয়। বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫,১৯১.৭৫ কোটি টাকা, যা বিগত বছর থেকে ২৬.৯৬ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৭৪,০৪২.৬৭ মে.টন।

ব্লু-ইকোনমি এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাইলট কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ অর্জন করেছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ সুযোগকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০১৪ সালে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক

চিত্র: বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের কর্মকৌশল (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালে উক্ত পরিকল্পনা এসডিজি'র সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-২০৩০ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৩৮টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সার্ভের মাধ্যমে মোট ৪৫৭ প্রজাতির মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় প্রাণি শনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭৩ প্রজাতির মাছ;

চিত্র: মৎস্য অধিদপ্তরের গবেষণা জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী'

২১ প্রজাতির হাঙ্গর ও রে; ২৪ প্রজাতির চিংড়ি; ০৩ প্রজাতির লবস্টার; ২১ প্রজাতির কাঁকড়া; ০১ প্রজাতির স্কুইলা (মেন্টিস); ০৫ প্রজাতির স্কুইড; ০৪ প্রজাতির অক্টোপাস এবং ০৫ প্রজাতির কাটল ফিস পাওয়া গেছে।

'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে সার্ভে ক্রুজে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Management plan-I: Industrial প্রণয়ন এবং অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া Marine Fisheries Management plan-II: Artisanal এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং Institute of Marine Research (IMR) কর্তৃক পরিচালিত EAF_Nansen Program-এর আওতায় অত্যাধুনিক জরিপ ও গবেষণা জাহাজ R.V. Dr. Fridtjof Nansen এর মাধ্যমে ০২/০৮/২০১৮ হতে ১৭/০৮/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত ১৫ দিন বঙ্গোপসাগরে Acoustic সার্ভে পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তীতে আরও সার্ভে পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯ সাল হতে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে 'সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় Monitoring, Control and Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে Vessel Monitoring System (VMS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০,০০০টি আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান এবং ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান Vessel Monitoring System এর আওতায় আনা হয়েছে।

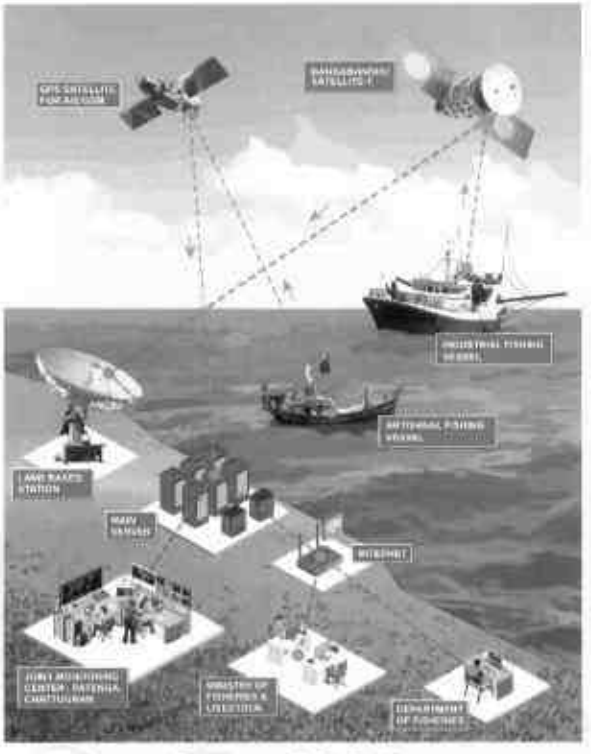

চিত্র: ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম

চট্টগ্রামে সামুদ্রিক সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট হতে জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ নেভী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌ-পুলিশ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সমন্বয়ে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Joint Monitoring Center (JMC)।

২০০০ সালে বঙ্গোপসাগরের মিডল গ্রাউন্ড এবং সাউথ প্যাচেস-এর মধ্যবর্তী ৬৯৮ বর্গকিমি আয়তন বিশিষ্ট একটি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা মেরিন রিজার্ভ (Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

চিত্র: সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা

সরকার ২০১৯ সালে হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ৩১৮৮ বর্গ কিমি এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা MPA (Marine Protected Area) হিসেবে এবং নিঝুম দ্বীপ এমপিএ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। এছাড়াও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭৩৮ বর্গ কিমি এলাকাকে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে; যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

চিত্র: নিয়োগাধীন টুনা ফিসিং ভেসেল

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এর সহায়তায় বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক Support to countries to address Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing নামে Technical Cooperation Project (TCP) গ্রহণ করা হয়েছে এবং IUU Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বটম ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য এবং চিংড়ি আহরণের ফলে মাছের প্রজননক্ষেত্র এবং নার্সারি গ্রাউন্ড বিনষ্ট হয়। তাই নতুন করে চিংড়ি ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছে এবং বটম ট্রলারসমূহ মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৬৮টি বটম ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার নৌযান কর্তৃক সকল প্রজাতির মৎস্য এবং ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র (আয়তন প্রায় ৭০০০ বর্গকিলোমিটার) এলাকায় সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ৬.৮১ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ২৪.৭২ শতাংশ বেশি।

দেশে মেরিকালচার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সীউইড কালচার এবং ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি, ভেটকি এবং কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপন ও গুণগতমানের মৎস্য খাদ্য তৈরি, প্রোবায়োটিক উৎপাদন বিষয়ে ১৫টি প্রায়োগিক গবেষণায় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫টি বেসরকারি সংস্থাকে ১৬.৭৩ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে।

কোভিডকালীন মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন

বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারীর প্রকোপে প্রায় সর্বত্রই অচলাবস্থা পরিলক্ষিত হয় এবং এর প্রভাবে মাছ বাজারজাতকরণ, উপকরণ সরবরাহ, মাছের খাদ্য ও পোনার অপ্রাপ্যতা এবং উচ্চমূল্যের কারণে মাছচাষিরা ক্ষতির সম্মুখীন হন। সরকার করোনা মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে অদ্যাবধি ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে ৩৭,০৯৯.৩৫ মে.টন মাছ বিক্রয় করা হয় যার মোট বাজারমূল্য ৭০৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

দেশের জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরসমূহ তাদের ফেসবুক পেজ ও অন্যান্য ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমে অনলাইন ফিস মার্কেটিং-এর ওপর মাছ বিপণনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রেখেছে। এ লক্ষ্যে এনএটিপি-২ প্রকল্প হতে সারাদেশে প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়। সাপ্লাই চেইন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্পের আওতায় এনজিও এবং পিও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপক ও মার্কেটিং ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে মৎস্যচাষিদের বাজারজাতকরণ সমস্যা দূরীকরণে মে ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে ১৭৮৬.০০ মে.টন মাছ বাজারজাত করা হয় যার বাজারমূল্য ৩৮২২.০০ লক্ষ টাকা।

মাঠ পর্যায়ের মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাগণ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, উদ্যোক্তা, মাছ ব্যবসায়ী, খামার মালিকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ত্রাণ হিসেবে মাছ বিতরণে উৎসাহিত করছেন। ২৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে অদ্যাবধি ৫ হাজার ৬৩৬ কেজি মাছ ৪ হাজার ৩৭২ জন দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণের সাথে বিতরণ করা হয়।

কোভিডকালীন কৃষিখাতে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ৫০০০ কোটি টাকা প্রণোদনার মধ্যে মৎস্যখাতে ৬৪৩৮ জন মৎস্যচাষিকে স্বল্প সুদে মোট ১৫৩.৭২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৭৭,৮২৬ জন খামারিকে ৯৯ কোটি ৭০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

কোভিডকালীন সরকারের গৃহীত সময়োচিত পদক্ষেপে মৎস্য সেক্টরে রপ্তানি আয় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪০৮৮.৯৬ কোটি টাকা থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫১৯১.৭৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বিগত বছরের চেয়ে ২৬.৯৬ শতাংশ বেশি।

পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। বাগদা চিংড়ি বাংলাদেশের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃত। চিংড়িশিল্পে আরও গতিশীলতা আনয়নে সকল চিংড়ি খামার নিবন্ধিকরণ ও লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ, চাষি প্রশিক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ, মৎস্য

জিআই(আর)ফরম- ০১

ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ

"বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি"

চিত্র: বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ির ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ

চিত্র: ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য 'বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি'

মাননিয়ন্ত্রণ, ল্যাবরেটরিসমূহের আধুনিকায়ন এবং চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্লাস্টারভিত্তিক চিংড়ি চাষ ও লাগসই প্রযুক্তি যেমন- ঘেরে পানির গভীরতা ন্যূনতম ১ মিটার বজায় রাখা; পিসিআর পরীক্ষিত নিরোগ পিএল লালন করা; ন্যূনতম ১৪ দিন পিএল নার্সিং করে ঘেরে জুভেনাইল মজুদ করা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে সংগঠিত চাষিরা এক বছরে প্রায় ৭০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। 'সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট'-এর আওতায় উক্ত প্রযুক্তি অনুসরণ করে ইতোমধ্যে ৭৫০০ জন চিংড়ি চাষি নিয়ে ৩০০টি চিংড়ি ক্লাস্টার স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: চিংড়ি ক্লাস্টার

২০২০-২১ সালে চিংড়ি খামারের উৎপাদন ২.৭৯ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ২.০৭ লক্ষ চিংড়ি খামার এবং ৯,৬৫১টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া চাষিদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত, ই-ট্রেসিবিলিটি এবং আইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই এসপিএফ বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে পিএল উৎপাদন প্রবর্তিত হয়েছে। এ বছর অনুমতিপ্রাপ্ত ৩টি এসপিএফ হ্যাচারি হতে ৬২.১০ কোটি এসপিএফ বাগদা পিএল উৎপাদন হয়েছে, যা ২০১৫ সালে ছিল ৩.১ কোটি। ২০২১-২২ অর্থবছরে এসপিএফ বাগদা ব্রুড, পলিকিট এবং পিএল উৎপাদনে ১১টি হ্যাচারিতে ২২.৯১ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৬৫০০টি এসপিএফ বাগদা ব্রুড, ১০০০০ কেজি পলিকিট এবং ২০০ কোটি অতিরিক্ত এসপিএফ বাগদা পিএল উৎপাদন হবে।

সারাদেশে গলদা ও বাগদা চিংড়ির একক/মিশ্রচাষ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য পোনা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৩৩টি গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ও ৪৩টি বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। হ্যাচারি থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭২৩.৪১ কোটি চিংড়ির পিএল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান

প্রকৃত মৎস্যজীবী/জেলেদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে।

এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯' অনুমোদন এবং এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত ও অক্ষম জেলেদের সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৯' অনুমোদন এবং এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

'সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট' এর আওতায় জেলেদের ডাটাবেইজ হালনাগাদ এবং স্মার্ট পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য ব্যান পিরিয়ড বাস্তবায়ন

সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। উক্ত রুলের আওতায় ২০১৫ সাল হতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ২০২১ সালে মোট ২,৯৯,১৩৫টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৫,৬৯৫.৩৭ মে.টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে।

মৎস্য সম্পর্কিত আইন বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও আইন বাস্তবায়ন

মৎস্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যেই বেশকিছু নীতি, আইন, বিধিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

যার মধ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১; সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯; জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১৮, সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অন্যতম।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিদ্যমান অভয়াশ্রমের সংখ্যা ৪২৬টি যার আয়তন ৮৪৮.৭৩ হেক্টর (৫৪৭.৬১ হে. হালদা নদী অভয়াশ্রমসহ) এবং ইলিশ অভয়াশ্রম ৬টি যার দৈর্ঘ্য ৪৩২ কিমি। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৪৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত এবং উন্নয়ন প্রকল্প হতে ১২১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০৫টি অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র: মৎস্য অভয়াশ্রম

মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা- একঠোঁটি, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, গোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আঁইড়, টেংরা, স্বরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলি, চাকা, গজার, বাইম, ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশি কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। হালদা নদী বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের এক অনন্য প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র এবং বলা যায় একমাত্র বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জীন ব্যাংক। হালদা নদী রক্ষায় টেকসই ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফেজ-১)' চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রাকৃতিক উৎস (হালদা নদী) হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৫৮০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা হতে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ১০৫.৭২৫ কেজি।

চিত্র: হালদা নদীতে রুই জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহ

বিশুদ্ধ জীনপুল সমৃদ্ধ মাছ সংরক্ষণ এবং জীন ব্যাংকে স্থাপন

চীন থেকে ৩৮,৪৬০টি বিশুদ্ধ জীনপুল সমৃদ্ধ বিগহেড কার্প (১২,৮২০টি), সিলভার কার্প (১২,৮২০টি) ও গ্রাস কার্প (১২,৮২০টি) মাছ আমদানি করা হয়েছে, আমদানিকৃত মাছের পোনা দেশের ৯টি সরকারি হ্যাচারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বিশুদ্ধ জিনপুল সমৃদ্ধ মাছের পোনা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে এসব পোনা লালন-পালন করে বেসরকারি হ্যাচারিসমূহে সরবরাহ করা হবে।

বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে আহরণযোগ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং জলাশয় পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত হতে বিল নার্সারি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধিকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৩৮৭টি উপজেলায় ১৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩৩টি এবং উন্নয়ন প্রকল্প হতে ৪৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ২৩৮.৫৪ মে.টন (রাজস্ব- ২১৭.৩৯ মে.টন + প্রকল্প - ২১.১৫ মে.টন) পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল রাজস্ব খাতে ৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পে ৬০.২১ লক্ষ টাকা।

খামার যান্ত্রিকীকরণ, আইসিটি/ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম ও ইনোভেশন

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৩০টি প্যাডেল হুইল অ্যারেটর এবং এনএটিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪১টি অ্যারেটর মৎস্যচাষিদের বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রকল্পেও মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় ই-রিক্রুটমেন্ট, জেলেদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান,

ই-নথি ও ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্ট/ ই-জিপি, ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই-বুক প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন, অটোমেটেড হাজিরা সিস্টেম প্রচলন, পারসোনেল ডেটা সীট সিস্টেম প্রচলন, দাপ্তরিক ইমেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে।

চিত্র: খামার যান্ত্রিকীকরণে আধুনিক এক পদ্ধতি

সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সৃষ্ট অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সেবাকে সহজীকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ফিশ ফিড লাইসেন্সিং সিস্টেম, ফিশ এডভাইজ সিস্টেম এবং ই-বুক ব্যবস্থাপনা সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া ফিশ এডভাইজ, মৎস্য চাষি বার্তা, ড. ফিশ, মৎস্য চাষি স্কুল, অনলাইন স্কুল মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ১৬টি ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে। মোট ইনোভেশনের সংখ্যা ৫৫টি। মৎস্য অধিদপ্তর এ পর্যন্ত ৩টি ইনোভেশন শোকেসিং সম্পন্ন করেছে। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় ১,৩৪,২৫৩ (রাজস্ব-৪১,৫৯৩ জন + প্রকল্প-৯২,৬৬০ জন) জন মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও এনজিও কর্মীকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন

আদর্শ মৎস্য গ্রাম প্রতিষ্ঠা

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকারের বিশেষ কর্মসূচি 'আমার গ্রাম আমার শহর' বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের দুটি গ্রামকে 'ফিসার ভিলেজ'/'মৎস্য গ্রাম' হিসেবে গড়ে তুলে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- 'ফিসার ভিলেজ'/'মৎস্য গ্রাম' বাস্তবায়নে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার ইউনিয়নের হালইসার গ্রাম এবং নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া গ্রামকে আদর্শ মৎস্য গ্রাম হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ২টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ও তা যথারীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- আদর্শ গ্রাম স্থাপনের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, কৃষি নির্ভর শিল্প, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষির বহুমুখীকরণ ও বাজার ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়ন হবে; এবং
- সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত গ্রামসমূহের মধ্য হতে ১০০টি মডেল মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হবে।

চিত্র: মৎস্যজীবী গ্রাম

মৎস্য সেক্টর ও নারীর ক্ষমতায়ন

- উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র ও নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থ নারী, যাদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছচাষ করার জন্য অনুরূপ কোনো উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নির্বাচন করা হয়ে থাকে;

চিত্র: মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নারীর অংশগ্রহণ

- উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ২৫-৩০ শতাংশ সুফলভোগী নারীদের মাঝ থেকে নির্বাচন করা হচ্ছে;
- বর্তমানে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মীদের প্রায় ৮০ শতাংশই নারী; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে এ সেক্টরে প্রায় ১৪ লক্ষাধিক নারী প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। বসতবাড়ী সংলগ্ন পুকুরে মাছচাষে নারীর সম্পৃক্ততার ফলে পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত অগ্রগতি অর্জন করেছে:

- মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়নের কর্মপন্থা Plan of Action (PoA) প্রণয়ন করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে অ্যালাইন করে এসডিজি (SDG) কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট মেরিন রিজার্ভ এবং বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৩৮ বর্গ কিমি সংরক্ষিত এলাকাসহ সর্বমোট ২,৪৩৬ বর্গ কিমি এলাকা সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে; যা বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি) ২.০৫%; সম্প্রতি নিকুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকাকে এমপিএ/মেরিন রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করায় মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ হয়েছে ৫,৬২৪ বর্গকিলোমিটার, যা মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি) ৪.৭৩%-এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারে ব্যবহৃত জালের মেশ সাইজ এবং কড এন্ডের মেশ সাইজ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্য সেক্টর

বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যখাত বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও বিপন্ন। জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার।

নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশিরভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে- এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় এফএও-এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তর 'Community Based Climate Resilient Aquaculture Development Project in Bangladesh' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। অপর একটি প্রকল্প বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Climate Smart Agriculture and Water Management Project (CSAWMP) ২০২১-২২ অর্থবছর হতে কার্যক্রম শুরু করেছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম

মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্যখাতে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে; যার বরাদ্দ ছিল ৬২৯.৮৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় ৫৪৩.১৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দকৃত এডিপি'র ৮৬.২৪%।

এসব প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর বিল নার্সারি স্থাপন, জলাশয় সংস্কার, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ, মেরিকালচার, চিংড়ি চাষি ক্লাস্টার স্থাপন, এসপিএফ বাগদা চিংড়ির ব্রুড এবং পিএল উৎপাদন, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণ, দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছসহ পোনা অবমুক্তি, শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন, বিকল্প কর্মসংস্থান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার

জাতির পিতা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সে স্বপ্নকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ২০২৫ সাল নাগাদ ৫০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ফলে অর্জিত হবে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি। মৎস্যখাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশ।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর (ইমেইল: dg@fisheries.gov.bd)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট : গবেষণায় সাম্প্রতিক অর্জন

BFRI : Recent Research Achievements

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

Abstract

Aquaculture is the fastest growing food producing sector in the present world's context and has been recognized for its remarkable contribution in the county's export earnings and GDP. In order to uphold this substantial growth, Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) has so far developed 69 improved aquaculture and management technologies and a notable number of technologies have been disseminated to the field through Department of Fisheries (DoF) and NGOs. Freshwater fishes of Bangladesh comprise 260 species of which 64 were endangered due to habitat degradation and over exploitation. BFRI has been conducting comprehensive research to conserve these species from extinction and already developed the artificial breeding and culture technologies of 35 endangered fish species. As a result, the production has been ameliorated and the availability of these fish species significantly increased in the local market. Bangladesh has also praised with a noteworthy production of hilsa in this Fiscal Year. Currently, BFRI is intensively working to conserve the genetic resources and non-conventional (crabs, seaweeds, oysters, snails, etc) fishery items as well as to achieve the combined goals of SDG-2030, the 8th Five Year Plan and Vision-2041 through the implementation of the compatible research projects. Some of the recent research success have been depicted here.

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত এর ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়। জাতির চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬৯টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তির মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় ২৯ প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, অ্যাকোয়াপনিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও সবজি উৎপাদন, উপকূলীয় অঞ্চলের দাতিনা, চিত্রা, সোনা টেংরা ও পারসে মাছের পোনা উৎপাদন; রুই, তেলাপিয়া ও স্বরপুঁটি মাছের জাত উন্নয়ন; শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন, মিঠা পানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন, ক্রিকে মাছ চাষ, সমুদ্র উপকূলে সী-উইড চাষ, ফিস ড্রায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন শুঁটকি মাছ উৎপাদন, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি অন্যতম। সরকারের মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে মাছের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন। দেশ এখন মাছে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই না উদ্বৃত্তও বটে। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ১ম (৫.৬৫ লক্ষ মে.টন), তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ (প্রায় ৪.০ লক্ষ মে.টন) এবং এশিয়াতে ৩য়। এ অর্জন জাতির জন্য গৌরব এবং অহংকারের। দেশ মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় শহর ও গ্রামের সাধারণ মানুষ এখন স্বল্পমূল্যে মাছ ও পুষ্টি পাচ্ছে। তাছাড়া মৎস্যচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সাম্প্রতিককালে গবেষণা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও সফলতা অর্জন করেছে। অর্জিত কয়েকটি সফলতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে রুই মাছের উন্নত জাত 'সুবর্ণ রুই' উদ্ভাবন (Inventing the improved variety of Rui fish 'Subarna Rui' on the golden jubilee of independence)

বাংলাদেশে চাষযোগ্য কার্পজাতীয় মাছের মোট উৎপাদনের ৪৪.৮৬% যোগান দেয় রুই মাছ। দেশে রুই মাছের মোট উৎপাদন ৩.৯৩ লক্ষ মে.টন; এর মধ্যে ২.৫০ লক্ষ মে.টন উৎপাদিত হয় চাষের পুকুরে। বর্তমানে মৎস্যচাষ প্রায় সম্পূর্ণভাবে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু হ্যাচারিতে উৎপাদিত রুই মাছের পোনার কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় (Genetic deterioration) ও অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা (inbreeding depression) মৎস্যচাষে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা জেনেটিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দেশে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ইনস্টিটিউট হতে ৪র্থ প্রজন্মের এই রুই মাছকে 'সুবর্ণ রুই' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। 'সুবর্ণ রুই'-এর এই

চিত্র: রুই মাছের উন্নত জাত 'সুবর্ণ রুই'

উন্নত জাত গত ১০ জুন ২০২১ আনুষ্ঠানিকভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও হ্যাচারি মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে 'সুবর্ণ রুই' মূল জাতের চেয়ে শতকরা ২০.১২ ভাগ অধিক উৎপাদনশীল।

মৎস্য হ্যাচারিতে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসন ও মৎস্যচাষে উৎপাদন বৃদ্ধিতে রুই মাছের নতুন এই জাত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ মাছের গায়ের রং লালচে হওয়ায় মাছটি দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং অন্তঃপ্রজনন সমস্যামুক্ত। ৪র্থ প্রজন্মের এই জাতটির genetic contribution স্থানীয় জাত অপেক্ষা বেশি ও অধিকতর বিশুদ্ধ। ভবিষ্যতে 'সুবর্ণ রুই' মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

২. উপকূলীয় অঞ্চলের দাতিনা মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন (Success in artificial breeding of Datina fish in coastal areas)

বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীরা দেশে প্রথমবারের মতো উপকূলীয় অঞ্চলের সুস্বাদু দাতিনা মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউটের খুলনার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে বিগত ৪ বছর যাবত দাতিনা মাছের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে এ সফলতা আসে। ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলে দাতিনার ৩টি প্রজাতি পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এ মাছটি 'সাদা দাইতনা' নামে অধিক পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Pomadasys hasta*। এ মাছে কাঁটা কম এবং খেতে সুস্বাদু। পরিপক্ব মাছকে গবেষণা কেন্দ্রের হ্যাচারিতে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২০-২১ সালে প্রথম পোনা উৎপাদন সফলতা অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের দু'একটি দেশে দাতিনার খাদ্য ও খাদ্যাভাস এবং ডিম ধারণ ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হলেও এর প্রজনন সফলতা সম্পর্কিত কোনো গবেষণা তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিবেচনায় দাতিনা মাছের এ প্রজনন সফলতা বাংলাদেশের জন্য গৌরবের।

চিত্র: দাতিনা মাছের পোনা

৩. ঢেলা মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন (Production of fry through artificial breeding of Dhela fish)

বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীরা পুষ্টিসমৃদ্ধ (প্রতি ১০০ গ্রাম ঢেলা মাছে ভিটামিন এ ৯৩৭ আইইউ, ক্যালসিয়াম ১২৬০ মিগ্রা এবং জিঙ্ক ১৩.৬০%) ও বিলুপ্তপ্রায় ঢেলা মাছের (*Rohtee cotio*) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনের জন্য গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করে। অতঃপর ২০২১ সালে ইনস্টিটিউট দেশে প্রথমবারের মতো পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি গবেষণা কেন্দ্রে এ সফলতা অর্জিত হয়।

চিত্র: ঢেলা মাছ

আলোচ্য গবেষণায় ১০ জোড়া ঢেলা মাছকে হরমোন প্রয়োগ করা হয়। হরমোন প্রয়োগের ০৮-০৯ ঘণ্টা পর ডিম ছাড়ে এবং ২২ ঘণ্টা পরে নিষিক্ত ডিম থেকে রেণু পোনা উৎপাদিত হয়। এ সময় ডিম নিষিক্তহার পরিমাণ ছিল প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। উৎপাদিত পোনা বর্তমানে ইনস্টিটিউটের হ্যাচারিতে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

৪. রাণী মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন (Artificial breeding Technique development of Rani fish)

স্বাদুপানির বিলুপ্তপ্রায় ছোট মাছের মধ্যে রাণী (*Botia dario*) মাছ অন্যতম। এ মাছটি খেতে খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন হওয়ায় বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ মাছ বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, ভুটান ও মায়ানমারে পাওয়া যায়। মাছটি রাণীবউ নামে পরিচিত হলেও অঞ্চলভেদে মাছটিকে বেটি, পুতুল ও বেতাঙ্গী নামেও পরিচিত। আইইউসিএন (২০১৫) কর্তৃক রাণী মাছকে বিপন্ন প্রজাতির মাছ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে ২০২০ সালে রাণী মাছের সংরক্ষণ, প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দেশে প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রাণী মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন

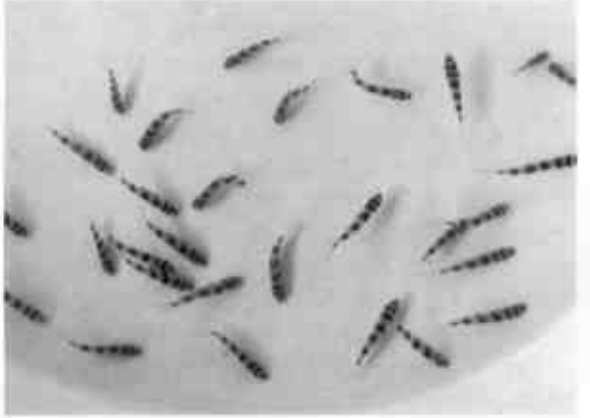

চিত্র: কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত রাণী মাছের পোনা

করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, রাণী মাছ মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন-জুলাই এদের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম এবং একটি পরিপক্ব স্ত্রী মাছে প্রতি গ্রামে ৮০০-৯০০টি ডিম পাওয়া যায়। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এ মাছের প্রযুক্তিটি চাষের আওতায় আসবে এবং বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

৫. বিলুপ্তপ্রায় বাতাসি মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা (Success in artificial breeding of endangered Indian Batashi fish)

আইইউসিএন (২০১৫) এর তথ্যমতে, বিলুপ্তপ্রায় এ মাছটিকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফল হয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। এ সাফল্য বিলুপ্তপ্রায় বাতাসি মাছ (*Neotropius atherinoides*) রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখবে। ইনস্টিটিউটের বগুড়াস্থ সান্তাহার প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র হতে যমুনা ও আত্রাই নদীসহ বিভিন্ন উৎস থেকে বাতাসি মাছের পোনা সংগ্রহ করে প্রথমে পুকুরে তা নিবিড়ভাবে প্রতিপালন করা হয়। প্রতিপালনকালে বাতাসি মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি পরিপক্ব বাতাসি মাছের খাদ্যনালিতে শতকরা ৮৬ ভাগ প্ল্যাংকটন ও ১৪ ভাগ অন্যান্য খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বছরব্যাপী জিএসআই ও হিস্টোলজি পরীক্ষণের মাধ্যমে বাতাসি মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য গবেষণার আওতায় চলতি বছরের মে মাসে বাতাসি মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়। হরমোন প্রয়োগের ১২-১৫ ঘন্টা পর বাতাসি মাছ ডিম ছাড়ে এবং ২৩-২৫ ঘন্টা পরে নিষিক্ত ডিম থেকে রেণু পোনা উৎপাদিত হয়। ডিম নিষিক্ততার হার ছিল শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ। উৎপাদিত রেণু বর্তমানে প্লাবনভূমি উপকেন্দ্রের হ্যাচারিতে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

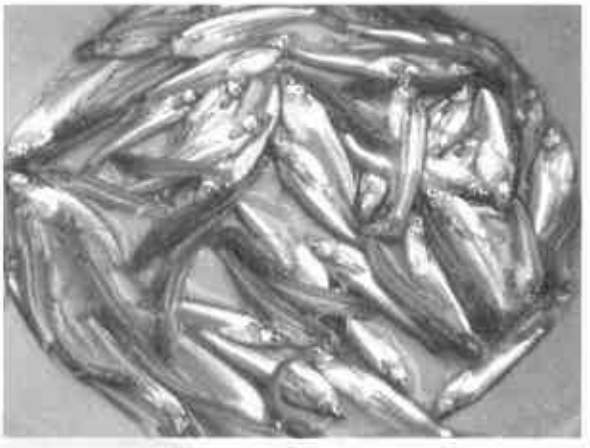

চিত্র: ব্রুড বাতাসি মাছ

৬. পিয়ালী মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সফলতা (Artificial breeding of Piali fish & Fry production succes)

পিয়ালী (*Aspidoparia jaya*) সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ। মাছটির ইংরেজি নাম Jaya/Carplet। এক সময় দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পিয়ালী পাওয়া যেত। কিন্তু নদীনালা খাল বিলে অপরিকল্পিত ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ, অধিকতর জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণে ফসলি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ,ঋতু পরিবর্তন, অবাধে মৎস্য আহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হচ্ছে। ফলে এই মাছের প্রাপ্যতা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশীয় প্রজাতির এই মাছটির বিলুপ্তি রোধকল্পে ইনস্টিটিউটের প্লাবনভূমি উপকেন্দ্রে থেকে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে। পিয়ালী মাছ প্রজনন উপযুক্ত মৌসুম হচ্ছে মে-আগস্ট এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি। পিয়ালী মাছের ডিম ধারণক্ষমতা আকারভেদে ১৫০০-৩৫০০টি এবং প্রতি গ্রাম দেহ ওজনে ৩৬০টি ডিম পাওয়া যায়।

চিত্র: ব্রুড পিয়ালী মাছে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

৭. দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা (Establishment of live gene bank of native fish)

মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশগত বিপর্যয়, জলাশয় সংকোচনসহ নানা কারণে দেশীয় প্রজাতির অনেক মাছ এখন বিলুপ্তপ্রায়। এসব মাছকে পুনরুদ্ধারসহ দেশীয় প্রজাতির সকল মাছকে সুরক্ষা করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয় দেশীয় মাছের এ লাইভ জীন ব্যাংক উদ্বোধন করেন। মাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের জন্য লাইভ জীন ব্যাংক একটি

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি কর্তৃক লাইভ জীন ব্যাংক উদ্বোধন

আধুনিক ধারণা। জীন ব্যাংক মূলত কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের জেনেটিক উপাদানের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন হুমকির সম্মুখীন হয় তখন জীন ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জীন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রাকৃতিক উৎসে কোনো দেশীয় মাছ হারিয়ে গেলে সেসব মাছকে পুনরুদ্ধারের জন্য এ লাইভ জীন ব্যাংক ব্যবহার করা যাবে।

৮. আঙ্গুস মাছের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন (Inventing the breeding technique of Angus fish)

অঞ্চলভেদে আঙ্গুস মাছ আগুন চোখা, আংরোট বা কারসা নামে পরিচিত। আঙ্গুস মাছের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে *Labeo angra*। একসময় এ মাছটি বৃহত্তর সিলেট এবং রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া গেলেও সুস্বাদু এ মাছটি এখন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নীলফামারীর সৈয়দপুর উপকেন্দ্র থেকে দেশে প্রথমবারের মতো ২০২০ সালে আঙ্গুস মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে চাষাবাদের মাধ্যমে এর সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে।

চিত্র: আঙ্গুস মাছ

মিঠা পানির আঙ্গুস মাছ আকারে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। একটি স্ত্রী আঙ্গুস মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা আকারভেদে ২০ হতে ৫০ হাজার। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি আঙ্গুস মাছ ৬০ থেকে ৭০ গ্রাম হলেই পরিপক্ব ও প্রজননক্ষম হয়ে যায়। এর প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট। তবে জুন-জুলাই মাস সর্বোচ্চ প্রজননকাল। একই বয়সের প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের চেয়ে আকারে বড় হয়। উত্তরবঙ্গের তিস্তা, চিকলী ও আত্রাই নদীতে এ মাছটি এখন মূলত পাওয়া যায়।

৯. হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা (Halda river declared 'Bangabandhu Fisheries Heritage')

মৎস্যখাতে হালদা নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি পৃথিবীর একমাত্র জোয়ার-ভাটা নদী যেখানে রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম পাওয়া যায়। ঐতিহ্যবাহী হালদা নদীকে সুরক্ষা করার লক্ষ্যে সরকারের তরফ থেকে ইতোমধ্যে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় উদযাপন

চিত্র: পরিপক্ব আতপুটি মাছ

কমিটি কর্তৃক এ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশ করা হয়। ফলে দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হালদা নদী জাতীয় পর্যায়ে আরো গুরুত্ব পাবে এবং হালদা সুরক্ষিত হবে।

১০. বিলুপ্তপ্রায় বৈরালি মাছের জীনপুল সংরক্ষণ (Conservation of extinct Bairali fish gene pool)

বৈরালি মাছ উত্তর জনপদের একটি সুস্বাদু মাছ। বৈরালি মাছ বরালি ও খোকসা নামেও পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Barilius barila*। এ প্রজাতি ছাড়াও *Barilius barna, Barilius bendelissis, Barilius tileo* ও *Barilius vagra* নামে এ মাছের আরো ৪টি প্রজাতি রয়েছে। খাল, বিল, পাহাড়ী ঝর্ণা ও অগভীর স্বচ্ছ জলাশয়ে মূলত এ মাছটি পাওয়া যায়। IUCN (২০১৫) কর্তৃক এ মাছটিকে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র কর্তৃক রংপুরের চিকলি নদী ও নিলাজপুরের আত্রাই নদী হতে বৈরালি মাছ সংগ্রহ করে উপকেন্দ্রের পুকুরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রতিপালন ও ব্রুড তৈরি করা হয়। অতঃপর ২০২০ সালে দেশে প্রথমবারের মতো বৈরালি মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জিত হয়। ফলে এর পোনা প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গে এর চাষাবাদ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিত্র: বৈরালি মাছ

১১. বালাচাটা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন (Innovation of artificial breeding techniques of Balachata fish)

বালাচাটা মাছ অঞ্চলভেদে মুখরোচ, পাহাড়ি গুতুম, গঙ্গা সাগর, ঘর পুইয়া, পুইয়া, বাঘা, বাঘা গুতুম, তেলকুপি ইত্যাদি

চিত্র: পরিপক্ব বালাচাটা মাছ

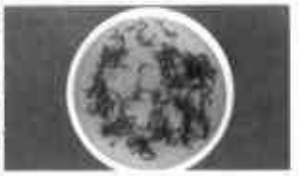

চিত্র: ৩৬ দিন বয়সী বালাচাটা মাছের পোনা

নামে পরিচিত। উত্তর জনপদে মাছটি বালাচাটা, পুইয়া এবং পাহাড়ি গুতুম নামে অধিক পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Somileptes gongota*। প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এবং চাষাবাদের জন্য পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ইনস্টিটিউট হতে ২০১৯-২০ সালে দেশে প্রথমবারের মতো এর কৃত্রিম প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পরিপক্ব (৯-১৪ গ্রাম) বালাচাটা স্ত্রী মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৪ থেকে ৮ হাজার এবং প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত।

১২. শিং মাছের নিবিড় চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন (Innovation of intensive farming technology of Shingi fish)

শিং মাছ (*Heteropneustes fossilis*) আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় একটি মাছ। পুকুরে সাধারণত আধানিবিড় পদ্ধতিতে এর একক বা মিশ্র চাষ করা হয়। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিবিড় পদ্ধতিতে শিং মাছের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে বিএফআরআই। এতে হেক্টরে এক ফসলে ৪০-৪৫ মে.টন শিং মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। শিং মাছের নিবিড় চাষের জন্য ২০-৫০ শতাংশ আয়তনের ছায়াযুক্ত গভীর পুকুর নির্বাচন করতে হয়। অতঃপর পুকুর ভালোভাবে প্রস্তুত করে প্রতি শতাংশে ৩-৪ গ্রাম ওজনের ৩৫০০-৪০০০টি সুস্থ-সবল ও গুণগতমানসম্পন্ন শিং মাছের স্ত্রী পোনা পুকুরে মজুদ করতে

চিত্র: নিবিড় চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত শিং মাছ

হবে। পোনা মজুদের পরের দিন থেকে মাছের দেহ ওজনের শতকরা ১২-৩% হারে প্রাণিজ প্রোটিন (৩২-৩৫%) সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। শিং মাছের নিবিড় চাষের জন্য পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় রাখা খুবই প্রয়োজন।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫০ শতাংশের পুকুর হতে ০৬- ০৭ মাসে ৮-৯ মে.টন শিং মাছ উৎপাদন করা যায়। এতে ১৫-১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং এক ফসলে ১০-১১ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জিত হবে। এ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

১৩. জাতপুঁটি মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন (Achieved success in the production of Puti fish fry)

জাতপুঁটি (*Puntius sophore*) স্বাদুপানির একটি সুস্বাদু ও গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ছোট মাছ। একসময় এ মাছটি দেশের বিল, পুকুর, নদী-নালা, খাল,বিল, প্লাবনভূমি, হাওর, সর্বত্র পাওয়া যেত এবং খাদ্য তালিকায় এটি পছন্দের একটি মাছ ছিল। শুটকি ও চ্যাপা সিদল তৈরিতে এ মাছটি এক সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জাতপুঁটি মাছের উৎপাদন বর্তমানে অনেক হ্রাস পেয়েছে। ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে ২০২০ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাতপুঁটি মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। পুঁটি মাছের প্রজননকাল হচ্ছে এপ্রিল-জুলাই মাস। এর ডিম ধারণ ক্ষমতা ৭-৮ হাজার।

১৪. সী-উইড ক্যাটালগিং ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন (Innovation of sea-weed cataloging and cultivation technology)

সী-উইড একটি অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ। সী-উইড নিয়ে ইনস্টিটিউট হতে গবেষণা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে সী-উইডের প্রাপ্যতা ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে এ পর্যন্ত ১৩৮ প্রজাতির সী-উইড শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। ইনস্টিটিউটের গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ উপকূলে সী-উইডের প্রাপ্যতা, বাণিজ্যিক গুরুত্ব ও শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক Seaweeds of Bangladesh Coast নামক একটি বই ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্ত সী-উইডের মধ্যে রোডোফাইটা গ্রুপের ৬৯.৫২%, ফাইওফাইটা ৩৫.২৭% এবং ক্লোরোফাইটা গ্রুপের ২৮.২১% প্রজাতি রয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Hypnea musciformis* প্রজাতি সীউইডের চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

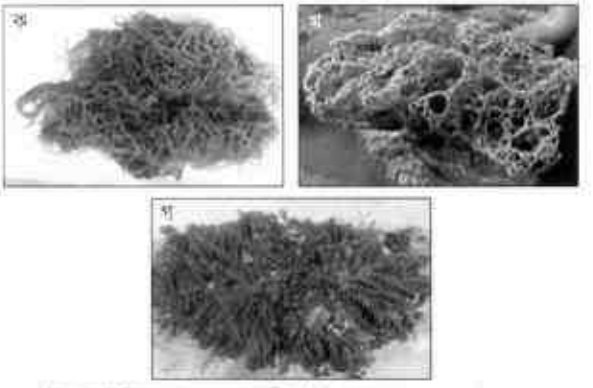

চিত্র: বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সী-উইড - ক) *Hypnea valentiae* খ) *Hydroclathrus clathratus*, গ) *Caulerpa racemosa*

১৫. পার্বত্য জেলায় কুঁচিয়ার মাঠ গবেষণা পরিচালনা ও জনপ্রিয়করণ (Conducting and popularizing field research in Kunchia in hilly districts)

অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের মধ্যে কুঁচিয়া একটি পুষ্টিকর ও ঔষধি গুণসম্পন্ন মাছ। রপ্তানি বাণিজ্যে কুঁচিয়া মাছের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে । এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে কুঁচিয়ার প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নিয়ে ইনস্টিটিউটের রাঙ্গামাটিস্থ নদী উপকেন্দ্র হতে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান সদর এবং খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা

উপজেলায় কুঁচিয়ার মাঠ গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত কুঁচিয়ার চাষ প্রযুক্তি প্রমিতকরণ ও প্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে পার্বত্য জেলার জনগণকে অবহিত করা।

১৬. মেঘনা নদীর উজানে লবণাক্ততা ও মাছের জীববৈচিত্র্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা (The effects of climate change on salinity and fish biodiversity in the upstream of the Meghna River)

সাম্প্রতিক বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন সর্বাধিক আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ক্রমশ বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বিএফআরআই এর নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর থেকে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত নিরূপণের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার আওতায় মেঘনা নদীর ৭টি পয়েন্টে (ঘাটনল, চাঁদপুর সদর, হাইমচর, চর ভৈরবী, চর লক্ষ্যা, চর আলেকজান্ডার ও রামগতি) পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ ও লবণাক্ততার মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষিত তথ্য থেকে দেখা যায়, মেঘনা নদীর বর্ণিত ৭টি পয়েন্টে পানির পিএইচ (৭.৭-৮.৩), অক্সিজেন (৪.৬-৬.৫ পিপিএম), কার্বন ডাই-অক্সাইড (১০.৬-২৩.০৬ পিপিএম), ট্রান্সপারেন্সি (২০.৫-৬৩.৬ সেমি), অ্যালকালিনিটি (৬০-১৫৫ পিপিএম) ও হার্ডনেস (৮২.৫-৬৭৯ পিপিএম) এর মাত্রা এখনও মাছের গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে। তবে লবণাক্ততার মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল মাছ

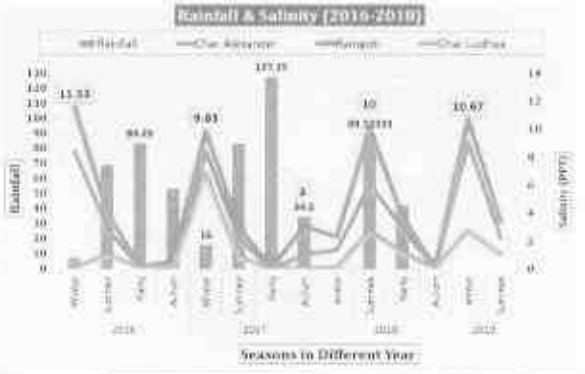

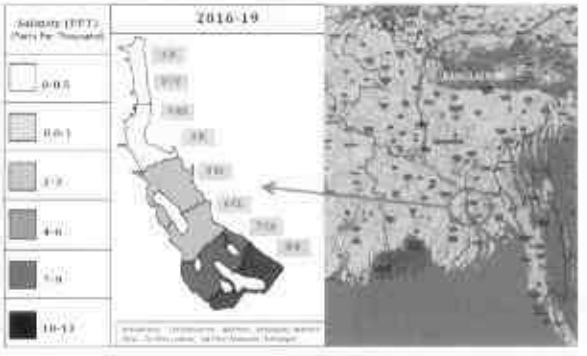

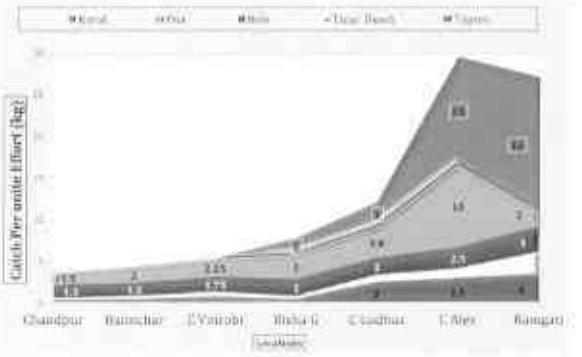

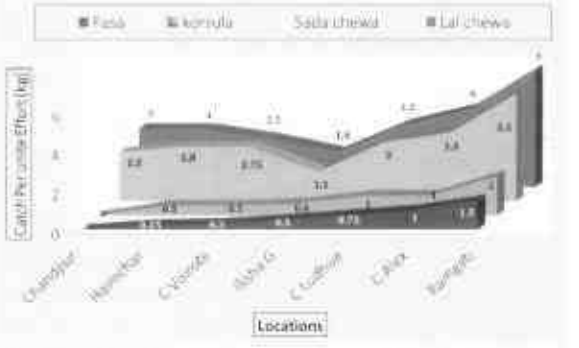

চিত্র: মেঘনা নদীর জলাভ পরিবেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি

যেমন- তাপসি, তুলার ডান্ডি, পোয়া, বেলে, ফাঁইস্যা ও খরশোলা মাছের প্রাপ্যতা মেঘনা নদীর চরলধুয়া, আলেকজান্ডার ও রামগতি এলাকায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে - যা মিঠাপানির মৎস্য জীববৈচিত্র্যের জন্য ইতিবাচক।

১৭. ওয়েস্টার এর পোনা উৎপাদন ও চাষ (Production and cultivation of Oyster fry)

অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ ওয়েস্টারকে কক্সবাজারের স্থানীয় ভাষায় 'কক্সরা' বলা হয়। বর্তমানে কক্সবাজারের বিভিন্ন হ্যাচারিতে মা চিংড়ি এবং কাঁকড়াকে খাওয়ানোর জন্য প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাসে ওয়েস্টার ব্যবহার (মাসে ১ থেকে ১.৫ মে.টন) করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ওয়েস্টার চাষের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় বিএফআরআই হতে ২০১৮-১৯ সাল থেকে কক্সবাজার উপকূলে ওয়েস্টার চাষের গবেষণা শুরু করা হয়। গবেষণাকালে কক্সবাজারের সোনাদিয়া থেকে স্পাট সংগ্রহ করে কক্সবাজারের খুরুশখুল এবং নুনিয়ারছড়াতে সাগরে বাঁশের ভেলার মাধ্যমে নেটের ঝুড়ি এবং ঝুলন্ত দড়ি পদ্ধতিতে

চিত্র: কক্সবাজারে খুলশকুলে উৎপাদিত ওয়েস্টার ও ওয়েস্টার চাষ পদ্ধতি

ওয়েস্টার (*Saccostrea cucullata*) চাষ করা হয়। নেটের ঝুড়ি পদ্ধতিতে খুরুশকুলে ওয়েস্টার এর মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ১০.২ গ্রাম (৪০টি ওয়েস্টার মজুদের ক্ষেত্রে) এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৯৫%। অপরদিকে নুনিয়ারছড়াতে দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ৮.৫ গ্রাম এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৮৫%।

১৮. আপেল শামুকের প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল উদ্ভাবন (Innovation of Apple Snail breeding and nursery management techniques)

বাংলাদেশে ৪৫০ প্রজাতির শামুক রয়েছে (Gain, 1998): এর মধ্যে বাণিজ্যিক দিক থেকে অধিক মূল্যবান শামুক হচ্ছে মিঠা পানির আপেল শামুক (*Pila globosa*)। কিন্তু প্রকৃতি থেকে নির্বিচারে আপেল শামুক আহরণের ফলে এর প্রাপ্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউটের চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট থেকে আপেল শামুকের প্রজনন ও চাষাবাদ বিষয়ে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া এবং সদর উপজেলায় গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৩±৩.৩ মি.মি. লম্বা আপেল শামুক পরিপক্ক হয় এবং অধিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। আরো দেখা যায় যে, একটি পরিপক্ক শামুক কয়েক ধাপে ডিম দেয়া সম্পন্ন করে থাকে। প্রথম ধাপে ৮০-১০০টি, পরবর্তী ধাপে ৫০-৭০টি এবং শেষ ধাপে ২০-৩০টি ডিম দেয়।

এক মৌসুমে আপেল শামুক সর্বোচ্চ ২০০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। ডিম হ্যাচ হওয়ার জন্য ২৬-৩১° সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ডিম হ্যাচ হতে ১৪-১৮ দিন সময় লাগে। সম্পূর্ণ ডিমগুচ্ছ হ্যাচ হতে ২৬-২৯ দিন সময় লেগে যায়।

১৯. গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইনস্টিটিউটের পুরস্কার অর্জন (Achieving Reward for sccessful research)

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট 'একুশে পদক ২০২০' অর্জন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ 'একুশে পদক ২০২০' গ্রহণ করছেন

মাহমুদের নিকট এ পদক প্রদান করেন। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে ইনস্টিটিউট কেআইবি কৃষি পদক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা ও বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার পুরস্কার লাভ করেছে। ফলে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গবেষণা কাজে আরও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে NRBC Bank কৃষি পদক ২০২২ গ্রহণ করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

২০. প্রকাশনা (Publications)

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত লিফলেট, বুকলেট, প্রযুক্তি নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও বই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি 'বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি নির্দেশিকা', 'Hilsa Fisheries Research and Development in Bangladesh' ও 'Seaweeds of Bangladesh Coast' শীর্ষক ৩টি বই প্রকাশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে।

উপসংহার (Conclusion)

দেশের অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়নে বিএফআরআই সফলতা ও সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ে কাজ করছে এবং মৎস্যখাতের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। গবেষণায় প্রাপ্ত সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্য আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পোনা মাছের চাহিদা পূরণ, চাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে-এমনই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকলের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইমেইল: dgbfri@gmail.com)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর কার্যক্রম

Activities of Bangladesh Fisheries Development Corporation (BFDC)

মোঃ হেমায়েৎ হুসেন

Abstract

Bangladesh Fisheries Development Corporation was first established as East Pakistan Fisheries Development Corporation under East Pakistan Ordinance no. 4 in 1964. After independence, it was reformed as Bangladesh Fisheries Development Corporation under the Act 22 in 1973. This is an autonomous government organization, engaged in with all its endeavors with a view to developing the fisheries sector of Bangladesh. At the every onset, we would like to remember the name of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. His visionary initiatives of procuring 10 new fishing trawlers as a gift from the Soviet Russian government which created the opportunity for a new area of BFDC. At present, Corporation has been working in the area of exploitation/exploration of fisheries resources from the river, Kaptai Lake, haor, coastal area and sea, development of the capacity of transport, marketing and storage of fish and fish products. The Corporation organizes training for the fishermen to develop the capacity to explore fish, post- harvest handling and transport. It also promotes fishing trawler repairing and export of fish and fisheries products. As a priority project of the Hon'ble Prime Minister, the Corporation is implementing an important dry fish processing center in Cox's Bazar for marine fish conservation.

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) বা বিএফডিসি সরকারি মালিকানাধীন একটি সেবাধর্মী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর, কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসহ ২০টি কেন্দ্র দেশের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী উন্নয়ন ভাবনায় তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া সরকারের নিকট থেকে ১০টি নতুন ফিশিং ট্রলার পাওয়া যায়, যা দেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের মাধ্যমে কর্পোরেশনের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশে আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, আহরিত মৎস্যের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করছে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর জলায়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠাপানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার ৭ লক্ষাধিক উপজাতি ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, আহরিত মৎস্যের অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সাথে জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- উল্লিখিত সকল বা যেকোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর; এবং
- প্রাকৃতিক জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে আহরিত মাছের আহরণোত্তর অপচয় রোধকল্পে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;

- সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন স্থাপন;
- আহরিত মাছের অবচয় রোধকল্পে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ঢাকা মহানগরীতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ বিপণন;
- প্রাকৃতিক জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

কেন্দ্রসমূহ (Centers)

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে খুলনা, বরগুনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় কর্পোরেশনের ১৪টি, হাওর অঞ্চলে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় ৩টি মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামে একটি মেরিন ডকইয়ার্ড রয়েছে। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে হ্রদ এলাকায় বসবাসকারী মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ/উপজাতি জনগোষ্ঠীর

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি, সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ইউনিটের অধীন ৬টি উপকেন্দ্র কাজ করছে। মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্পটে ভ্রাম্যমান ফিসভ্যান দ্বারা স্বাস্থ্যসম্মত সতেজ মাছ বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মহানগর আধুনিক মৎস্য বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মাছ বাজারজাতকরণ করা হয়। চট্টগ্রামস্থ মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড কেন্দ্রে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার ডকিং, আনডকিং, মেরামত ও বার্থিং সুবিধা প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ নভেম্বর ২০১৮ নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন।

কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলাধার এবং বাংলাদেশে স্বাদুপানির প্রধান মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র কাপ্তাই হ্রদ। এ হ্রদের আয়তন ৬৮,৮০০ হেক্টর, যা দেশের মোট পুকুরের আয়তনের প্রায় ১৮%। মূলত ১৯৬১ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে তৈরি হলেও মৎস্য উৎপাদন, দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন, জেলে, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ জীবন জীবিকা থেকে শুরু করে দেশের সামগ্রিক মৎস্য সেক্টরে কাপ্তাই হ্রদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ হ্রদ থেকে আহরিত মাছ চট্টগ্রাম ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করা হয়। উৎপাদিত মাছের উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। হ্রদ সংলগ্ন অঞ্চলের ২৫ হাজারের অধিক মৎস্যজীবী পরিবারের জীবন-জীবিকা এ হ্রদের মৎস্যসম্পদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল।

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন

২০০৯ সালে কাপ্তাই হ্রদে ৫৫৭৮ মে.টন মাছ উৎপাদন হয়, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩,৯১৫ মে.টনে উন্নীত হয়। উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মারিশ্যাচরের নিজস্ব হ্যাচারিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৮ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়। এছাড়া জুলাই ২০২১ মাসে আরও ১৭ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়।

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু ও রাঙ্গামাটি সদরে ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুর রয়েছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণু এ সকল নার্সারিতে প্রতিপালনের পর ৬-৮ ইঞ্চি আকারের পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

করোনা অতিমারীকালীন হ্রদে মৎস্য আহরণ

করোনা অতিমারীকালীন ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের মাছ প্রাপ্তির সুবিধার্থে কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়।

চিত্র: নার্সারিতে উৎপাদিত পোনা হ্রদে অবমুক্তকরণ

প্রজনন মৌসুমে মাছের সুষ্ঠু বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত হ্রদে ২০২১ সালের মে-আগস্ট মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। মাছের প্রজনন মৌসুম শেষে জনস্বার্থে যথারীতি কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত কার্যক্রম শুরু করা হয়।

পোনা অবমুক্তকরণ

২০০৯ সালে হ্রদে ২২ মে.টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে হ্রদে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারি হতে উৎপাদিত ৪৬ মে.টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া এ বছর ১২-১৪ ইঞ্চি সাইজের ৫০০টি চিতল ও ১০০০টি শোল মাছের পোনা হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

চিত্র: কাপ্তাই হ্রদে কার্প, শোল ও চিতল মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ

জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী মাছের সুষ্ঠু প্রজননের নিমিত্ত ২০২১ সালের মে হতে আগস্ট কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার আদেশ কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ বেতার, স্থানীয় ক্যাবলে ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক সম্প্রচার করা হয়। এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌপুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহারা ও তদারকি নিশ্চিত করে, যা হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

হ্রদের মৎস্য সংরক্ষণে গৃহীত অভিযান

একসময় কাপ্তাই হ্রদের ঘোনাগুলোতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো। এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হতো। বর্তমানে বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নৌপুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য নিয়মিত টহল পরিচালনা করছে। এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে।

চিত্র: অবৈধ জাল আটক এবং বিনষ্টকরণ

মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান

প্রজনন মৌসুমে বছরের ৩-৪ মাস কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্যজীবীদের কোন কাজ থাকে না। বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে ২৫,০৩১ জন মৎস্যজীবীকে ১৫০১ মে.টন চাল/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

খাঁচায় মাছ চাষ

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৪টি খাঁচায় তেলাপিয়া ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বৃহৎ পরিসরে খাঁচায় মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৫৮.৫৪ মে.টন শুঁটকি উৎপাদন করে যা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২১-'৪১)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি এবং প্রাক্তন সচিব জনাব রওনক মাহমুদ ৩১ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. কাপ্তাই হ্রদে কর্পোরেশনের মৎস্য আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময়ে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। সভায় কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২১-'৪১) চূড়ান্ত করা হয়।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময়

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য:

- কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন ২০৪১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- হ্রদের প্রকৃত মৎস্য উৎপাদন নিরূপণের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা;
- টেকসই মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, বেকার যুবকসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন;
- হ্রদের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;
- হ্রদের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

কর্মপরিকল্পনা (২০২১-'৪১)

- কার্প জাতীয় মাছের পোনা নিধন হ্রাস এবং পোনা বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেচকি জালের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭০০ ফুট, প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং ফাঁস সর্বনিম্ন ০.৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ করা;
- মৎস্যজীবীদের উৎসাহিত করার নিমিত্ত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে হতদরিদ্র ১০ জন মৎস্যজীবীকে কেচকি জাল ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিতরণ;
- কাপ্তাই হ্রদে প্রতি বছর ১ মে হতে ১৫ মে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ২০০ মে.টন কার্প মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- কমপক্ষে ০৬ ইঞ্চি আকারের রুই ও মৃগেল এবং ৮ ইঞ্চি আকারের কাতলা মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- ২০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন হ্যাচারি স্থাপন;
- বোয়াল, টাকি, শোল, চিতল ও আইড় মাছের পোনা অবমুক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ৩০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- অভয়াশ্রম ও হ্রদের নিরাপদ অংশে পোনা অবমুক্তকরণ;
- চিতল, ফলিসহ অন্যান্য মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবমুক্তকৃত পোনার আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হ্রদের তলদেশের গাছের গুঁড়ি বা গুইট্যা উৎপাটন রোধকল্পে মাসে কমপক্ষে ৪টি অভিযান পরিচালনা;
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে পর্যায়ক্রমে হ্রদের ৫০টি ঘোনা/ক্রিক/ডেবায় (৮০ একর) ১০০ মে.টন পোনা উৎপাদন;
- হ্রদের পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে এক বা একাধিক দিন হ্রদের পানিতে ভাসমান পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি আবর্জনা পরিষ্কার;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ, ২০টি বিলবোর্ড স্থাপন, একটি ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রচার;
- মাছের প্রজনন মৌসুমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও টহল জোরদার;
- অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাগ দিয়ে নির্বিচারে মাছের পোনা নিধন রোধকল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌপুলিশের সহায়তায় মাসে কমপক্ষে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জব্দকৃত কারেন্ট জালসহ অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ;
- কাপ্তাই হ্রদ ও হালদা নদী হতে পর্যায়ক্রমে মাছের ৫০ কেজি ডিম/রেণু এবং বিএফআরআই হতে এফ-৪ জেনারেশনের ২০০ কেজি পোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন করে ব্রুডস্টক তৈরি;
- মাছের অপচয় রোধ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে ২০ জন মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক নিয়ে প্রতিমাসে ০১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- কাপ্তাই হ্রদে মাছ উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে জরিপকার্য পরিচালনা করা;
- কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে মৎস্যজীবী প্রতি মাসিক ২০ কেজির স্থলে পর্যায়ক্রমে ৫০ কেজি করে চাল খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- জেলেদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের লক্ষ্যে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদকরণ;
- হ্রদের পানির সকল স্তরের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে হ্রদের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্প জাতীয় মাছ শতকরা ৪০ ভাগ, রাক্ষুসে মাছ ৩০ ভাগ ও সর্বভূক মাছ ২০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং কেচকিসহ অন্যান্য ছোট মাছ শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা;

- হ্রদের পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, পুষ্টি প্রবাহ, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে বিএফআরআই ও সিভাসু এর মাধ্যমে হ্রদে প্রজাতিভিত্তিক পোনা মজুদের পরিমাণ ও অনুপাত নির্ধারণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল বিএফডিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন;
- বিলুপ্তপ্রায় দেশি মাছ রক্ষা ও মাছের স্বতঃস্ফূর্ত প্রজননের নিমিত্ত নেভিগেশন রুট পরিহার করে অভয়াশ্রম তৈরি;
- মাছের প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণাপূর্বক অভয়াশ্রমের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি;
- হ্রদে বিদ্যমান প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সঞ্চিত পলি খননের মাধ্যমে অপসারণপূর্বক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রণীত ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নপূর্বক কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীত করা।

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর

কর্পোরেশন ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদান করে। উল্লিখিত ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হয়। আহরিত মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ইউনিটে মৎস্য অবতরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

চিত্র: কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মো: [illegible] কর্তৃক চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন

ট্রলার বহর

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। কর্পোরেশন দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিশিং ট্রলারসমূহ দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে।

চিত্র: এফ.ভি. রূপচান্দা ফিশিং ট্রলার

মেরিন ওয়ার্কশপ এবং ডকইয়ার্ড

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ মে.টন ও ২৫০ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরি করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রায় ৪ কোটি টাকা আয় হয়।

চিত্র: মেরিন ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ডকইয়ার্ড

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ায় পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরির চাহিদা পূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে এ

খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার পরিপেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ২০১৯ সালে নির্মাণ করা হয়। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। ফলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র: মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে ট্রলার ডকিং/মেরামত

টি-হেড জেটিতে ফিশিং ট্রলার বার্থিং

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়।

মৎস্য অবতরণ

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য কর্পোরেশনের ১১টি অবতরণ কেন্দ্রে/উপকেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪,০২৩ মে.টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়। ব্যবসায়ীগণ এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণ এবং বিদেশে রপ্তানি করে। উল্লেখ্য, এ বছর কর্পোরেশনের আরও ৬টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

ঢাকা শহরে স্বাস্থ্যসম্মত সতেজ মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের নিকট ১০টি ভ্রাম্যমান ফ্রিজার ভ্যান এর মাধ্যমে ১৬টি স্পটে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ শহরে বার্ষিক ১৫০ থেকে ২০০ মে.টন মাছ বাজারজাত করা হয়। কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছ সংগ্রহ করে ভ্রাম্যমান ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত মাছ বিক্রয় করা হয় এবং এতে ফরমালিন পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।

চিত্র: কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ বিক্রয়

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

কক্সবাজার বিমানবন্দর এলাকার শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ কাজের সাথে জড়িত ৪৬০৯টি পরিবার সদর উপজেলার খুরুশকুলে পুনর্বাসন করা হয়। উল্লিখিত পরিবারসমূহের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ১৯৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে বিএফডিসি'র আওতায় 'কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প' অনুমোদন করা হয়। এ প্রকল্পে বিএফডিসি থেকে প্রেষণে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নসহ প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও আউটসোর্সিং এ জনবল সরবরাহের প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিজিটাল সাইট সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং লে-আউট প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ শুরু হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা অনুযায়ী 'ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া' অংশটুকু প্রত্যক্ষভাবে অত্র কর্পোরেশনের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট। দেশের সমুদ্র, উপকূল, নদ-নদী, হাওর-বাওর, কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্পোরেশনের ১৫টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র চালু আছে। এ কেন্দ্রগুলোতে সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সরাসরি অবতরণ করা হয়। এতে মাছের গুণগতমান প্রায় অক্ষুন্ন রেখে ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসসহ মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে অবতরণ কেন্দ্রসমূহের বরফকলে উৎপাদিত বরফ দ্বারা চিলিং প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহন করা হয়। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থান যথাঃ পটুয়াখালীর আলিপুর-মহিপুর, পিরোজপুরের পাড়েরহাট ও লক্ষীপুরের রামগতি এবং দেশের হাওর অঞ্চলের নেত্রকোণার

মোহনগঞ্জ, সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে মাছ সংরক্ষণ/বরফজাতকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ কেন্দ্রগুলোতে মৎস্যজীবীরা তাদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করছে। এতে মাছের আহরণোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধ হচ্ছে।

আই.সি.টি/ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট www.bfdc.gov.bd এ সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ই-নথির মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ৭০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিষ্পন্ন ও ই-জিপি'র মাধ্যমে প্রায় ৫৫% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে শতভাগ উন্নীতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা শহরে অনলাইনে মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়। কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল, সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিএফডিসি'র সকল সার্ভিস অটোমেশনের জন্য আইসিটি বিভাগ ও এটুআই এর কারিগরি সহায়তায় সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-'২১ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বিএফডিসি'র প্রাপ্ত নম্বর ৮৮.৯। এছাড়া ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় অত্র কর্পোরেশনের ২টি উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রদর্শন করা হয়। তন্মধ্যে ডেবা নার্সারি নামক উদ্ভাবনী আইডিয়া মৎস্য সেক্টরে ৩য় স্থান লাভ করে।

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিএফডিসি ওতপ্রোতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি'র লক্ষ্য ১৪ এর অধীন 'টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসইভাবে ব্যবহার' নিশ্চিত করার নিমিত্ত মৎস্যজীবীদের মাছের আহরণোত্তর অপচয় (Post-Harvest Loss) রোধকল্পে কর্পোরেশনের ১৭টি মৎস্য অবতরণ ও ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্র কাজ করছে যা মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্যাকিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণসহ রপ্তানিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Future Plan)

(ক) একনেক এর ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের ০৩/২০২০ নং পরিচালনা বোর্ড সভায় গভীর সমুদ্রে টুনা, সমজাতীয় পেলাজিক মাছসহ অন্যান্য মাছ আহরণের নিমিত্ত সরকারি অর্থায়নে প্রথম পর্যায়ে ২টি ডিপ সি ফিশিং ট্রলার ক্রয়, ট্রলারসমূহ বার্থিং এর জন্য চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের বিদ্যমান বেসিন আধুনিকায়ন, ফিশিং ট্রলার কর্তৃক আহরিত মাছ চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে অবতরণের নিমিত্ত অকশন শেড আধুনিকায়নসহ অবতরণ পরবর্তী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের প্রশাসনিক ভবনের সামনের ১০ একর জমিতে ফিশ প্রসেসিং অ্যান্ড এক্সপোর্ট কমপ্লেক্স স্থাপনের নিমিত্ত একটি যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

(খ) দেশের সরকারি পুকুর, দিঘি, হ্রদ, খালবিল ইত্যাদি জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(গ) মাছের প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন।

(ঘ) উপকূলীয় এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণ/মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড এবং বার্থিং এর জন্য টি-হেড জেটি স্থাপন করা।

উপসংহার (Conclusion)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্ত দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাঃ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্যখাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দেশের মৎস্যখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্পোরেশন যুগোপযোগী নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে সহায়ক হবে।

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (ইমেইল : bfdc_64@yahoo.com)

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্যসম্পদের মজুদ এবং ব্যবস্থাপনা

Status of Fisheries Stock in the Marine Area of Bangladesh and Management Recommendations

ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন[১], সাইদুর রহমান চৌধুরী[২] ও মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন[৩]

Abstract

Department of Fisheries, through the Bangladesh Marine Fisheries Capacity Building Project with assistance from FAO has completed the first round of stock assessments of marine fisheries resources in Bangladesh waters in time span of over 20 years. The findings are based on analysis of reported fisheries statistics from the annual Handbook of Statistics (1983-2017) together with survey data from both the R.V. Anushandhani (1983-1999) and the R.V. Meen Sandhani (2017-2018). From these analyses, only three species groups (*Pampus chinensis, Dussumieriea* sp. and *Pennahia anea*) are not presently being overfished, that is the estimated F ratio is below 1. All three of these can be considered incidental catch species with the primary target species being *Pampus argenteus, Sardinella* sp. and *Otolithes cuvieri*, respectively. All three primary target species groups are overfished and depleted, quite severely in case of *Otolithes cuvieri*. Indian salmon (*Leptomelano somaindicum*) is one of the most valuable finfish species in Bangladesh and is severely overfished and depleted. Similarly, the catfish and overall shrimps are also declining in biomass. Species in this condition are at significant risk of commercial extinction and may in fact be extirpated without specific management protection. It is clear that management regime has to consider precautionary measures for permitting an excessive and increasing fishing effort in the marine fisheries. Efforts to stop fleet growth and to responsibly begin reducing total fleet size are urgently required. The management intervention and the resulting benefits are both going to require some years of consistent and effective control. More specific, targeted management measures will be required as well but the first step is the most pressing and will have the greatest long term impact.

মৎস্য অধিদপ্তর, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর কারিগরি সহায়তায় 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'-এর মাধ্যমে বিগত বছরগুলোতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রথমবারের মতো সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। এ রিপোর্টে প্রকাশিত ফলাফল তৈরির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক মৎস্য পরিসংখ্যানের (১৯৮৩-২০১৭) সারণির তথ্যের সাথে আরভি অনুসন্ধানী (১৯৮৩-১৯৯৯) এবং আরভি মীন সন্ধানী (২০১৭-২০১৮) দ্বারা পরিচালিত গবেষণা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত একীভূত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিগত সময়ের তথ্য-উপাত্তের প্রকৃতি ও গুণগত মানের কারণে তথ্য-উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহারযোগ্যতা তথা নির্ভরযোগ্যতা বিভিন্নভাবে ব্যাহত হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সীমিত আকারে বিশ্লেষণ ও ব্যবহারপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

মজুদের অবস্থা নিরূপণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি যেমন- ধৃত মাছের পরিমাণ এবং মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান ও জালের সংখ্যা বিষয়ক তথ্যাদি প্রকাশিত মৎস্য পরিসংখ্যান হতে পাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত অতীতে সাধারণভাবে যোগবিয়োগ করে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হতো বলে মজুদ নিরূপণের মূল উপাত্তগুলো প্রকাশিত সংকলনসমূহ হতে পাওয়া যায়নি। প্রকাশিত পরিসংখ্যান রিপোর্টগুলো কখনোই মজুদ নিরূপণের উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়নি বিধায় প্রজাতিভিত্তিক বিশ্লেষণও উক্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে আশার বিষয় বিগত ২০১১-১২ সাল হতে চালু হওয়া নতুন পদ্ধতিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও আর্টিসেনাল উভয় খাতেই ধৃত মাছের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাতিভিত্তিক উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে নির্ভরযোগ্য মজুদ নিরূপণের জন্য মাত্র ছয় বছরের প্রাপ্ত উপাত্ত যথেষ্ট নয়; তবে সময়ের পরিক্রমায় এই উপাত্তমালা সমৃদ্ধ হতে থাকবে। বর্তমানে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ থেকে প্রাথমিকভাবে ৭টি মৎস্য গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছে।

জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে মৎস্য মজুদের এক ধরনের ধারণা পাওয়া সম্ভব; কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, এ জাতীয় ধারণা সব সময়ই আপেক্ষিক হয়ে থাকে এবং এর ফলে বিভিন্ন বছরে মজুদের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, জরিপ থেকে পাওয়া মজুদের প্রাক্কলন প্রকৃত মজুদের চেয়ে কম হয়; তবে কতটা কম তা সাধারণত অজানাই থেকে যায়।

মজুদের অবস্থা (Current status of fisheries reserves)

বর্তমান মজুদ নিরূপণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পরিস্থিতি বিবেচনায় দুই প্রকারের উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। আহরণ মাত্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুটি রেফারেন্স অবস্থার বিপরীতে মজুদের অবস্থা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিমাণগত তারতম্য বিশ্লেষণের গাণিতিক মডেল থেকে মজুদের একটি সম্ভাব্য হিসাব এবং বছর থেকে বছরে আহরণ ও

আহরণমাত্রার তারতম্যের বিশ্লেষণ থেকে মজুদের গতি-প্রকৃতির আভাস পাওয়া গেছে। অতীতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাতে ধৃত মাছের প্রতিবেদনের অপূর্ণতা উপাত্ত বিশ্লেষণে জটিলতা সৃষ্টি করেছে; যা ২০১১-১২ সালের পরে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই সমস্যার কারণে পরবর্তী সময়ে ধৃত মাছের পরিমাণে হঠাৎ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো ধৃত মাছের পরিমাণ হ্রাসের যে চিত্র এই বিশ্লেষণে ফুটে উঠেছে, বাস্তব পরিস্থিতি তার চেয়েও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার মাছের মজুদ ও আহরণের হার ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা প্রদর্শন করছে।

উপজাত হিসেবে ধরা হয় এমন কিছু মাছের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রমী প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ছোট আকারের পেলাজিক মাছ, বিশেষত সার্ডিন ও চাপিলার আহরণ বেড়ে যাওয়া দুশ্চিন্তার বিষয়। তবে এত স্বল্পমেয়াদি উপাত্ত থেকে এদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা কঠিন হলেও কিছু পর্যবেক্ষণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বটম ট্রলকে পর্যায়ক্রমে মিড-ওয়াটার ট্রলে রূপান্তরের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়ন শুরু হলেও প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় ভিন্নতর। এই রূপান্তরের উদ্দেশ্য ছিল ছোট আকারের সার্ডিন ও চাপিলা জাতীয় মাছের ক্রমবর্ধমান মজুদকে আহরণ করা। বাস্তবে যখন দেখা যায় যে মিডওয়াটার ট্রলে চিংড়িও ধরা পড়ছে, তাতে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মিডওয়াটার ট্রলগুলো বস্তুত কম গভীরতায় বটম ট্রল হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে; যার ফলে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য সার্ডিন ও চাপিলাও এখন অতিআহরিত হচ্ছে এবং তাদের মজুদও হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিগত ৩০ বছর ধরে সকল প্রকার চিংড়ির মজুদ ধারাবাহিকভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা প্রদর্শন করছে এবং বর্তমানে এদের মজুদ কিছুটা নিম্নশেষিত পর্যায়ে আছে।

বিগত ১২ বছর সময়ের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সবচেয়ে মূল্যবান বাগদা চিংড়ি ও হরিণা চিংড়ির মজুদ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। সাদা চিংড়ির মজুদও ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে হঠাৎ ২০১৩ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এরপর আবার হ্রাস পেতে থাকে। অন্যান্য চিংড়ি হিসেবে বিবৃত গ্রুপটিতে মূলত কম মূল্যমানের ও ক্ষুদ্রাকার চিংড়িগুলোকে ধরা হয়েছে। এ চিংড়িগুলোর আহরণের পরিমাণ বেড়েছে। এককথায়, মূল্যবান চিংড়ির আহরণ কমে গেলেও কম মূল্যবান চিংড়িগুলোর আহরণ বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দিয়েছে।

ইকোসিস্টেম বিষয়ক বিবেচনা (Ecosystem concern consideration)

সমুদ্র থেকে মৎস্য প্রজাতি নির্বিশেষে অতিআহরণ করেও সার্বিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখা, এমনকি বাড়ানোও সম্ভব। এটি ঘটে যখন ধীরে ধীরে বর্ধনশীল ও প্রজননশীল বৃহদাকার মাছগুলোর (যেমন- লাক্ষা) স্থান দখল করে ফেলে ক্ষুদ্রাকার, দ্রুত বর্ধনশীল ও প্রজননশীল মাছেরা (যেমন- সার্ডিন)। সাধারণত এসব ছোট মাছগুলোই সামুদ্রিক পরিবেশে বড় মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে এসব ছোট মাছের ক্রমান্বয়ে মজুদ বৃদ্ধি সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে; যা স্বল্প সময়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতেও পারে, আবার নাও পারে। সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে এই ধরনের পরিবর্তন স্থায়ী রূপ ধারণ করলে বড় ও দামী মাছের মজুদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।

ব্যবস্থাপনার সুপারিশমালা (Management Recommendations)

আধুনিক সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় প্রক্রিয়াভিত্তিক এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজনে সক্ষম ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের কৌশল গৃহীত হচ্ছে। বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মাত্র তিন ধরনের মাছ; যথা- রূপচান্দা, কলমো/মরিচা এবং সাদা পোয়া মাছ অতিরিক্ত আহরিত হচ্ছে না, অর্থাৎ প্রাক্কলিত এফ-রেশিও (F-ratio) ১.০ এর কম। এই তিনটি মাছের প্রতিটিকেই প্রকৃতপক্ষে অন্য মাছের সাথে ঘটনাক্রমে ধরা পড়া মাছ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যে ঈপ্সিত মাছগুলোকে ধরার উদ্দেশ্যে ফিসিং করা হয় সেগুলো হলো ফলি চান্দা, সার্ডিন/চাপিলা এবং বস্তার পোয়া। এই তিনটি কাঙ্ক্ষিত মাছের সব কটির মজুদই কিছুটা অতিরিক্ত আহরিত হচ্ছে এবং কিছুটা নিম্নশেষিত হয়ে যাবার পথে; বিশেষ করে বস্তার পোয়া মাছটি মারাত্মকভাবে আহরণের শিকার হচ্ছে। লাক্ষা মাছ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ও মূল্যবান মাছ এবং এই মাছটি অতিরিক্ত আহরিত হয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় যেকোনো মাছ বাণিজ্যিকভাবে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবার প্রবল ঝুঁকি থাকে এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করা না হলে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যাহোক এটি সুস্পষ্ট যে, বর্তমান মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অতিরিক্ত ও ক্রমবর্ধমান হারে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের অনুকূল পরিবেশ বজায় রেখে চলেছে। নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি রহিত করা এবং এদের সংখ্যা কমিয়ে আনা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ এবং তার সুফল পরিলক্ষিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু বছর ধরে ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সুফল পাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভেদি ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা করা প্রয়োজন, যদিও ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপটি হবে সবচেয়ে কঠোর এবং এর সুফলও হবে দীর্ঘমেয়াদি। ২০১৯ সালের মজুদ মূল্যায়ন ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের আলোকে এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্লেষণে মাছের মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশক হিসেবে স্ট্যান্ডিং বায়োমাস এবং সর্বোচ্চ আহরণমাত্রা (MSY) ব্যবহার করা হয়নি। কারণ এগুলো ব্যবহার করে মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনা বিশ্ব জুড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

মৎস্যসম্পদের নির্বাচিত কতিপয় গ্রুপের বর্তমান অবস্থার সারাংশ (Summery of present status of selective groups of fisheries resources)

কয়েকটি মাছের মজুদের অবস্থা নিম্নরূপ:

চান্দা মাছ: বিশ্লেষণে ব্যবহৃত অতীতের তথ্য উপাত্ত অপর্যাপ্ত ছিল বিধায় ফলাফলে বিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তথাপিও ২০০৯ সাল থেকে এই গ্রুপের মাছের প্রাচুর্য মারাত্মকভাবে কমে যাবার বিষয়টি প্রকৃত অবস্থারই প্রতিফলন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ফলি চান্দা (*Pampus argenteus*) কিছুটা

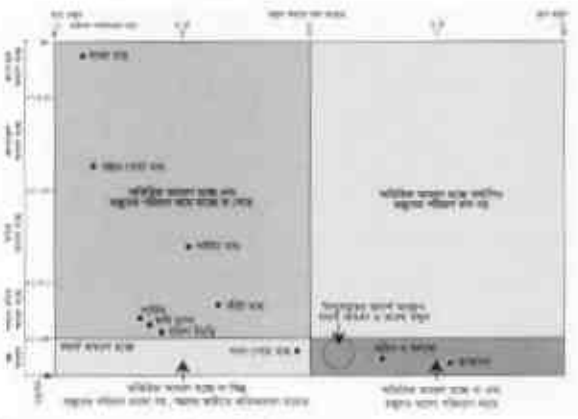

চিত্র: মাছসম্পদের কতিপয় নির্বাচিত গ্রুপের মজুদের অবস্থার সারাংশ চিত্রের উল্লম্ব অক্ষে (বামে) আহরণের কারণে মাছের মৃত্যুহার এবং অনুভূমিক অক্ষে (উপরে) মজুদের পরিমাণের একটি সূচক দেখানো হয়েছে। এ চিত্রে চারটি খণ্ডাংশ আছে, ডানদিকের সবুজ খণ্ডাংশে অবস্থিত বৃত্তটির ভেতর মাছের অবস্থান হলো সবচেয়ে ভালো অবস্থা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া যায়। বাম পাশের লাল অংশে অবস্থিত মাছগুলো অতিরিক্ত আহরিত হচ্ছে এবং বিশেষ ধরার পথে আছে।

অতিআহরিত এবং রূপচান্দা (*Pampus chinensis*) অতিআহরিত নয় মর্মে জানা যায়। তবে সার্বিকভাবে এ গ্রুপের উভয় মাছের আহরণ হার এবং মজুদ উভয়ই কমতির দিকে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব মাছের আহরণের হার কিছুটা কমিয়ে আনা গেলে এই মাছগুলো দ্রুতই আগের অবস্থায় ফিরতে পারবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র: রূপচান্দা মাছ

পোয়া মাছ: বিশ্লেষণে এই গ্রুপে ১০ প্রজাতির মাছকে বিবেচনায় ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে

চিত্র: পোয়া মাছ

প্রতীয়মান হয়েছে ২০০০ সালের পর হতে এদের মজুদ ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী। পোয়া মাছসমূহের আহরণ হার এবং মজুদ উভয়ই কমতির দিকে। অতিরিক্ত আহরণের ধরন ও হার প্রজাতি ভেদে ভিন্ন তবে কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে মারাত্মক অতিআহরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- বস্তার পোয়া (*Otolithes cuvieri*) মারাত্মকভাবে অতিআহরিত এবং পরিমাণে নিঃশেষিত। বড় আকারের ও অর্থকরী পোয়া প্রজাতিগুলোর মজুদ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মজুদের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আহরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে এবং এতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তবে সাদা পোয়া (*Pennahia anea*) অতিআহরিত নয় এবং এর প্রাচুর্যও বেশ সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

কাঁটা মাছ: এই গ্রুপে ৮ প্রজাতির মাছের তথ্য উপাত্তের গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০০ সাল থেকে এ মাছের মজুদ ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী। কাঁটা মাছসমূহের আহরণ হার এবং মজুদ উভয়ই কমতির দিকে। অতিআহরণের ধরন ও হার প্রজাতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে তা মারাত্মক পর্যায়ে রয়েছে। কাঁটা মাছ (*Arius* sp.) অতিআহরিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশেষিত। বড় আকারের প্রজাতিগুলোর মজুদ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মজুদের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আহরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে এবং এতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

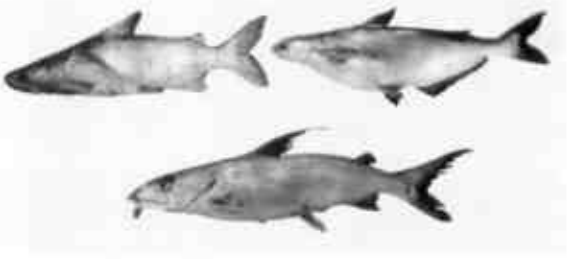

চিত্র: কাঁটা মাছ

লাক্ষা মাছ: অপর্যাপ্ত আহরণ উপাত্তের কারণে মাছটির জন্য মজুদের গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, লাক্ষা (*Leptomelanosoma indicum*) মারাত্মকভাবে অতিআহরিত এবং মজুদ প্রায় নিঃশেষিত। লাক্ষা হচ্ছে অন্যতম বড় ও অর্থকরী মাছগুলোর একটি এবং এর মজুদ বাণিজ্যিক বিলুপ্তি বা

চিত্র: লাক্ষা মাছ

সম্পূর্ণ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। এই মাছকে রক্ষা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

সার্ডিন: এই গ্রুপের আহরণ প্রধানত চাপিলা বা সার্ডিন-কে ঘিরে। বিশ্লেষণে ব্যবহৃত অতীতের তথ্য-উপাত্ত অপর্যাপ্ত ছিল বিধায় এই গ্রুপের মাছগুলোর জন্য মজুদের গাণিতিক বিশ্লেষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। মরিচা ও কলম্বো (*Dussumieria sp.*) সার্ডিন অতিআহরিত নয় এবং নিঃশেষিতও নয়। রেইনবো সার্ডিন মাছটি খুব কম পরিমাণেই আহরিত হচ্ছে উপজাত হিসেবে। সার্ডিনসমূহের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ছাড়াও এর উপজাত হিসেবে ধৃত মাছগুলো নিয়েও যথেষ্ট শংকার কারণ আছে। সার্ডিন বা চাপিলা (*Sardinella sp.*) সামান্য অতিরিক্ত আহরিত এবং বর্তমান মজুদ মারাত্মকভাবে নিঃশেষিত অবস্থায় রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

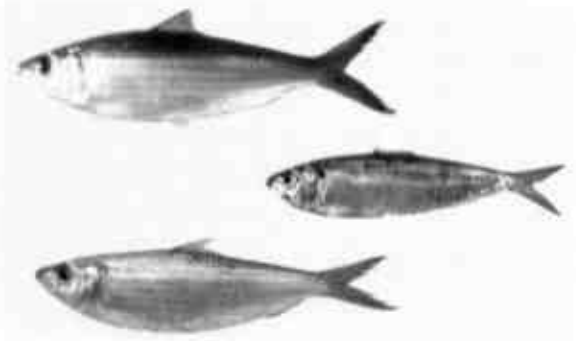

চিত্র: সার্ডিন মাছ

চিংড়ি: এই গ্রুপের বিশ্লেষণে ১০ এর অধিক প্রজাতির চিংড়ি বিবেচনায় ধরা হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে এর উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয় এবং প্রধান ৩টি প্রজাতি ভিন্ন ভিন্ন

চিত্র: চিংড়ি

এবং অন্য সকল প্রজাতিকে 'অন্যান্য চিংড়ি' হিসেবে তথ্য সংরক্ষণ শুরু হয়। প্রধানত পিনীডে (*Penaeidae*) গোত্রের চিংড়ির মোট মজুদের গতি ৩০ বছর ধরেই নিম্নগামী; বর্তমানে এদের মজুদ কিছুটা নিঃশেষিত পর্যায়ে রয়েছে। হরিণা চিংড়ি (*Metapenaeus monoceros*) কিছুটা অতিআহরিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশেষিত। ধৃত চিংড়ির প্রজাতির তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বেশি দামী চিংড়ির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, তাদের স্থান দখল করেছে কম দামী চিংড়ি।

উপসংহার (Conclusions)

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ইতোমধ্যে অতিআহরিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে কিছু প্রজাতির মাছের মজুদ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এদের মজুদ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা জরুরি। সবচেয়ে বেশি আহরিত প্রজাতিগুলোর মধ্যে আছে বৃহদাকার ও দামী মাছগুলো; যেমন- লাক্ষা, রূপচাঁদা, কাঁটা, বড় আকারের পোয়া মাছ ও বাগদা চিংড়ি। নতুন গবেষণা জাহাজ আরভি মীন সন্ধানী ২০১৬-১৭ সালে আংশিক জরিপসহ চার বছর জরিপ সম্পন্ন করতে পেরেছে। সীমিত সংখ্যক জরিপে সংগৃহীত উপাত্ত মাছের মজুদ ও প্রাচুর্যতায় কী পরিবর্তন ঘটছে তা জানার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে এই উপাত্ত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পরিচিতি, তাদের ভৌগোলিক ও পানির গভীরতাভেদে অবস্থান, দৈর্ঘ্য ও ওজনভিত্তিক বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ করে দিয়েছে। মাছের আকার বণ্টনের উপাত্ত থেকে কয়েকটি গ্রুপের মাছের পপুলেশন মর্টালিটি (মৃত্যুহার) নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য পরিসংখ্যান ব্যবস্থা উন্নত ও যথাযথ করার সুযোগ রয়েছে। যখন এই পরিসংখ্যান ব্যবস্থাটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হবে তখনই সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুসংহত, ব্যাপক ও সঠিক উপাত্ত ও পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হবে। এই ধরনের উন্নত উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। উন্নত পরিসংখ্যান ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলেও মৎস্যসম্পদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মজুদ নিরূপণের জন্য ভালো মানের তথ্য পাওয়ার নিমিত্ত আরও অপেক্ষা করতে হবে।

---

[1]পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। ইমেইল: sharifbd64@yahoo.co.uk)
[2]অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
[3]সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর এবং পিএইচডি ফেলো, ওশেন ইউনিভার্সিটি অব চায়না

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি

The Fourth Industrial Revolution : Prospects and Preparation for Fisheries Resources Development

ড. মোহাঃ সাইনার আলম

Abstract

The term 4th Industrial Revolution (4iR) encompasses a range of new, emerging and disruptive technologies such as Artificial Intelligence (AI), Blockchain, the Internet of Things (IoT), Big Data, and Drones, etc. It further provides revolutionary methods of organization, production and distribution based on digital transformation and automatization. Hence, these technologies have the potential to have a positive impact on the productivity and profitability of the fisheries sector. However, advanced technology has extended a helping hand. The emergence of the IoT has opened lucrative opportunities to improve efficiency and maintain the health of aquatic organisms. Along with IoT, remotely operated vehicles (ROVs), use of robots, drones and sensors for sustainable fish farming, and artificial intelligence for decision-making are also on the verge to alter the pace of aquaculture industry. Apart from this, augmented reality (AR), virtual reality (VR) and blockchain have made their way into the aquaculture industry. While the initial investment for these technologies is greater than conventional practices, technology can cut down maintenance costs and improve yields in the long run. With the help of advanced technology, bio-socio-economic problems aligned with aquaculture industry can be resolved, even sitting at workplace, simply by using real-time and need-based information. Indeed technological innovations offer a distinctive opportunity to improve fisheries and aquaculture management practices, which lead to improve resilient aquatic food systems. Aqua-farming is the world's fastest-growing food industry right now, and the rise in demand for protein and the ever-increasing human population accounts for this growth. Although aquaculture has been around for 4,000 years, the industry is still young and growing. To sustain the steady growth performance of the fisheries sector of Bangladesh, we need to prepare for what can be called the 4th Fisheries Revolution (or Aquaculture 4.0) in line with the 4iR.

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত আলোড়ন মানুষের চিন্তার জগত, পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান তথা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঘটাচ্ছে বিশাল পরিবর্তন। মানুষের জীবনধারা ও পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি ব্যাপকভাবে বদলে দিচ্ছে। জৈবিক, পার্থিব ও ডিজিটাল জগতের মধ্যেকার পার্থক্যের দেয়ালে চির ধরিয়েছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও আরো বহুবিধ উন্নত প্রযুক্তি মিলেই এ বিপ্লব। বিশ্ববাসী যখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তথা এসডিজি'র মূলমন্ত্র কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (*no one left behind*) সবাইকে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ঠিক তখনই এ বিপ্লবের ব্যাপকতা, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকতা ও এতদসংশ্লিষ্ট জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বের সরকারগুলোর সক্ষমতাকে বড় ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীনও করেছে। সর্বোপরি পুরো জীবনব্যবস্থাকেই প্রভাবিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই এ বিপ্লব মানবজাতির জন্য কাঙ্ক্ষিত ভালো পথই সৃষ্টি করবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4th Industrial Revolution or 4iR or Industry 4.0) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ ও স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরূপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরি করার জন্য বড় আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ (M2M) এবং ইন্টারনেট অব থিংসকে একসাথে করা হয়েছে।

জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরি করার সময় ২০১১ সালে সর্বপ্রথম চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (ফোরআইআর) শব্দটি প্রবর্তিত হয় এবং ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করা হয়। এই চতুর্থ যুগের জন্য এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করা হয় যেগুলো হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও বায়োলজি (সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস) কে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের অগ্রগতির ওপর জোর দেয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নিয়ামক হিসেবে প্রধানত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), বিগ ডেটা, ব্লকচেইন (Blockchain), ক্লাউড অ্যান্ড এজ কম্পিউটিং, রোবোটিকস অ্যান্ড কোবটস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR), অগমেনটেড রিয়েলিটি (AR), অটোনমাস ভেহিকেলস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক, জিনোমিকস অ্যান্ড জিন এডিটিং, বায়োটেকনোলজি, ন্যানো টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি প্রযুক্তিকে বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে ফোরআইআর হচ্ছে ফিজিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে ডিজিটাল সিস্টেমের মেলবন্ধনের অত্যাধুনিক মেকানিজম।

প্রথম শিল্প বিপ্লব: বাষ্প ও জল শক্তি ব্যবহার করে হস্তসাধিত শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়াকে মেশিন চালিত পদ্ধতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। এসময় প্রযুক্তির প্রয়োগে সময় লাগে প্রায় শত বছর (যা ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রে ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ সাল)। এর প্রভাব পড়ে বস্ত্র,

লৌহ, খনি ও কৃষি শিল্পে। এর সামাজিক প্রভাব মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ক্রমেই শক্তিশালী করে তুলে। সংগঠিত হয় মানব ইতিহাসের সেরা পরিবর্তন।

দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব: দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনা ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে (১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে)। এর মূলে ছিল রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তার, যা মানুষ এবং চিন্তা-ভাবনার দ্রুততর স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করেছিল। ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিক কারখানাগুলোকে আধুনিক প্রোডাকশন লাইন বিকাশের সুযোগ করে দেয়। এ সময় সবক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি দুর্দান্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সময়।

তৃতীয় শিল্প বিপ্লব: বিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে গোড়াপত্তন হয় তৃতীয় শিল্প বিপ্লব তথা ডিজিটাল বিপ্লব। কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে আরও ডিজিটাল অগ্রগতির সূচনা হয়। এ সময় যোগাযোগ প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সুপার কম্পিউটার। এ সময়ে উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কম্পিউটার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কারণে যন্ত্রপাতি মানব শক্তির জায়গা দখল করতে শুরু করে। ১৯৬০-৬৫ সালের দিকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ১৯৮৯-৯০ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (www) আবিষ্কার ম্যাজিকের মতো গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দেয়।

বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অন্যতম। বাংলাদেশে এ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে আগাম ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ বিপ্লবের ফলে দেশের মানুষের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবনমান বাড়বে। তথা পুরো জীবনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের সম্পর্কে বৃহত্তর রূপান্তর হতে পারে। এছাড়া মানুষ তার জীবনকে বেশি মাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ২০২০-২১ সালে মাছের মোট উৎপাদন ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া বৈচিত্র্যময় জলজসম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আগামী ২০৩১ সালে ৬৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০৪১ সালে ৮৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মৎস্যসম্পদের ঈপ্সিত উন্নয়নে এ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য। এ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রযুক্তির যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার যেন পরিবেশের ওপর ন্যূনতম প্রভাব ফেলে এবং কম খরচে অধিক ফলন ও নিরাপদ প্রাণিজ পুষ্টি নিশ্চিত করে সেদিকে নজর দিতে হবে। সে বিবেচনায় উন্নত বিশ্বে মৎস্যচাষ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে অনেকটা এগিয়ে।

ধারণা করা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা যাবে-

- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিবর্তিত হবে;
- এতদসংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি পাবে;
- প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ঠিক রেখে কম খরচে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে চাপ তৈরি হবে;
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে কর্মসংস্থান সংকুচিত করবে;
- এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুমিত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অদক্ষ বা আধা-দক্ষ জনবল কাজ হারাবে;
- অভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ও আমদানি-রপ্তানির ধরন পাল্টে যাবে;
- চলমান সরকারি ব্যবস্থাপনার ওপরও এর বিশাল প্রভাব পড়বে; এবং
- সর্বোপরি মৎস্য খাতের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত প্রায় ১২ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রভাবিত হবে।

ডেমোগ্রাফিক তথ্য মতে বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। তাছাড়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছর জুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড় হাতিয়ার। জনভিত্তিক এ শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। কাজেই সংগত কারণেই বলা যায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মক্ষম জনবলের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হলেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে আরও অধিক ও নতুন ধারার নানাবিধ কর্মক্ষেত্র।

কাজেই এখনই সময় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার নিমিত্ত ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া। পরিবর্তিত বিশ্বের চাহিদাকে সামনে রেখে বড় বড় টেক জায়ান্ট কোম্পানিগুলো (যেমন- গুগল, আমাজন,

চিত্র: আধুনিক মৎস্যচাষ পুকুর

আইবিএম, সিসকো ইত্যাদি) ফোরআইআর উপযোগী ডিভাইস প্রস্তুত করছে। কোন সেক্টরই এর আওতা বহির্ভূত নয়। বরং সেক্টর স্পেসিফিক ও সহজে ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সবাই অধিক তৎপর। বাংলাদেশে এসব উন্নত প্রযুক্তির চাহিদা থাকলেও স্থানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী লাগসই প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার খুবই সীমিত।

মৎস্যচাষ বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বাধিক দ্রুত-বর্ধনশীল খাদ্য শিল্প হিসেবেই বিবেচিত। এটি ঘটেছে মূলত নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ হিসেবে বিশ্বব্যাপী মাছের চাহিদা বৃদ্ধি এবং দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠী। উন্নতমানের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে সারা বিশ্বে মাছ জনপ্রিয়তার শীর্ষে এবং স্থানীয় ও বিশ্ব বাজারে মাছের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্কেট গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০২৫ সালের মধ্যে এ বাজার ৮৬.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হবে, যা ২০১৮ সালে ছিল ৬২.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার। মৎস্যচাষ চার হাজার বছরের একটি পুরানো শিল্প হলেও এ শিল্প এখনো তরুণ ও বর্ধনশীল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশে বিগত তিন দশকে এ উদীয়মান শিল্পের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাছচাষে এ দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে বরাবরই বেশকিছু চ্যালেঞ্জ ঈঙ্গিত বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এগুলো হলো- উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় পার্থক্য (yield gap), গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য ও উৎপাদন উপকরণের অপ্রতুলতা, মৎস্য খামারের ক্ষুদ্রায়তন ও বহুমালিকানা, উন্মুক্ত জলাশয় হ্রাস এবং পানির স্থায়ীত্বশীলতা কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবলের অভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

পাশাপাশি, ফোরআইআর বাস্তবায়নে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়, যেমন- প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের অভাব, দীরগতির ইন্টারনেট সেবা, সাশ্রয়ী মূল্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের অভাব, মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তা পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, ঈঙ্গিত মোটিভেশনের অভাব, আইন/বিধি/নীতিমালার যুগোপযোগীকরণ, ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও উন্নত-প্রযুক্তি একজন সহযোগী বা সাহায্যকারী হিসেবেই বিবেচিত হবে।

মৎস্যচাষে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং জলজজীবের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)-এর আবির্ভাব এক অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। সহজ ভাষায় আইওটি'র বাংলা অর্থ হলো বিভিন্ন যন্ত্রের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা বস্তুকে স্বয়ংক্রিয়করণের নিমিত্ত সকল যন্ত্রের সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম স্থাপন। আইওটি সেন্সর থেকে প্রাপ্ত তথ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে দেখতে পারে এবং করণীয় সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। আইওটি-এর সাথে সাথে মৎস্য শিল্পে আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিচের কয়েকটি প্রযুক্তি ব্যাপক ও দৃশ্যমান প্রভাব ফেলতে পারে-

রিমোটচালিত যানবাহন (Remotely Operated Vehicles-ROV): এসব যান আবির্ভূত হওয়ার ফলে পানির নিচের বস্তু খুব সহজেই দেখা যায় এবং মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়াই মাছের খামারের মনিটরিং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা যায়। খামার মালিক ঘরে বসেই খামারের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

চিত্র: রিমোটচালিত যানবাহন

মৎস্যচাষে রোবোটিক খাঁচা (Robotic Cages for Fish Farming): চাষকৃত মাছে রোগ-বালাই-এর উপস্থিতি চাষির জন্য সবসময়ই এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। এর ফলে খামারের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি খামারের উৎপাদন হ্রাস পায়। কাজেই সামনের দিনে মৎস্যচাষে রোবোটিক খাঁচার প্রচলন একটি বিকল্প ও লাভজনক উপায় হিসেবে দেখা দিবে। সমুদ্রে বা বৃহৎ জলাশয়ে এসব রোবোটিক খাঁচা ব্যবহার করে দক্ষতা ও সফলতার সাথে মাছচাষ করা যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থাপন ব্যয় বেশি হলেও সময়ের ব্যবধানে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

চিত্র: রোবোটিক খাঁচায় মৎস্যচাষ

মনিটরিং-এ ড্রোন (Drones to Take a Drive): সমুদ্রে বা বৃহৎ জলাশয়ে মাছচাষ সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। কাজেই রোবোটের মতই ড্রোন মানুষের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ড্রোন অনায়াসেই পানির নিচে প্রবেশ করে স্থাপিত জালের অবস্থা ও মাছের স্বাস্থ্য খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারে। মাছের মজুদ নিরূপণ ও পরিবেশগত বিশ্লেষণেও ড্রোনের ধারণকৃত তথ্য/ভিডিও বেশ সহায়ক। তাছাড়া

খামারের অবকাঠামোগত অবস্থা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা মনিটরিং-এ ড্রোনের বিকল্প খুব কম।

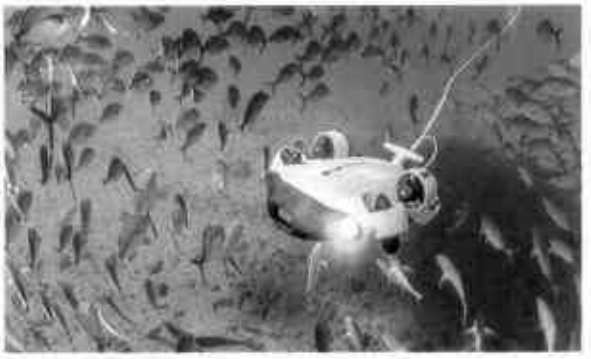

চিত্র: মৎস্যচাষে ড্রোন

স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষে সেন্সর (Sensors for Sustainable Fish Farming): সেন্সরে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধনের ফলে মাছচাষে অমীত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। রোবট ও ড্রোন উভয়ের ভিডিও ধারণের জন্যই শুধু উন্নত সেন্সর প্রয়োজনীয় নয়, বরং পানির নিচে বিচরণ, পানির পিএইচ ও অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীর তথ্য সংগ্রহের জন্য অপরিহার্য। বায়োসেন্সর (biosensors) এসব তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারে। এর ফলে চাষি খুব সহজেই ও দক্ষতার সাথে মাছচাষের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমানে ইফিশারি (eFishery) নামক একটি উন্নত প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা চাষিকে মজুদকৃত মাছের খাদ্য গ্রহণের অবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য দিতে সক্ষম। মজুদকৃত মাছ কতটা অভুক্ত এবং কতটুকু খাবারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা বলে দিতে পারে। পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ পরিমাপক ওয়্যারলেস সেন্সর (Real-time Water Quality Sensor) মূলত একটি কন্ট্রোল বক্সের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ডাটাসমূহ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সরবরাহ করে।

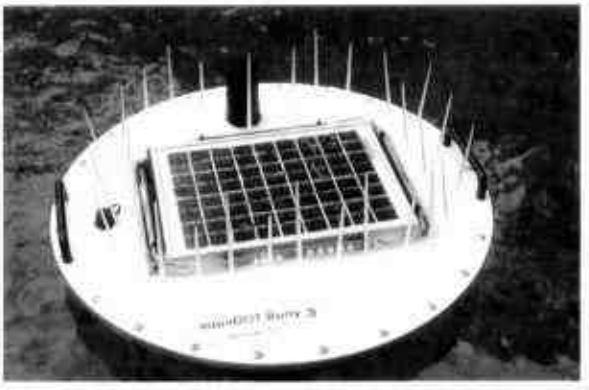

চিত্র: ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং সেন্সর

সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence for Decision Making- AI): সেন্সরে ধারণকৃত তথ্য ব্যবহার করে অনেক কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পানির দূষণ নির্ণয় এবং যথাসময়ে চাষিকে সতর্ককরণের মাধ্যমে মাছ চাষে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। বর্তমানের প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষের কিছুটা সম্পৃক্ততা থাকলেও ভবিষ্যতে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়িত হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। সামুদ্রিক জলাশয়ের টেকসই ব্যবস্থাপনার বিষয়টি দীর্ঘ সময় ধরে প্রত্যাশিত। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মাছের অতিআহরণ হ্রাস করার পাশাপাশি টেকসই আহরণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও মজুদকৃত পুকুরের পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ মাছ চাড়ার উপযোগী হয়েছে কি না, মাছে রোগ-বালাই দেখা দিয়েছে কি না এবং হলে কী ধরনের রাসায়নিক বা ঔষদ প্রয়োগ করতে হবে, মাছের আকার ও ওজন কতটুকু হয়েছে বা ধরার উপযোগী হয়েছে কি না, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খুব দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। মাছের খামার যান্ত্রিকীকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনেক উন্নত দেশেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ আজ দৃশ্যমান, যা খামার ব্যবস্থাপনাকে করেছে সহজ এবং উৎপাদন বেড়েছে কয়েকগুণ।

চিত্র: স্মার্ট ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং ডিভাইস

খাদ্য প্রয়োগে অটো ফিডার (Auto Feeder): মৎস্যচাষে খাদ্য বাবদ খরচ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। প্রচলিত পদ্ধায় খাদ্য প্রয়োগের ফলে শুধু খাদ্যের অপচয় হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে পানি দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রযুক্তি নির্ভর অটো ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে খাবার প্রয়োগ করা হলে খাদ্যেও অপচয় বহুলাংশে কমানো যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই এফসিআর বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে মাছ তার চাহিদা অনুযায়ী খাবার খাচ্ছে কিনা বা পাচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি খাবার বেশি হয়েছে না কম হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে ঘরে বসে পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

তাছাড়া রিসার্কুলেটিং একোয়াকালচার সিস্টেম বা রাস (Re-circulating Aquaculture System- RAS) একটি আধুনিক ও লাভজনক মৎস্যচাষ প্রযুক্তি হিসেবে দিনদিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে পুকুরের পরিবর্তে একাধিক বিভিন্ন আকৃতির ট্যাংক ব্যবহার হয় এবং একই পানি পুনরায়

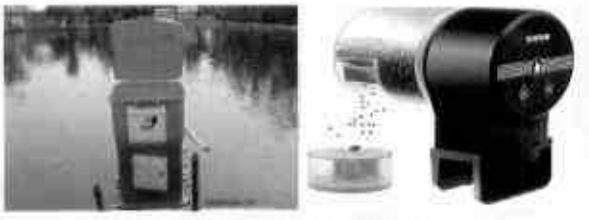

চিত্র: খাদ্য প্রয়োগে অটো ফিডার

ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রকম ফিল্টার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি স্থাপনে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ কিছুটা বেশি হলেও সময়ের ব্যবধানে ব্যবস্থাপনা ব্যয় সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ পদ্ধতিটি এখনো আইওটি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা না হলেও এসব আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন রাস পদ্ধতির মাছচাষকে আরো অধিক জনপ্রিয় ও লাভজনক করে তুলবে বলেই আশা করা যায়।

এছাড়াও ব্লকচেইন (Blockchain), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ও অগমেনটেড রিয়েলিটি (AR), ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তি মৎস্য শিল্পে তাদের পথ তৈরি করেছে। ব্লকচেইন ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম উন্নয়নের পাশাপাশি উৎপাদনকারীর আয় বৃদ্ধি ও মৎস্য শিল্পের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব প্রযুক্তির জন্য প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রচলিত চাষ ব্যবস্থার চেয়ে বেশি হলেও এর সঠিক ব্যবহার চাষ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমাতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র: রিসার্কুলেটিং অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম

ফোরআইআর বাস্তবায়নের পাশাপাশি উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

১. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
২. মৎস্য সেক্টরের জন্য স্বতন্ত্র বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Country Investment Plan- CIP) তৈরি এবং আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা;
৩. উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল স্তরে ফোরআইআর উপযোগী জনবল তৈরি করা;
৪. চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মাঝে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
৫. সহযোগিতামূলক গবেষণা (collaborative research) পরিচালনার পাশাপাশি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ এবং তা পর্যায়ক্রমে স্কেলআপ করা;
৬. চাষি পর্যায়ে প্রযুক্তিভিত্তিক হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;
৭. ফোরআইআর-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকল স্তরে ন্যূনতম খরচে দ্রুতগতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করা;
৮. ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ তথা একোয়াকালচার ৪.০ উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রবর্তনের নিমিত্ত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা; এবং
৯. ফোরআইআর সংশ্লিষ্ট ইনোভেশন ইকোসিস্টেম (innovation ecosystem) গড়ে তোলা।

চিত্র: ইনোভেশন ইকোসিস্টেম

উপসংহার (Conclusion)

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯৭০ কোটি, যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে প্রায় ২২ কোটি। কাজেই এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এসডিজি ২০৩০ অর্জনকে সামনে নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ তথা অ্যাকোয়াকালচার ৪.০-এর কর্মপরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে হবে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মৎস্যসেক্টরে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এখন সময়ের দাবী। এজন্য প্রয়োজন উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও নীতি-নির্ধারক সকল স্তরে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধ্যান-ধারণা পোষণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গবেষণায় ইতিবাচক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন। আশা করা যায়, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য খাত এগিয়ে থাকবে।

পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা (ই-মেইল: sainardof@yahoo.com)

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প : ইলিশ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন প্রেক্ষিত

Hilsa Development and Management Project : Perspective of Sustainable Development for Hilsa Fishery

মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী*, মোঃ মাহবুবুর রহমান* ও মোছাঃ শিরিন শীলা*

Abstract

Hilsa (Indian shad), the national fish of Bangladesh, is a renewable resource. The 'King of Fish' Hilsa has been declared as Geographical Indicator (GI) product of Bangladesh. Hilsa (*Tenualosa ilisha*) is the single fish species which contributes significantly to national fish production, employment and economic return. About 12.22% of the country's total fish production comes from hilsa. Hilsa production has been almost doubled over the 12 years; as a synergistic impact of the government's efforts, such as, the implementation of Jatka conservation program, ensuring enforcement of a ban period for brood hilsa in peak breeding season, vulnerable group feeding (VGF) program for fishermen in ban period, support with alternative income generating materials, establishing and management of six (06) hilsa sanctuaries of about 432 km covering six (06) coastal districts, observance of Jatka week, ceasing illegal fishing net by special operation, declaration of about 7000 sq. km area for uninterrupted breeding of hilsa, mass awareness program etc. As a result, hilsa production has been increased from 1.99 lakh MT in 2003-04 to 5.50 lakh MT in 2019-20. For sustainable Hilsa production, Government has taken Hilsa Development and Management Project-HDMP to be implemented for 04 years in 134 upazila under 29 districts. The project is designed to be provided with AIGA materials among 30,000 fisher family, residential training program for 18,000 beneficiaries and also 10,000 legitimate fishing net among fisher family. Other key interventions of the project include strengthening of Hilsa sanctuary management activities, public awareness program and ceasing illegal fishing net by special operation in the project command area etc., which are expected to be contributing sustainable development of hilsa fishery in the coming days.

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে বিশ্ববাজারে ব্যাপক সমাদৃত। একক প্রজাতি হিসেবে মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান প্রায় ১২.২২%। জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১% -এর বেশি। দেশের প্রায় ৫ লক্ষ লোক সরাসরি এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইলিশ সম্পদের সাথে জড়িত। ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৮০ শতাংশ আহরিত হয় বাংলাদেশে।

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির গতিধারা: সরকারের বিভিন্ন ইলিশবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিগত ১২ বছরে ইলিশের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৫.৬৫ মে.টন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.৩১%। ইলিশ উৎপাদন গতিধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিগত ২০০০-২০০১ সালে ইলিশের উৎপাদন ২.২৯ মে.টন থাকলেও ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ সালে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২.২০ মে.টন এবং ১.৯৯ মে.টন এ পৌঁছে। ২০০৩-০৪ সালে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হিলশা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান ২০০৫ সাল হতে বাস্তবায়নের ফলে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ৩.৫% হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ২০১৫ সালের পর থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.৫% হতে ৯.০% এ উন্নীত হয়।

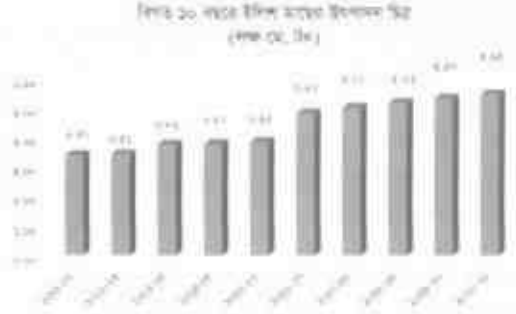

চিত্র: বিগত ১০ বছরে ইলিশ মাছের উৎপাদন চিত্র

ইলিশের পুষ্টিগুণ ও বাঙালির কৃষ্টি ঐতিহ্য: খাদ্যমান বিচারে ইলিশ উন্নতমানের আমিষ, ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডসমৃদ্ধ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ অত্যন্ত সুস্বাদু মাছ। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানে জড়িয়ে আছে এ মাছ। বাঙালীর প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ ভোজন বর্ষবরণের একটি অন্যতম ঐতিহ্যের অংশ। ইলিশের বিভিন্ন পদ যেমন- সর্ষে-ইলিশ, ইলিশ-পাতুড়ি, ইলিশ-ফ্রাই, ধুমায়িত ও লবণায়িত ইলিশ এবং উচ্চচাপে ঝাঁটা ছাড়া ইলিশ রন্ধন যার স্বাদ ও গন্ধ বাঙালির জিভে এনে দেয় জল।

ইলিশের প্রজাতি বৈচিত্র্য: ইলিশ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারের *Tenualosa* গণের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বে *Tenualosa* গণের ৫টি প্রজাতির (Species) মাছ পাওয়া যায়। *T. ilisha* প্রজাতির মাছ ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে প্রধানত বঙ্গোপসাগরের অঞ্চলের দেশসমূহে কখনও কখনও শ্রীলংকার উপকূল ও ভিয়েতনাম উপকূলে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রধানত ৩ প্রজাতির ইলিশ যথা *T. ilisha* সাধারণভাবে পরিচিত

চিত্র: গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ইলিশ প্রজাতি

ইলিশ নামে, সামান্য পরিমাণে *T. toli* বা চন্দনা ইলিশ এবং কালেভদ্রে *Hilsa kelee* প্রজাতি পাওয়া যায়। জেনেটিক এনালাইসিসের মাধ্যমে ইলিশের ২ টি মজুদ নিরূপণ করা হয়; যথা- সামুদ্রিক ও নদীর। এছাড়া মরফোমেট্রিক ও জেনেটিক অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের সমুদ্রসীমায় ইলিশের একটি অভিন্ন মজুদ পাওয়া যায়।

ইলিশের পরিপক্বতা ও বিচরণ পরিধি: ইলিশ অভিপ্রয়াণশীল মাছ। পদ্মা-মেঘনা অববাহিকা ও তৎসংলগ্ন মোহনা এবং সমুদ্র এলাকা ইলিশের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। সামুদ্রিক মাছ হলেও এদের জন্ম হয় স্বাদুপানিতে। জন্মের পর ডিম হতে পরিস্ফুটিত রেণু পোনা প্রাথমিক পর্যায়ে মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিচরণ করে। অতঃপর কিছুটা বয়প্রাপ্ত হয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে খাদ্যের জন্য অভিপ্রায়ণ করে। জাটকা (২৫ সেমি আকারের নিচের ইলিশ) অবস্থায় ৬-৭ মাস নদীর অপেক্ষাকৃত অগভীর ও কম স্রোতময় এলাকায় বিচরণ করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বর্ষার শুরুতে পানি ঘোলাটে হলে অধিকাংশ জাটকা পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার স্বাদুপানি পরিত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে মোহনা হয়ে সাগরের লবণাক্ত পানিতে পরিভ্রমণ করে এবং পরিপক্বতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সমুদ্রে অবস্থান করে। পরিপক্বতা লাভের পর প্রজননের জন্য স্বাদুপানিতে ফিরে আসে এবং প্রজনন শেষে পুনরায় সমুদ্রে ফিরে যায়। এভাবে স্বাদু ও লবণাক্ত পানিতে ইলিশের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়। আকার, বয়স ও পরিবেশভেদে ইলিশ মূলত প্ল্যাংকটন বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদকণা (প্রায় ২৭ প্রজাতির) ও প্রাণিকণা (প্রায় ১২ প্রজাতির) ভোজী। পুরুষ ও স্ত্রী ইলিশ সাধারণত ১+ বছর বয়সে পরিপক্বতা অর্জন করে, তবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও পরিপক্ব হয়। ইলিশ মাছ প্রায় সারা বছর প্রজনন করে থাকলেও ২টি সর্বোচ্চ (পিক) প্রজনন মৌসুম যথা অক্টোবর-নভেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ এ সর্বোচ্চ প্রজনন করে। মাছের বয়স ও আকারভেদে ডিম ধারণক্ষমতার তারতম্য হয় এবং দৈর্ঘ্য ও ওজনের সাথে ডিমের পরিমাণ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বয়স ও আকারভেদে একটি পরিপক্ব ইলিশ মাছ হতে ২.৫ হতে ২৭ লক্ষ ডিম পাওয়া যায়।

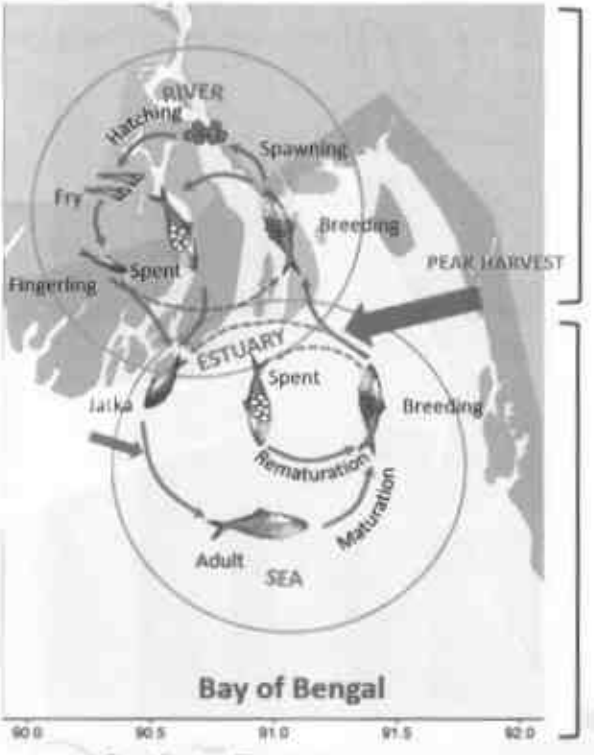

চিত্র: ইলিশের অভিপ্রয়াণ (Hossain et al. 2018)

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ (Govt. initiatives for inreasing the hilsa production)

১. হিলসা ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (HFMAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: সহনশীল মাত্রায় ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০০৩-০৪ সালে মৎস্য অধিদপ্তর চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম হিলসা ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (HFMAP) প্রণয়ন করে। কর্মপরিকল্পনায় ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ইলিশের জীবন আচরণ ও বিস্তৃতির এলাকা নির্ধারণ, প্রজনন মৌসুম ও প্রজননক্ষেত্র নির্ধারণ, অভয়াশ্রম এলাকা ঘোষণা, মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ ও জাটকা আহরণকারী জেলেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুনর্বাসনে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ সংশোধন, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক উদ্যোগ এবং সহযোগিতার রূপরেখা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করে।

২. ইলিশ সম্পদের টেকসই উন্নয়নে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ সংশোধন: জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ সংশোধন করে সময়োপযোগী করা হয়। যেমন:

- জাটকা সংরক্ষণে প্রচলিত আইন সংশোধন করে প্রতি বছর ০১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ৮ মাস জাটকা ধরা, পরিবহন, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ করা হয়।
- জাটকার দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
- ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম আশ্বিন মাসের ১ম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার সাথে মিলিয়ে পুনঃনির্ধারণ করে ২২ দিন সারাদেশে মা ইলিশ ধরা, পরিবহন, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করা হয়।
- ইলিশ আহরণের জন্য ৬.৫ সেমি (২.৬ ইঞ্চি) অপেক্ষা ছোট ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
- ০৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য ৪৩২ কি. মি।
- প্রধান প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব মা ইলিশ যাতে নিরাপদে ডিম ছাড়তে পারে সে লক্ষ্যে প্রায় ৭০০০ বর্গ কিমি এলাকায় ০৪টি প্রজননক্ষেত্র ঘোষণা করা হয়।

৩. জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় আইন বাস্তবায়ন

ক. জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা: মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর আওতায় জাটকা রক্ষায় প্রতিবছর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে ১৯৮১টি মোবাইল কোর্ট ও ১২১৩৯টি অভিযান পরিচালনা করে ২২২.৭২ মে.টন জাটকা ও ১৩৮৪.০৯ লক্ষ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়।

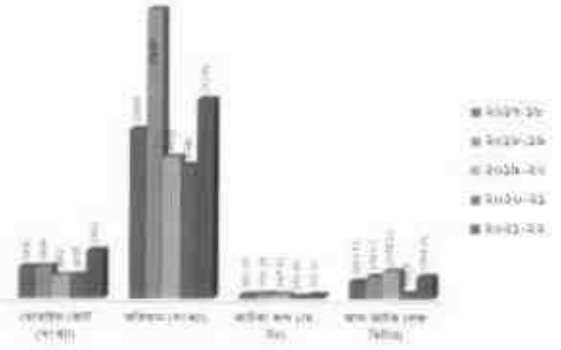

চিত্র: জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম

খ. মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম: ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২০১১ সাল থেকে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এর আওতা বৃদ্ধি করে ২০২১ সালে ৩৮ জেলার ১৭৪টি উপজেলায় ২,১১৪টি মোবাইল কোর্ট ও ১৬,৮৫৫টি অভিযান পরিচালনা করে ৩৩.০১ মে.টন ইলিশ মাছ ও ৯৫০.০৪ লক্ষ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়।

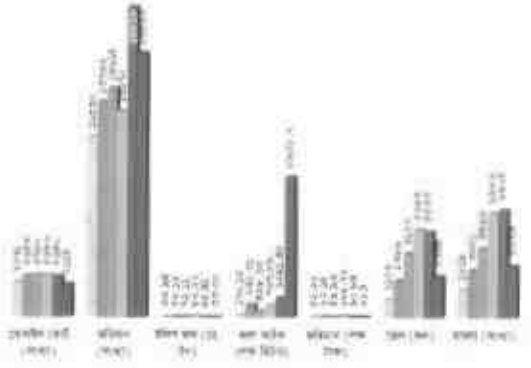

চিত্র: প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণে পরিচালিত কার্যক্রম

গ. বিশেষ সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা: উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জালসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি নির্মূলে ২০২২ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ২ ধাপে ১৫ দিন করে মোট ৩০ দিন ব্যাপী 'বিশেষ সম্মিলিত অভিযান' নামে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে এ কার্যক্রম উপকূলীয় ০৩টি জেলায় শুরু হলেও ২০২২ সালে এর আওতা বৃদ্ধি করে ১৭টি জেলায় ৮৮৪টি মোবাইল কোর্ট ও ৩৫৪৬টি অভিযানে ৪২১৭টি বেহুন্দি জাল, ৪৬৯.৫২ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল আটকের পাশাপাশি ৮২.৫১ মে.টন জাটকা ও অন্যান্য মাছ জব্দ করা হয়।

চিত্র: অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন

ঙ. জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে ভিজিএফ কার্যক্রম পরিচালনা: ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়কে নিষিদ্ধ সময়ে জাটকা ধরা থেকে বিরত রাখতে মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশলের অংশ হিসেবে ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম (ভিজিএফ)-এর মাধ্যমে চাল প্রদান শুরু করে। বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে জাটকা সংরক্ষণ এলাকা এবং ভিজিএফ-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ২০২১-২২ সালে জাটকা সংরক্ষণ মৌসুমে ৪ মাস (ফেব্রুয়ারি-মে) ব্যাপী প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে ৩,৯০, ৭০০টি জেলে পরিবারের মাঝে ৫৯,১৪১.০৪ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ২০১৬ সাল থেকে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে আহরণ থেকে বিরত রাখতে ভিজিএফ এর মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে এবং বর্তমান সরকার

চিত্র: জাটকা আহরণে নিষিদ্ধ সময়ে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা

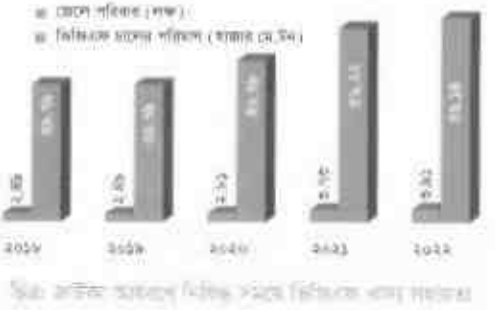

চিত্র: ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা (প্রধান প্রজনন মৌসুম)

পর্যায়ক্রমে এর আওতা বৃদ্ধি করে। ২০২১ সালে ৩৮টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় ৫,৫৫,৯৪৪টি জেলে পরিবারকে ১১,১১৮.৮৮ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়।

৫. মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে অভয়াশ্রম ও প্রজননক্ষেত্র ঘোষণা: ইলিশ সম্পদের টেকসই উন্নয়নে বর্তমান সরকার ঘোষিত বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, লক্ষীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় ৬টি অভয়াশ্রমে মাছ আহরণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব মা ইলিশ যাতে নিরাপদে ডিম ছাড়তে পারে সে লক্ষ্যে ২০১৪ সালে নিম্নবর্ণিত ৪টি এলাকা প্রজননক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ক. শাহেরখালী হতে হাইতকান্দী পয়েন্ট (মিরানী পয়েন্ট) যা মিরসরাই উপজেলার অন্তর্গত

খ. উত্তর তজুমদ্দিন হতে পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট যা তজুমদ্দিন উপজেলার অন্তর্গত

গ. উত্তর কুতুবদিয়া হতে গন্ডামারা পয়েন্ট যা কুতুবদিয়া উপজেলার অন্তর্গত

ঘ. লতা চাপালি পয়েন্ট যা কলাপাড়া উপজেলার অন্তর্গত

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (Adoptin and Implementation of Hilsa Development and Management Project)

জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য ইলিশের স্থায়িত্বশীল আহরণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত **'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা'** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে একনেক সভায় ৪ বছর মেয়াদে অনুমোদিত হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে কার্যক্রম শুরু করে। দেশের পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার ইলিশসমৃদ্ধ ২৯ জেলার ১৩৪টি উপজেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চিত্র: ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কেন্দ্রীয় অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

১. সচেতনতামূলক সভা

- জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় সচেতনতা সভা আয়োজন: সহনশীল ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় সর্বস্তরের মানুষের গণসচেতনতা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রকল্প হতে নির্ধারিত ১৩৪টি উপজেলায় জেলে, মাছ বিক্রেতা, আড়তদার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গণমাধ্যমকর্মীর অংশগ্রহণে প্রতি বছর ২টি করে প্রকল্প মেয়াদে মোট ১০৭২টি সচেতনতা সভা বাস্তবায়ন করা হবে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে ২৬৮টি সচেতনতা সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ইলিশ অভয়াশ্রমের গুরুত্ব ও সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা সভা আয়োজন: দেশের বিদ্যমান ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম সংলগ্ন ১৫৪টি ইউনিয়নে ইলিশ অভয়াশ্রমের গুরুত্ব ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রতি বছর ২টি করে প্রকল্প মেয়াদে মোট ১২৩২টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬টি অভয়াশ্রম সংলগ্ন ১৫৪টি ইউনিয়নে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ মৌসুমে মোট ৩০৮টি সচেতনতা সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় অংশীজনের অংশগ্রহণে সচেতনতা সভা

২. জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উপকরণ বিতরণ: জেলে সম্প্রদায় বিশেষত ইলিশ আহরণকারী জেলেরা দরিদ্র এবং সমাজের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী। তাদের একমাত্র পেশা মাছ ধরা। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ও জাটকা সংরক্ষণে নিষিদ্ধ সময়ে জেলেরা প্রায় ০৯ মাস অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটায়। প্রকল্প থেকে দরিদ্র জেলেদের আপদকালীন অবস্থার উন্নয়নে সামাজিক

নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাটকাসমৃদ্ধ ১০৭টি উপজেলায় জেলেদের চাহিদার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপযোগী বিকল্প পেশায় নিয়োজিত করার জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২০৯৪টি জেলে পরিবারকে উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৩০,০০০টি ইলিশ আহরণকারী জেলে পরিবারকে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জনপ্রতি ২৫,০০০.০০ টাকা মূল্যমানের উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ বিতরণ

৩. বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুফলভোগী প্রশিক্ষণ: বিতরণকৃত উপকরণসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রকল্প মেয়াদে ১৮,০০০ জন সুফলভোগী জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত হাতে-কলমে ট্রেডভিত্তিক ও দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৮টি ব্যাচে ১২০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী জেলেদের অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী জেলেদের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান

৪. জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে আইন বাস্তবায়ন: জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের জন্য নদী, হাট-বাজার, মাছ ঘাট, আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা অপরিহার্য। জাটকা ও মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রকল্প হতে অবৈধভাবে মাছ আহরণ বন্ধে মোবাইল কোর্ট, কম্বিং অপারেশন, ক্রাশ প্রোগ্রাম ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১৬,৬১৬টি অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি দেশের উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৭১টি উপজেলায় ১,২৭৮ টি ক্রাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জাটকা সংরক্ষণ মৌসুমে ৩০৩০টি আইন বাস্তবায়ন করা হয়। আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে প্রকল্প হতে ১৯টি জেলায় ১৯টি ফাইবার রি-ইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) বোট সরবরাহ করা হবে।

৫. ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ: জাটকা ইলিশের নার্সারি গ্রাউন্ড সুরক্ষার জন্য সারা দেশে ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম রয়েছে। নিষিদ্ধ সময়ে জেলেরা যেন অবৈধভাবে অভয়াশ্রমসমূহে মাছ আহরণ করতে না পারে সে লক্ষ্যে ব্যাপক সচেতনতামূলক সভা বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রতিটি

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় ইলিশ অভয়াশ্রমে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন

ক্রমিক নং	ইলিশ অভয়াশ্রমের এলাকা	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
১	চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
২	ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখার ৯০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৩	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত (তেঁতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিমি এলাকা	প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি
৫	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া - ভেদরগঞ্জ অংশে নিম্ন পদ্মার ২০ কিমি এলাকা	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৬	বরিশাল জেলার হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ, ও বরিশাল সদর উপজেলার কালাবদর, গজারিয়া ও মেঘনা নদীর প্রায় ৮২ কিমি এলাকা	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল

ইউনিয়নের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সকল মাছ ধরার নৌকা আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও প্রকল্প থেকে প্রতিটি অভয়াশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫ জন পাহারাদার নিযুক্ত করে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে যাতে নিষিদ্ধ সময়ে কেউ মাছ ধরার সুযোগ নিতে না পারে।

৬. জাল বিতরণ: দেশের উপকূলসহ সকল নদীতে কিছু অসাধু জেলে মাছ ধরার কাজে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার অবৈধ ও জাল এবং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে। চরঘেরা জাল, বেহুন্দি জাল ও কারেন্ট জাল সবচেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। এছাড়াও ইলিশ আহরণে ক্ষতিকর মশারি জাল, চটজাল, টানা জাল, টং জাল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এ ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে অবৈধ ও ধ্বংসাত্মক জাল বা ট্র্যাপ ব্যবহারকারী জেলেদের অবৈধ জাল ধ্বংস করে জাল বিতরণের জন্য অত্র প্রকল্পে সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে ৭টি জেলায় (যথা- বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও নোয়াখালী) অবৈধ জাল ধ্বংস করে ১০,০০০টি জাল বিতরণ করা হবে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১০০টি ইলিশ জাল বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় ইলিশ জেলেদের মাঝে জাল বিতরণ

সহনশীল মাত্রায় ইলিশ উৎপাদনে চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges in sustained Hilsa production)

- আবাসস্থল ধ্বংস ও দূষণের কারণে ইলিশের অভিপ্রয়াণ পথ পরিবর্তন;
- অত্যধিক মাত্রায় জাটকা ও মা ইলিশ আহরণের ফলে পুনঃসংযোগ বা প্রবেশন প্রক্রিয়া ব্যাহত;
- নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে অভিপ্রয়াণে বাধা;
- ইলিশ আহরণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী নিরূপণ;
- ইলিশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- দূষণের ফলে পানির গুণাগুণ পরিবর্তনজনিত কারণে অভয়াশ্রমসমূহের কার্যকারিতার প্রভাব নিরূপণ;
- প্রজনন ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত কার্যকারিতা নিরূপণ এবং পুনঃনির্ধারণ; এবং
- আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নিরূপণ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় (Way-forward to meet the challenges)

- ইলিশের আবাসস্থল উন্নয়ন ও অভিপ্রয়াণ পথ নির্ণয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- মাছের অভিপ্রয়াণ পথ সচল রাখতে নদী মাস্টার ড্রেজিংকরণ;
- ইলিশের অভিপ্রয়াণ পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন;
- ইলিশ আহরণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা ও আহরণের উপর নির্ভরশীল জেলেদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
- স্থানীয় কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান অভয়াশ্রমে ইলিশের বিচরণের ওপর প্রতিবেশগত (ইকোলজিক্যাল স্টাডি) প্রভাব নিরূপণ ও অভয়াশ্রম পুনঃনির্ধারণে গবেষণা;
- ইলিশের বিদ্যমান প্রজননক্ষেত্রে প্রজননের প্রতিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও পুনঃনির্ধারণে গবেষণা; এবং
- আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

উপসংহার (Conclusion)

নদীমাতৃক বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইলিশ সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন বিগত ১২ বছরে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা সৃষ্টি, মা ইলিশের নির্বিঘ্নে প্রজনন, জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা, প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি কৌশলগত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঙালির "মাছের রাজা ইলিশ" এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

[১]প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর (ইমেইল: pdilishproject@gmail.com)
[২]উপপ্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
[৩]সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

দেশি মাছের বিলুপ্তি : বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

Extinction of the Indigenous Fishes : Present Status and Future Initiatives

ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ

Abstract

Recent achievement in fish production in Bangladesh is highly commendable. The country has attained a production of 45.03 lakh MT of fish in 2019-20. The production achieved principally from two sources viz., aquaculture in inland closed waters and capture in inland open and marine waters. However, although the total production is being increased from year to year, the proportionate amount of contribution of productions from capture to the total is being dwindled. This is alarming; not only from the point of view of capital value of the quantum and nutrition supply but most importantly from the point of the loss of local fishes' had biodiversity attributed to the habitats degradation and genetic variability loss of the fish populations. In this chronicle the life cycles and the environmental cues of the open water species have been narrated; the degradation issues of natural fish habitats and fish biodiversity have been discussed. The rivers, beels, haors and floodplains are the local fishes' focal biodiversity hubs. To protect the local fishes from being eliminated, vigorous conservation programs and plans in the waters are the needs of the time now; the important lessons learnt from the ECOFISH project for hilsa conservation of DoF can enlighten the task.

মাছ আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আমাদের খাদ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মাছের ভূমিকা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে মাছের অবদান ৩.৫৭%; কৃষিজ জিডিপিতে ২৬.৫০% । আমাদের মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রাম আর তাতে প্রাণিজ আমিষের ৬০ শতাংশের যোগান আসে। একটি বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী - ১ কোটি ৯৫ লক্ষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এ খাতে নিয়োজিত যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশেরও বেশি; এর মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ নারী। বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। নিম্নবর্ণিত চিত্রে দেখা যায়, বিগত ২০ বছরে দেশে মাছের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে এবং এ বৃদ্ধি গড়ে ৫% হারে সাধিত হয়েছে।

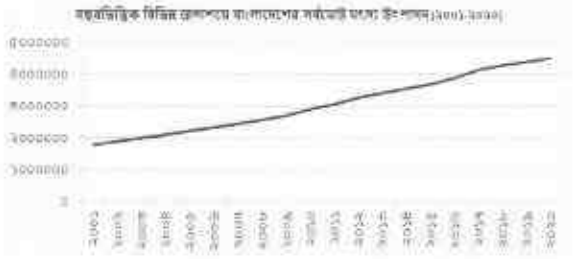

চিত্র: বিগত ২০ বছরে দেশে মাছ উৎপাদনের চলমান ধারা

মৎস্য উৎপাদনের খাত বিবেচনায় বাংলাদেশ সৌভাগ্যবান। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো আমাদের মুক্ত সমুদ্রাঞ্চল ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরভাগে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি, কাপ্তাই হ্রদ ও সুন্দরবনের জলাঞ্চল ছাড়াও রয়েছে অনেক পুকুর-দীঘি ও দেশের মোহনাঞ্চলে চিংড়ির ঘের। দেশে মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ হেক্টর ও ৮ লক্ষ হেক্টর। বিগত ২০২০-২১ বছরে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১৩.০১ লক্ষ মে.টন (২৮.১৬%), সামুদ্রিক আহরণ হয়েছে প্রায় ৭ লক্ষ মে.টন (১৫%) এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষে উৎপাদন হয়েছে ২৬.৩৮ লক্ষ মে.টন (৫৭.১০%); মৎস্যচাষে ও সামুদ্রিক আহরণে যথাক্রমে ২.১২ ও ১.৫১% হারে বৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সত্তর-আশির দশকে এ চিত্র ছিল অধিকতর উল্টো। মাছের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়লেও মোট উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আহরণের অবদান চাষের তুলনায় ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে যা আদতে দুঃশ্চিন্তার বিষয়।

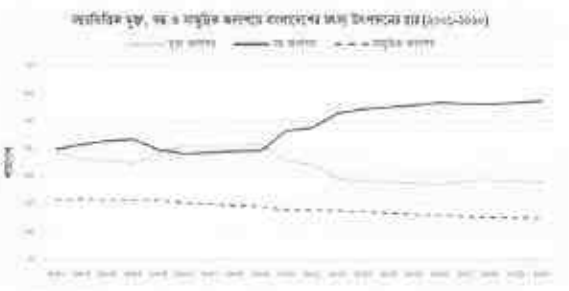

চিত্র: বিগত ২০ বছরে বাংলাদেশে মোট মাছ উৎপাদনে চাষের এবং আহরণের তুলনামূলক অবদান

উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যায়, ২০০১ সাল কিংবা তারও আগে থেকে মোট উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আহরণের তুলনামূলক অবদান ক্রমাগতভাবে কমে গিয়ে ২০০৪-০৫ সাল থেকে তা বেড়ে যায় এবং তা চাষের অবদানকে টপকে গিয়ে ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে। পরবর্তীতে ২০১১-১২ অবধি তা নিম্নগামী থেকে যায় এবং তারপর থেকে বলতে গেলে একই ধারায় চলছে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের অবদানের অবস্থাও বলতে গেলে একই রকম। মুক্ত জলাশয় - অভ্যন্তরীণ নদী, হাওর-বিল ও প্লাবনভূমির পরিবেশ প্রতিবেশের ক্ষতির কারণে দেশের মৎস্য জীববৈচিত্র্যের ওপর চাপ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অনেক প্রজাতির প্রাপ্যতা আশংকাজনকভাবে কমে গেছে; অনেকগুলো একেবারে হারিয়ে যেতে বসেছে; দেশি

মাছের বিলুপ্তি রোধের বিষয়টি তাই আলোচনায় এসেছে। সরকার দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মুক্ত জলাশয়ের (৩৯ লক্ষ হেক্টর) উৎপাদনের তুলনামূলক অবদান ক্রমাগত কমতে থাকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনয়নপূর্বক ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী। দেশি প্রজাতির মাছের বিলুপ্তির সম্ভাব্য কারণসমূহ খুঁজে বের করা এবং তদনুযায়ী মুক্ত জলাশয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উপায় খুঁজে দেখার সময় এসেছে। মুক্ত জলাশয়ের আঞ্চঃ সেক্টর ব্যবস্থাপনা-পরিকল্পনার মধ্যে দুর্বলতাও আছে কিনা তাও খুঁজে দেখা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনার মান বাড়াতে না পারলে তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা না গেলে দেশী প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধ করা সম্ভব নয়।

মুক্ত জলাশয়ের মাছের জীবনচক্র ও আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ (Life cycle of open water fishes and our environment)

মুক্ত জলাশয়ের মাছের স্বার্থের সাথে অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরের সংঘাতের ভৌগোলিক ও জৈব-প্রতিবেশিক অভিঘাত বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন। প্রথমত, কৃষির সাথে মুক্ত জলাশয়ের মাছের স্বার্থের বিষয়টি একেবারে প্রাথমিক এবং এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্লাবনভূমি ও বিল-হাওরের নিচু এলাকায় কৃষির জন্য বর্ষার প্রথম প্লাবন ধ্বংসাত্মক হলেও সাধারণভাবে সব মাছের প্রজনন প্লাবন ছাড়া সম্ভবই নয়। মৌসুমের প্রথম প্লাবনের সময় প্রায় সব প্রজাতির মাছ প্রজননের উদ্দেশ্যে প্লাবনভূমি, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় থেকে স্রোতের প্রতিকূলে নদীর দিকে অভিপ্রয়াণ (migration) করে এবং এক পর্যায়ে নদীর দু'কূলের প্লাবিত এলাকার কোনো সুবিধাজনক অগভীর জায়গায় তারা ডিম ছেড়ে দেয়। ডিম থেকে উৎপাদিত পোনা মাছ ঐসব অঞ্চলের অগভীর পানিতে উৎপন্ন প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। বন্যা শেষে ৩-৪ মাসে প্লাবনভূমির পানি কমতে শুরু করলে ঐসব ব্রুডসহ নতুন প্রজন্মের মাছ শীতের শুকনো মৌসুমে বিল, হাওর, প্লাবনভূমির অপেক্ষাকৃত গভীর অংশে আশ্রয় নেয়। শুকনো মৌসুমে এসব জলাশয়ে তীব্রভাবে মাছ ধরা পড়ে; ফিসিং মর্টালিটি থেকে রক্ষা পাওয়া মাছগুলো পরবর্তী মৌসুমে আবারও বর্ষার প্রথম প্লাবনে প্রজননের জন্য একই রকম অভিপ্রয়াণ সম্পন্ন করে। বস্তুত, বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদীর দু'কূলে বাঁধ দেওয়ার কারণেই দেশের মুক্ত জলাশয়ের আলোচ্য প্রজনন অভিপ্রয়াণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মৎস্য জীববৈচিত্র্যের ওপর কুঠারাঘাতটি এসেছে। অতীতে বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনায় মাছের স্বার্থ বিবেচনায় আনা হলে কিছু আপস রফা হলেও হতে পারতো কিন্তু তা হয়নি।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও প্রাকৃতিক নানা কারণে ভূমিক্ষয়ের ফলে হাওর, বিল ভরাট হয়ে যাওয়া, বিল, হাওর ও প্লাবনভূমির পানি শীতকালীন সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে জলাশয় শুকিয়ে ফেলা, নদী/খাল মুখে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে মাছের স্বাভাবিক বিচরণে বাধা দেয়া, কীট/বালাইনাশক ব্যবহারের কারণে পানি দূষণ, অতিআহরণ, এমনকি সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলা, স্থানীয় সরকার বিভাগের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড - পুল/ব্রীজ, রাস্তাঘাট, ইমারত, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণের কারণেও স্থানীয় পর্যায়ে মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং মাছের সাধারণ বিচরণ ও প্রজনন-অভিপ্রয়াণে বিঘ্ন ঘটেছে; যা মৎস্য জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির কারণ হয়েছে।

চ্যালেঞ্জের মুখে মৎস্য জীববৈচিত্র্য (Fish bio-diversity at a stake)

জীববৈচিত্র্য একটি বহুল কথিত শব্দ। এটি জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। কেনো এবং কী কারণে আমাদের মৎস্য জীববৈচিত্র্য আজকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তার সঠিক উপলব্ধি, এ মতবাদের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি সম্যক জানার ওপর নির্ভর করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মোট কত সংখ্যক প্রজাতি আছে, এক কথায় সেটিই হলো সে এলাকার জীববৈচিত্র্য। তেমনি কোনো জলায় বা জলাঞ্চলে কত প্রজাতির মাছ বর্তমানে আছে তা সেই জলার/জলাঞ্চলের মৎস্য জীববৈচিত্র্য। কিন্তু এটুকু বললেই বিষয়টি সম্পূর্ণ হয় না। এর বায়োলজি উপলব্ধির জন্য এর সাথে আরো দু'টি নিতান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো ঐ জলাঞ্চলের নির্দিষ্ট কোনো প্রজাতির জেনেটিক ভ্যারিয়েবিলিটি অর্থাৎ ঐ প্রজাতি-পপুলেশনে বিভিন্ন জিনের প্রকরণ বা বৈচিত্র্য কেমন কিংবা বিভিন্ন জিনের পৌনঃপুনিকতা বা ফ্রিকোয়েন্সি কেমন তা জানতে হবে। পপুলেশনের জিনের প্রকরণ বা বৈচিত্র্যের অবস্থা, অন্তঃপপুলেশন ভ্যারিয়েবিলিটি (within population variability) এবং আন্তঃপপুলেশন ভ্যারিয়েবিলিটি (between populations variability) - এ দুই প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো আলোচিত জলাশয়ের পরিবেশ-প্রতিবেশিক প্রকরণ বা বৈচিত্র্য (ecological variability) কেমন তা জানতে হবে। এ তিনটি বিষয় একত্রে মিলেই আসলে জীববৈচিত্র্যের আলোচনার পাঠ। এগুলোর একটিকেও বাদ রেখে জীববৈচিত্র্য আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

আমাদের মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ও মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতার কারণে মৎস্য জীববৈচিত্র্য কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। মাছের কৃতি (performance) এবং কল্যাণের (wellbeing) জন্য প্রজাতি-পপুলেশনের জেনেটিক বৈচিত্র্য (genetic variation) এবং পরিবেশের বৈচিত্র্যের (ecological variation) উপস্থিতি আদর্শিক অবস্থায় থাকা আবশ্যক। প্রাথমিকভাবে পরিবেশের ক্ষতির কারণে মাছের স্বাভাবিক জীবনচক্রে ব্যাঘাত ঘটে; ফলে প্রজাতির প্রাচুর্য দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে; পপুলেশন অন্তঃপ্রজননিত (inbred) হতে থাকে ফলে জিনের ফ্রিকোয়েন্সির হার অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এ অবস্থাকে পপুলেশন বটলনেক (population bottleneck) বা বটলনেক ইফেক্ট (bottleneck effect) বলা হয়। বটলনেক অবস্থায় পতিত হলে একটি প্রজাতি প্রকৃতিতে টিকে থাকার (adaptation) ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; তার প্রজনন, বর্ধন, এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায় এবং ক্রমান্বয়ে তারা বিলুপ্তির (extinction) পথে চলে যায়।

এদেশের মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশের পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে দেশি প্রজাতির মাছের জীববৈচিত্র্যের নাজুক অবস্থাই নির্দেশ করে। IUCN (International Union for Conservation of Nature) ২০০০ সালে এবং ২০১৫ সালে

যথাক্রমে এদেশের ২৬৬টি ও ২৫৩টি মাছের প্রজাতির জৈব-প্রতিবেশিক অবস্থা পরিমাপ করে যথাক্রমে ৫৪টি এবং ৬৪টি প্রজাতিকে থ্রেটেন্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দেখা গেছে ১৪ বছরের ব্যবধানে থ্রেটেন্ড প্রজাতির সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালের পরিমাপকৃত ৬৪টি থ্রেটেন্ড (threatened) প্রজাতির মধ্যে তারা ৯টিকে সংকটাপন্ন (critically endangered), ৩০টিকে বিপন্ন (endangered) এবং ২৫টিকে অরক্ষিত (vulnerable) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ তালিকায় বোয়াল, চিতল, ফলি, আইড়, বাগাইড়, পাঙ্গাশ, গজার, কালিবাউশ, স্বরপুঁটি, মেনি, কাজলি, চাপিলা, চেলা, ঢেলা, রানী, তারাবাইম ইত্যাদি মাছ রয়েছে।

করণীয় (The necessary interventions)

আমাদের মুক্ত জলাশয়ের প্রকৃতি, ব্যাপ্তি, পরিবেশ-প্রতিবেশের নাজুকতা এবং উৎপাদন কোয়ান্টামের আনুপাতিক ক্রমহ্রাসমানতা বিবেচনায় এনে সকল স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে একটি ফলপ্রসূ, যুগোপযোগী ও সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবী। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় যেমন জোর দেয়া হয়েছে এবং উৎপাদনও যেমন বাড়ছে, মাছ আহরণের ক্ষেত্রসমূহ যেমন - নদী, বিল, হাওর, বাঁওড় এবং প্লাবনভূমির পরিবেশ প্রতিবেশ উন্নয়নে সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ কার্যক্রমেও তেমন জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। মুক্ত পরিবেশের মাছের কল্যাণের জন্যে প্রধান যে অন্তরায়, যা উপরে আলোচিত হয়েছে - দেশের বিল, হাওর ও প্লাবনভূমির সাথে পার্শ্ববর্তী নদীর সংযোগ খালের সংস্কার করাসহ খাল মুখে স্লুইস গেইট থাকলে তার ব্যবস্থপনায় কৃষির সাথে মাছের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি কাজ তথা ধান চাষের সাথে সাথে মাছের মাইগ্রেশনের সুরাহা বের করতে হবে: ধান/কৃষির সাথে মাছের প্রজনন-স্বার্থের যে সংঘাত - বর্ষার প্রথম প্লাবন, মাছের স্বার্থের জন্য তা না ঠেকিয়ে জরুরি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে যেমন স্বল্প মেয়াদি ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে যাতে প্লাবন আসার পূর্বেই বিল-হাওরের ধান সংগ্রহ শেষ হয়ে যায় তেমনি বিল-হাওরের অপেক্ষাকৃত গভীর এলাকাসমূহ মাছের কল্যাণ-ব্যবস্থাপনার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। বিষয়টি পরিকল্পনা আকারে জরুরিভাবে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনায় আনতে হবে।

দেশি মাছের অবলুপ্তি ঠেকাতে হলে মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ প্রতিবেশের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে মাছের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে সর্বাত্মক গুরুত্ব দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। মাছ আহরণে ব্যানিং (banning) কার্যক্রম যেমন- সিজন ব্যান, স্পেসিস ব্যান, সাইজ ব্যান, গিয়ার ব্যান ও মেশ সাইজ ব্যান আরোপিত থাকতে হবে। ব্যান ছাড়াও নির্বাচিত জলাশয়ে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংরক্ষণ কার্যক্রমকে বেশি বেশি উৎসাহিত করতে হবে। জানা যায়, সাম্প্রতিক অতীতে দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে ৪৩২টি মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়, ফলে সেসব জলাশয়ে যেমন বেশি উৎপাদন লক্ষ্য করা গেছে, সেই সাথে কিছু বিপন্ন প্রজাতির মাছ যেমন - চিতল, ফলি, কালিবাউশ, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, স্বরপুঁটি, পাবদা, কাজুলি, গজার, তারা বাইম ইত্যাদির প্রাচুর্য বেড়ে যেতে দেখা গেছে (বার্ষিক রিপোর্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, ২০১৮)। রিপোর্টে উল্লেখিত চলমান ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে কেবল ৩টি প্রকল্পে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উল্লেখ আছে যা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

মাছের আবাস পুনরুদ্ধার প্রকল্পে খননকৃত খাল/নদীগুলোকে প্রাকৃতিক জলাশয় হিসেবে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে: সেগুলোতে যাতে মাছের অভিপ্রয়াণ ও প্রজনন সংঘটিত হয় তা দেখতে হবে। আর তা না হয়ে সে সব জলাশয়ে যদি মাছ চাষ করে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তাতে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিলসমূহ খনন/পুনঃখনন করে সেগুলোকে সাংবাৎসরিক জলাভূমি হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং সেগুলোর সাথে নিকটস্থ নদী/খালের সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থা করে সেখানে মাছের অভিপ্রয়াণ ও প্রজনন সম্ভব করে তুলতে হবে। তখনই কেবল বর্তমানে চলমান বিল নার্সারি প্রকল্প কিংবা ফিংগারলিং স্টকিং প্রোগ্রাম সফল হলেও হতে পারে। নার্সারি প্রতিপালিত পোনা মাছ মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্তির মাধ্যমে ন্যাচারাল স্টক এনহ্যান্সমেন্ট কৌশল উন্নত বিশ্বে পুরনো: এর ফলাফল বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতামতও প্রচলিত আছে। হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা মাছ মুক্ত মাছের সাথে প্রতিযোগিতায় ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারে না। যাহোক, একথা বাদ দিলেও প্রতি বছর শুকিয়ে যাওয়া বিলে নার্সারি প্রতিপালিত পোনা ছেড়ে দিলে ঐ বছর মাছের উৎপাদন হয়তো কিছুটা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ঐ অবমুক্ত মাছকে সেক্ষ সাসটেইনিং ব্রিডিং পপুলেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতে না পারলে তা ওপেন ওয়াটার স্টক এনহ্যান্সমেন্ট-এর ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না।

ইলিশ সংরক্ষণ প্রকল্পের শিক্ষা অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে অনুসরণ (Lessons of hilsa conservation project to be applied in case of other fishes)

মৎস্য অধিদপ্তরের ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিসারিজ (ইকোফিস) প্রকল্প দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৯টি জেলার নদী ও নদী মোহনার ফিসারিজের বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাডাপটিভ কো-ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালীকরন এবং জেলেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-প্রতিবেশিক Resilience বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে: প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালেই প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা এবং পরবর্তীতে জাটকা ইলিশ ধরায় ব্যান আরোপের ফলে দেশে ইলিশের উৎপাদন বেড়ে গেছে। কেবল তাই নয়, জানা যায় এ প্রকল্পের কারণে ঐ অঞ্চলের নদীগুলোতে অন্যান্য প্রজাতির মাছের প্রাপ্যতাও বেড়ে গেছে। ইলিশের সাথে অন্যান্য মাছের প্রজননকালের মিল থাকায় এটি সম্ভব হয়েছে।

নদী, হাওর, বিল ও প্লাবনভূমিই হচ্ছে এ দেশের মৎস্য জীববৈচিত্র্যের প্রধানক্ষেত্র। আমাদের ২৬০ প্রজাতির দেশি মাছ আছে, কিন্তু আদতে তাদের জীববৈচিত্র্যের কী অবস্থা তা উপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা যায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে আহরণ থেকে মোট ১৩.০১ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে: তন্মধ্যে নদী, বিল ও প্লাবনভূমি থেকে যথাক্রমে ৩.৩৭, ১.০৫ ও ৭.২৫

লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। মুক্ত জলাশয়ে প্রজাতিভিত্তিক ২৩ শ্রেণির মাছের আহরণ /উৎপাদন নির্দেশ করতে বিভিন্ন একক/গ্রুপ প্রজাতি-শ্রেণির মধ্যে 'অন্যান্য অভ্যন্তরীণ মাছ' শীর্ষক একটি মিশ্র-প্রজাতির শ্রেণি দেখানো হয়েছে যেখানে পুঁটি, টেংরা, চাপিলা, মলা, ঢেলা, ফলি, পাবদা, বাইম ইত্যাদি মাছ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেখা যায় এই গ্রুপটিই নদী, বিল ও প্লাবনভূমির উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত শীর্ষ স্থান দখল করে রেখেছে (এফআরএসএস, ২০২০-২১)। এ মাছগুলোই আসলে আমাদের মৎস্য জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তাই এদের উৎপাদন কোয়ান্টাম কমে যাওয়া এবং এদের অনেক প্রজাতির ক্রমাগতভাবে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হওয়া উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনা ২০০৬ সালের জাতীয় মৎস্য কৌশল-এর আলোকে উন্নত জৈব-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে যেখানে সিবিএফএম (কমিউনিটি বেইজড ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট) পদ্ধতির বিষয়ে বলা হচ্ছে। এর আওতায় ফিংগারলিং স্টকিং, বিল নার্সারি এবং মৎস্য অভয়াশ্রম পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমাদের আহরণের তুলনামূলক অবদান পিছে পড়ছে এবং দেশি প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে এরকম পটভূমিতে উপর্যুক্ত কর্মসূচিগুলোর গভীর অভিনিবেশ সহকারে মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; যা বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। এখানে কো-ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা ফলিতকরণ ও শক্তিশালী করতে যেমন জেলেদের আর্থিক এবং সামাজিক-প্রতিবেশিক রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং ব্যান পিরিয়ড-এ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম (এআইজিএ) এবং ভিজিএফ (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং)- এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তেমনি ব্যান কার্যকর করতে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং অর্থকরী-তো বটেই। তাই ইলিশ সংরক্ষণে অধিক অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের যুক্তি অবশ্যই থাকতে হবে; ছোট প্রজাতির দেশি মাছসমূহ অর্থকরী মূল্যে ইলিশের মতো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এদের পুষ্টিমান ও জীববৈচিত্র্য মূল্যের নিরিখে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের জন্য অত্যধিক জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাই এদের সংরক্ষণেও মূল্যবান অর্থ-সম্পদ ব্যয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

সরবরাহ ও সেবার মানদণ্ডে মৎস্য অধিদপ্তর এখন রীতিমতো একটি পরিণত সংস্থা; সারা দেশ জুড়ে এর শক্তিশালী সম্প্রসারণ-জনবল অবকাঠামো রয়েছে; সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা নদী, খাল, বিল, হাওরে সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা কোনো কষ্ট-কল্পনা হতে পারে না; চাই শুধু সদিচ্ছা। তাই আর সময়ক্ষেপণ না করে আমাদের দেশি মাছের সংরক্ষণে জরুরিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য ইকোফিস প্রকল্পের কো-অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্টের আদলে দেশের ৩টি বড় নদী - পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার সম্পূর্ণ অংশে প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত গভীর সেকশনসমূহে কনজারভেশন কার্যক্রম জরুরিভিত্তিতে হাতে নিতে হবে। একইভাবে কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওরে এবং দেশে যে সব প্রসিদ্ধ বিল আছে যেগুলোতে এখনও দেশি মাছের প্রজনন মাইগ্রেশন সংঘটিত হয় বলে জানা যায় যেমন, চলন বিল, গাজনার বিল ইত্যাদিতে এবং নদী তীরবর্তী প্রসিদ্ধ প্লাবনভূমি যেগুলো আছে সেগুলোতে জোরদার কনজারভেশনের লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহন করতে হবে; এ ক্ষেত্রেও জেলেদের আর্থসামাজিক এবং প্রতিবেশিক রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধি ঘটানোর প্রতি জোর দিতে হবে এবং আইজিএ (IGA) এবং ভিজিএফ (VGF) পদ্ধতি কাজে লাগাতে হবে। এজন্য কার্যকর পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করি এবং এক্ষেত্রে সরকারের প্রবল রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন থাকতে হবে বলেও মনে করি।

জীববৈচিত্র্য কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ (Why is Bio-diversity Important to Us)

আমাদের কাছে জীববৈচিত্র্যের মূল্য এবং অবদান একেবারে মৌলিক। আমাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশের কল্যাণের জন্য আমরা জীববৈচিত্র্যের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। জীববৈচিত্র্যই টেকসই বাস্তুসংস্থানের ভীত রচনা করে যার ওপর আমরা আমাদের মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য নির্ভর করি। কোনো একটি দেশের বা এলাকার মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে সেখানকার জীববৈচিত্র্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য; জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ বিষয়টি ঐ সম্পর্কের কেন্দ্র ভাগে অবস্থান করে। ধারণাটিতে এ স্বীকৃতি মেলে যে, মানুষের জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার, জ্ঞান ও বিশ্বাস জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বকে একদিকে যেমন প্রভাবিত করে ঠিক তেমনিভাবে পরিবেশের নিয়মেই তার অংশীদার হয়ে মনুষ্যসমাজই তাতে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। বস্তুতপক্ষে মানুষের সামাজিক এবং জৈবিক বিষয়াদি পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে বায়োকালচারাল বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে; জনগণ ও তার অবস্থানস্থলের চলমান চিরগতিশীল পরিবর্তনের আন্তঃযোগাযোগকে বায়োকালচারাল বলা হয়। প্রত্যেক দেশ/জাতির একটি নির্দিষ্ট বায়োকালচারাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট বা ভিত্তি থাকে যা ঐ দেশের/এলাকার জীববৈচিত্র্যের সার্বিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মাটির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিতে, পৃথিবীতে উৎপাদিত শস্যাদির জেনেটিক রিসোর্স নির্মাণে, পৃথিবীর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বৃদ্ধি ও সমুদ্র থেকে আহরিত খাদ্যের যোগানে প্রভাব রেখে জীববৈচিত্র্য মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি তথা পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; আর নদীমাতৃক আমাদের এদেশে মৎস্য তথা জলজ জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা তাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ; মৎস্য জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত আমাদের বায়োকালচারাল ভিত্তি তাই অতি নিবিড় এবং একথা আমাদের উপলব্ধিতে থাকতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

মুক্ত জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র্য নাজুক রেখে যেমন দেশে মাছ উৎপাদনের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব নয়; তেমনি দেশীয় মাছের বিলুপ্তিও এড়ানো যাবে না। দেশী মাছের বিলুপ্তি রোধে পরিবেশ-প্রতিবেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটিয়ে সর্বত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে; এ ক্ষেত্রে কেবল সংরক্ষণ, সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণই করতে হবে। বিষয়টিতে বিশেষভাবে সরকারের প্রবল রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রয়োজন হবে।

প্রাক্তন উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (ইমেইল: dmsshahbd@yahoo.com)

ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা সরকারি-বেসরকারি হ্যাচারিতে কার্প জাতীয় মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন

Quality Seed Production of Indigenous and Exotic Carps Using Cryopreserved Sperm in Government and Private Hatcheries

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার[১], ড. মোহাম্মদ মতিউর রহমান[২] ও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম[৩]

Abstract

The culture and consumption of fish have important implications for national income and food security. Presently, the aquaculture production has increased due to the adoption of new technologies but has not reached the maximum level. The limited availability of quality seeds and inadequate supply to the farmers is a major problem. The quality of seeds has been deteriorated due to inbreeding, interspecific hybridization and negative selection that results in slow growth, high mortality, and disease susceptibility of fry. To resolve these problems, a research project has initiated in the Department of Fisheries Biology and Genetics, Bangladesh Agricultural University with the financial support of USAID Feed the Future Fish Innovation Lab. In the last year, sperm of Rohu, Mrigal, Silver carp, and Bighead carp was cryopreserved and seeds of them were successfully produced using cryopreserved sperm in one public and six private hatcheries in Mymensingh, Jashore and Faridpur regions. Both cryopreserved and fresh sperm-originated seeds have been reared separately in the respective hatcheries with a view to produce broods. Comparison of the growth rate was done at monthly basis at every nursing point. It was observed that the cryopreserved sperm-originated fry had higher growth than the fresh sperm-originated fry.

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে ও মেধাবী জাতি গঠনে দেশের অভ্যন্তরীন বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাষকৃত মাছের উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজন গুণগত মানসম্পন্ন মাছের পোনা। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, ইনব্রিডিং, নেগেটিভ সিলেকশন ও আন্তঃপ্রজাতি সংকরায়নের ফলে চাহিদার বিপরীতে গুণগত মানসম্পন্ন মাছের রেণুর যোগান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে মাছের বৃদ্ধির হার কম হচ্ছে এবং উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে যাচ্ছে না। এ সমস্যাকে প্রশমন করার জন্য USAID Feed the Future Fish Innovation Lab এর অর্থায়নে এবং যুক্তরাষ্ট্রের Louisiana State University এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ কর্তৃক "Cryogenic sperm banking of Indian major carps and exotic carps for commercial seed production and brood banking শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মাছের ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত সরকারি ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত বেসরকারি হ্যাচারিতে দেশি ও বিদেশি কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও প্রতিপালন করা হচ্ছে।

মাছের শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশনের গুরুত্ব (Importance of fish sperm cryopreservation)

ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতিতে মাছের শুক্রাণুকে নির্দিষ্ট প্রটোকল অনুসারে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (সাধারণত -১৯৬ সেন্টিগ্রেড) তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করা হয়। এ তাপমাত্রায় মাছের শুক্রাণুর কার্যক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনরায় সক্রিয়তা ফিরে পায়। ফলে হ্যাচারিতে সহজেই ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে মাছের কৃত্রিম প্রজনন করা সম্ভব হয়। মাছের চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে পোনার চাহিদা ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত পোনা দিয়ে ক্রমবর্ধমান পোনার চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছেনা। সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি এই বর্ধিত চাহিদার যোগান দিলেও পোনার কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রাখতে পারছেনা। ফলে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার চাহিদার এক বড় অংশ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে যা শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। ক্রায়োপ্রিজারভেশনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছের সংরক্ষিত শুক্রাণুর ব্যবহার করা হলে পোনার জীনগত বৈচিত্র্যতা বজায় থাকে। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদন ও সংকটাপন্ন মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে মাছের শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা মাছের কৃত্রিম প্রজনন (Induced breeding of fish using cryopreserved sperm)

ইতোমধ্যে ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে ময়মনসিংহ, যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলের একটি সরকারি ও ছয়টি বেসরকারি হ্যাচারিতে রুই, মৃগেল, সিলভার কার্প ও বিগহেড কার্প মাছের কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি ৫০০০টি (১ চা চামচ) ডিমের জন্য ১০টি ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণুর স্ট্র (২৩০ মাইক্রো লিটার তরলীকৃত শুক্রাণু/স্ট্র) ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণুর মাধ্যমে উৎপাদিত পোনার বৃদ্ধির সাথে তুলনা করার জন্য একই পদ্ধতিতে ফ্রেশ শুক্রাণু দিয়ে অন্য একটি গামলায় সমপরিমাণ পরিপক্ব ডিম নিষিক্ত করা হয়েছে। ডিমের সাথে শুক্রাণু মেশানোর পর ডিমের পাত্রে সামান্য পরিমাণ পানি মিশিয়ে ধৌত

করে ডিমের গায়ে লেগে থাকা রক্ত, ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে। এরপর নিষিক্ত (Fertilized) ডিমগুলোকে নির্দিষ্ট মাত্রার পানি প্রবাহ দিয়ে আলাদা আলাদা হ্যাচিং জারে ছাড়া হয়েছে। ১৮-২৪ ঘন্টার মধ্যে হ্যাচিং সম্পন্ন হয়ে নিষিক্ত ডিম থেকে মাছের রেণু পোনা বের হয়ে এসেছে। কুসুম থলি শোষিত হয়ে গেলে ৭২ ঘন্টা পর থেকে মাছের রেণুকে পরিমাণ মত খাবার (সিদ্ধ ডিমের কুসুম) প্রয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে চৌবাচ্চায় ঝর্ণার নিচে কন্ডিশনিং করে ৫-৭ দিন বয়সের মাছের রেণুকে নার্সারী পুকুরে মজুদ করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ডিমের নিষিক্ত ও পরিস্ফুটন তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রজাতির নাম	হ্যাচারির নাম	ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু		ফ্রেশ শুক্রাণু	
		নিষিক্ত (%)	পরিস্ফুটন (%)	নিষিক্ত (%)	পরিস্ফুটন (%)
রুই	মাৎস্য গবেষণা কমপ্লেক্স, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	২৩	২০	৪৪	৫০
রুই	সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রাসকাশ, ময়মনসিংহ	৩৩	২৭	৯৪	৯৩
রুই	মাতৃ ফিস হ্যাচারি, যশোর	৪৪	২৯	৬৮	৬০
মৃগেল	বিশ্বাস হ্যাচারি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	৪০	৩৫	৮০	৭৩
মৃগেল	সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রাসকাশ, ময়মনসিংহ	৩৫	৩১	৮৬	৭২
মৃগেল	মাতৃ ফিস হ্যাচারি, যশোর	৫০	২১	৯০	৪৫
সিলভারকার্প	ফিশারিজ ফ্যাকাল্টি ফিস হ্যাচারি, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	২২	১০	৩৫	১১
সিলভারকার্প	ফুলবাড়ী ফিশহ্যাচারি, যশোর	৪২	৩৩	৯৬	৯০
সিলভারকার্প	মাতৃ ফিশহ্যাচারি, যশোর	১৪	১০	৬৩	৩৪
সিলভারকার্প	বিশ্বাস হ্যাচারি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	৬৬	৫২	৫৬	৫০
সিলভারকার্প	শাহীদা নূর মৎস্য হ্যাচারি, রাজশাহী	৩০	২৭	৭৭	৫৬

ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু হতে প্রাপ্ত পোনা প্রতিপালন (Fry rearing obtained from cryopreserved sperm)

উপরোল্লিখিত সাতটি হ্যাচারিতে ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ও ফ্রেশ শুক্রাণু ব্যবহার করে প্রাপ্ত পোনা সমূহকে চারটি হ্যাচারি ও একটি খামারে আলাদাভাবে লালন পালন করা হচ্ছে এবং বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত (প্রতিমাসে) নমুনায়ন করা হয়েছে। মজুদ সময় হতে ছয় মাস পর্যন্ত এ সকল পোনার দৈহিক বৃদ্ধির তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই মাছ পরবর্তীতে লালন পালন করে ব্রুড মাছে পরিণত করা হবে।

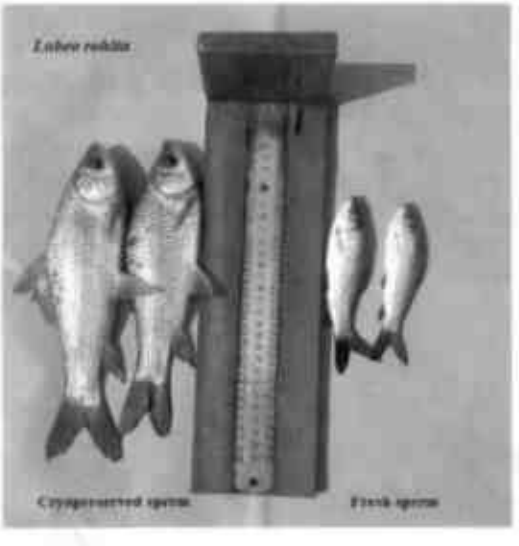

চিত্র: ফ্রেশ শুক্রাণু এবং ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত রুই মাছের পোনার গড় ওজনবৃদ্ধি, বিশ্বাস ফিশ হ্যাচারি, ময়মনসিংহ।

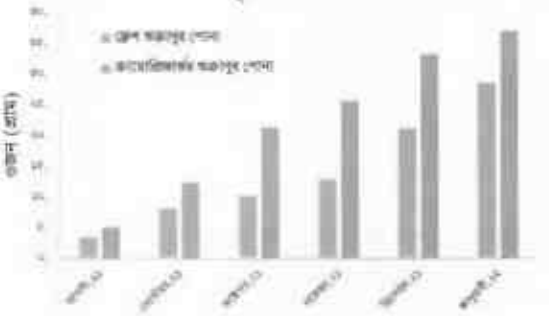

চিত্র: ফ্রেশ শুক্রাণু এবং ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত মৃগেল মাছের পোনার গড় ওজন বৃদ্ধি, বিশ্বাস ফিশ হ্যাচারি, ময়মনসিংহ।

প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ (Observation on Growth Results)

ছয় মাস নমুনায়নের পর প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতি ক্ষেত্রে ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে প্রাপ্ত পোনার বৃদ্ধির হার হ্যাচারির ফ্রেশ শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত

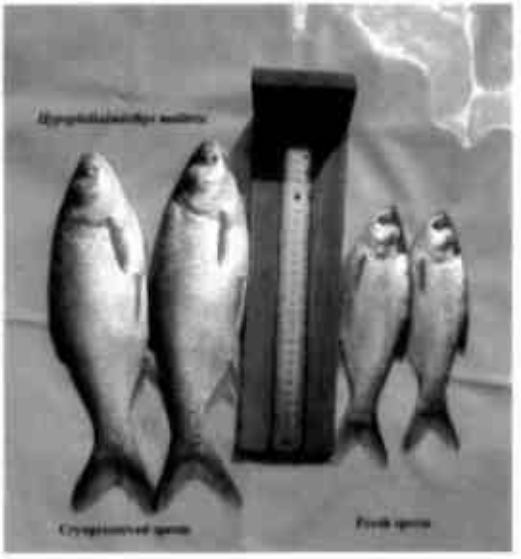

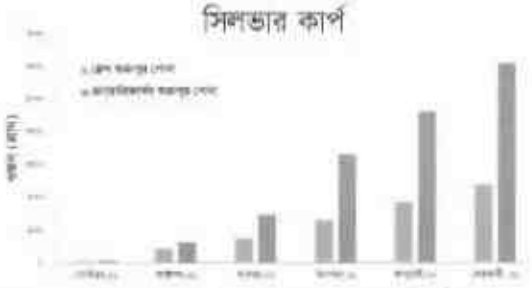

চিত্র: ফ্রেশ শুক্রাণু এবং ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত সিলভার কার্প মাছের পোনার গড় ওজন বৃদ্ধি, মাতৃ মিশ হ্যাচারি, যশোর।

চিত্র: ফ্রেশ শুক্রাণু এবং ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত বিগহেড কার্প মাছের পোনার গড় ওজনবৃদ্ধি, সুপ্রীম নুর ফিশ হ্যাচারি, [illegible]

পোনার বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি, বিশেষ করে এ বৃদ্ধির হার বিদেশি কার্প (সিলভার কার্প ও বিগহেড কার্প) এর ক্ষেত্রে বেশি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমে পদ্মা নদীর রুই ও মৃগেল মাছের ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যদিকে সিলভারকার্প ও বিগহেডকার্পের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি চীন থেকে আনা পুরুষ মাছের শুক্রাণু ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত উৎস সমূহের মাছের সংরক্ষিত শুক্রাণুর গুণগত মান ভাল থাকায় ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতিতে উৎপাদিত পোনার অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। উপরোক্ত ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত শুক্রাণু ব্যবহার করে সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন এবং এ সকল পোনার লালন পালন মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন রুই মাছ উৎপাদনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

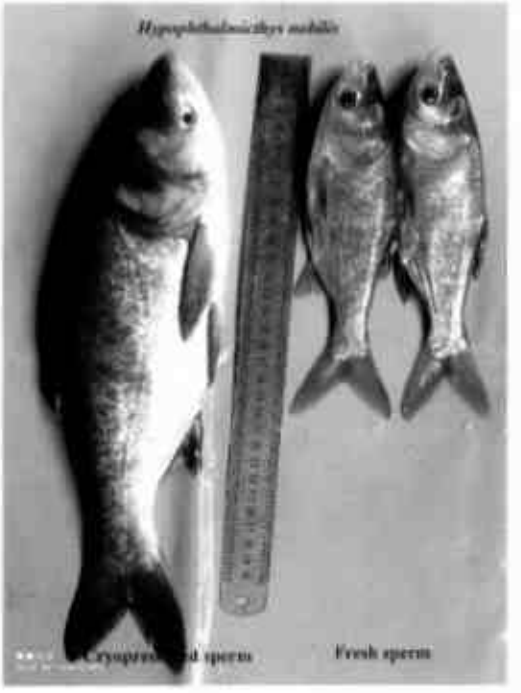

উপসংহার (Conclusion)

মাছের উৎপাদন ও এর ব্যবহার জাতীয় আয় এবং খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মাছের উৎপাদনের লক্ষ্যে গুণগত মানসম্পন্ন মাছের পোনার যোগান নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি হতে পারে এক লাগসই হাতিয়ার। এ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক ফলাফল আমাদের আশান্বিত করে যে মাছের ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণুর ব্যবহার শুধু প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষায় নয় বরং উৎপাদন বৃদ্ধিতেও সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

---

[1]প্রফেসর, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (ইমেইল: rafiqulsarder@yahoo.com)
[2]প্রফেসর, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
[3]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর ও পিএইচডি ফেলো, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

মৎস্যখাতে খাদ্য নিরাপদতা বিধানে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও অর্জনসমূহ

Government Initiatives and Achievements of Ensuring Food Safety in Fisheries Sector

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান[১] ও ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া[২]

Abstract

Fisheries sector plays a substantial role in socio-economic development in Bangladesh, while Department of Fisheries (DoF) sets its mission of contributing to the nation's nutrient supply, foreign exchange earning and poverty elimination through increasing fish production by sustainable conservation and management of fisheries resources. Besides production enhancement, DoF also has the mandate to ensure safety and quality of fishery products for domestic and international markets. Food safety compliance has nowadays become a measure of a county's status of civilization, and is significantly affecting international trade of foods including fish and fish products. Considering the importance of food safety in socio-economic progress, the present government has paid sincere efforts to develop national capacity to establish food testing facilities and official control mechanisms in food supply chains, particularly in fisheries sector. The key interventions have been enactment of regulations and guidelines for establishing standard practices and hygiene & safety standards, DoF's capacity building in laboratory testing and official controls including residue monitoring, traceability implementation and inspections in fish value chains, and providing logistics to private entrepreneurs, such as, fish farmers, suppliers and processors in the forms of training and awareness on good practices, HACCP and hygiene-sanitation management. Outcomes of very few or no non-compliances in recent NRCP programs, reduction in number of RASFF notifications and acknowledgement of our official control systems as equivalent in effect to that in EU as reported in the 2018 EC audit report [DG(SANTE) 2018-6354] are all indices, giving testimony to a high standards of food safety system being in place in the fisheries sector in Bangladesh.

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্যখাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টির যোগান ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনের মিশনকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সরবরাহ তথা মৎস্যপণ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কিত খাদ্য নিরাপদতা (food safety) নিশ্চিত করাও মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়টি খাদ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে অন্যতম প্রভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গত কারণেই সরকারের উন্নয়ন দর্শন রূপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) গ্রহণ করেছে, সেখানে মৎস্য সেক্টরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ মৎস্য সরবরাহের উদ্যোগকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (competent authority) হিসেবে মৎস্যের উৎপাদন হতে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যন্ত সকল ধাপে কার্যকর মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি আরোপের মাধ্যমে পণ্যের খাদ্য নিরাপদতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করে ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধানে ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

খাদ্য নিরাপদতার কৌশলসমূহ (Food safety strategies)

খাদ্য নিরাপদতা হলো খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ চেইনে এমন সকল আইন বা পদ্ধতির প্রয়োগ যা নিশ্চয়তা বিধান করবে যে উৎপাদিত খাদ্য এর অভিপ্রেত ব্যবহার অনুসারে প্রস্তুতকৃত হলে বা তা খেলে মানুষ অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা। মৎস্য তথা যে কোনো খাদ্যশিল্পে নিরাপদতা বিধানের জন্য আবশ্যকীয় তিনটি ফ্যাক্টর বা অনুষঙ্গ হলো-

(ক) খাদ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন বা বিধি-বিধানে ন্যূনতম হাইজিন চাহিদা নির্ধারণ করা;

(খ) খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ চেইনের সকল পর্যায়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মান নিয়ন্ত্রণের জন্য হ্যাসাপভিত্তিক সেফটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা ও তার বাস্তবায়ন; এবং

(গ) আইন বা বিধিতে নির্ধারিত মানের সাপেক্ষে খাদ্য প্রস্তুতের বিভিন্ন ধাপে অনুসৃত বা চূড়ান্ত খাদ্যপণ্যের মানের কমপ্ল্যায়েন্স যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর অফিসিয়াল কন্ট্রোল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

মৎস্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ (Noticeable Steps of Government regarding Quality Controls of Fishery Products)

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০: সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা ১৯৮২ সালের মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আদেশ দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯

অনুচ্ছেদ বিলোপ এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৬ বাতিল ঘোষিত হওয়ায় Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, ১৯৮৩ অর্ডিন্যান্সসহ সকল অর্ডিন্যান্সসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়। তাই বর্তমান সরকার Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নতুন আইন, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ জারি করেছে। আইনটির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতকরণার্থে বিধি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

রহিতকৃত অর্ডিন্যান্স এর সাপেক্ষে এই আইনের নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো-

- মৎস্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপনের বিধান;
- কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তথা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মান নির্ধারণের এখতিয়ার;
- কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন বা নির্ধারিত মানের বিচ্যুতি হলে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রশাসনিক জরিমানা এবং পচা, দূষিত বা ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অপদ্রব্য বা ভেজাল মিশ্রিত মৎস্য বিক্রয় বা সরবরাহ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে জরিমানার পাশাপাশি মামলা দায়ের করার কঠোর বিধান;
- স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ ব্যতীত রপ্তানি বা মিথ্যা বা জাল স্বাস্থ্য সনদ ব্যবহারের অপরাধে এবং লাইসেন্স ব্যতীত কারখানা বা স্থাপনা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড আরোপের বিধান, এবং অপরাধ পুনঃসংঘটনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডারোপের বিধান;
- মৎস্য খামার নিবন্ধন ও নিবন্ধনকৃত খামারে উত্তম চাষ পদ্ধতি (Good Aquaculture Practice) অনুসরণের বাধ্যবাধকতা;
- কারখানা বা স্থাপনায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সনদ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা;
- আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও পচা বা দূষিত বা ভেজাল মৎস্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, আমদানিকৃত মৎস্যের মান নির্ধারণ, আমদানি অনাপত্তিপত্র এবং আমদানিকৃত পণ্যের রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ, ট্রেসেবিলিটি, হালাল সনদ ও হিমায়িত ও কিউরড মৎস্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসেবে নির্ধারিত অনুজীব ও রাসায়নিক পরীক্ষণের রিপোর্ট দাখিলের বিধান।

মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮

আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য এবং উপকারি জীবাণু যেমন প্রোবায়োটিক, ইস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ বা বিস্তার রোধকল্পে এবং মৎস্যস্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে মৎস্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধান রেখে সরকার ২০১৮ সালে মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন কার্যকর করেছে। উক্ত আইনের দ্বারা মৎস্যস্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি আমদানিকৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্য বা উপকারী জীবাণু এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের জন্য সংক্রামক রোগ তথা জুনোটিক রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে।

NRCP কর্মপন্থা নির্দেশাবলি-২০১১ (সংশোধন ২০১২)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির পূর্বশর্ত হলো তাদের Regulation 96/23/EC এর উল্লিখিত রেসিডিউ মনিটরিং পদ্ধতির সমতুল্য রেসিডিউ প্ল্যান প্রণয়ন করে নিশ্চয়তা বিধান করা যে বাংলাদেশের খামারে উৎপাদন পর্যায়ে রেসিডিউ দূষণ নেই বা অনাকাঙ্ক্ষিত দূষণ ঘটলেও তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এলক্ষ্যে খামারে উৎপাদিত মৎস্যে রেসিডিউজনিত দূষণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ ও দূষণমুক্ত মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১১ সালে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'National Residue Control Plan (NRCP) Policy Guidelines' প্রণয়ন ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে গাইডলাইনটি সংশোধন করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে মৎস্য অধিদপ্তর প্রতি বছর ৩১ মার্চ এর মধ্যে NRCP প্রণয়ন ও পূর্ববর্তী বছরের ফলাফল প্রতিবেদন একীভূত করে DG (SANTE) এর নিকট প্রেরণ করে এবং প্রেরিত প্ল্যান অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ১৩ শতের অধিক মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করে নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক্স ও ড্রাইসহ ৩৪ ধরনের রেসিডিউ এর উপস্থিতি পরীক্ষা করে থাকে।

সারণি: এনআরসিপি এর আওতায় পরীক্ষিত রেসিডিউ প্যারামিটারসমূহ

রাসায়নিক গ্রুপ	রেসিডিউ প্যারামিটার	মেট্রিক্স	দায়িত্বপ্রাপ্ত ল্যাবরেটরি
A1	Diethylstilbestrol	মাছ	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, চট্টগ্রাম
A3	Methyl testosterone	মাছ	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, চট্টগ্রাম
A6	Chloramphenicol, Nitrofurans (AHD, AOZ, AMOZ, SEM), Metronidazole	মাছ ও চিংড়ি	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা
B1	Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Amoxicillin, Gentamycin, Sulfonamides, Tylosin	মাছ ও চিংড়ি	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা
B2a	Fenbendazole, Mebendazole	মাছ ও চিংড়ি	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ঢাকা
B3a	Aldrin, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor	মাছ ও চিংড়ি	পেস্টিসাইড এনালাইটিকাল ল্যাব, BARI
B3c	Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury	মাছ ও চিংড়ি	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা
B3d	Aflatoxins (B1, B2, G1, G2)	মাছ ও চিংড়ি	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ঢাকা
B3e	Malachite green, Leuco malachite green, Crystal violet, Leuco crystal violet	মাছ ও চিংড়ি	মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা

সহায়তা প্রদান করা হয়। এআইএফ-২ এর মতো এআইএফ-৩ অনুদান বিতরণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুরু হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে পর্যন্ত ২৬০টি উপ প্রকল্প অনুমোদিত হয় যার মধ্যে ২২৭টি উপপ্রকল্পের অর্থ ছাড় হয়েছে। (সারণি-৪)

সারণি-৪: জুন ২০২২ পর্যন্ত এআইএফ-৩ এর অধীনে বিতরণকৃত উপকরণাদির বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক নং	উপকরণ বিতরণের শ্রেণি	সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)	শতকরা হার
১	ফিড মেশিন	৫৪	২.৫৮১	২৩.৭৮৯
২	অ্যারেটর	৬১	১.৫৪৮২	২৬.৮৭২
৩	বরফ কল	১৪	০.৬৯৯৬	৬.১৬৭৪
৪	ট্রান্সপোর্ট (পিকআপ, কুলিং ভ্যান, মেকানাইজড ভ্যান)	২৮	১.৪৭০১	১২.৩৩৫
৫	হ্যাচারী উন্নয়ন	৪	০.২৩২৩	১.৭৬২১
৬	নার্সারী যান্ত্রিকীকরণ	৪	০.০৫৪৪	১.৭৬২১
৭	বায়োফ্লক	১	০.০২১	০.৪৪০৫
৮	প্যাকেজিং ফ্যাক্টরী	১	০.০৪২৫	০.৪৪০৫
৯	পেন কালচার	১	০.০১৭৪	০.৪৪০৫
১০	খাঁচায় মাছ চাষ	৪	০.০৯২	১.৭৬২১
১১	রিসার্কুলেটরী অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (আরএএস)	১	০.০৫৭	০.৪৪০৫
১২	আরসিসি ট্যাংকে মাগুর চাষ	১	০.০৫৮১	০.৪৪০৫
১৩	বাহারী মাছের হ্যাচারী স্থাপন	১১	০.৪৪২১	৪.৮৪৫৮
১৪	ফার্ম মেকানাইজেশন (পাম্প, অটোফিডার, অ্যারেটর)	১৪	০.৪৯৭	৬.১৬৭৪
১৫	লবণ পানিতে পারশে মাছের সাথে হরিণা চিংড়ির চাষ	২	০.০৯৯৫	০.৮৮১১
১৬	আড়তের অবকাঠামো উন্নয়ন	৪	০.১৫০৭	১.৭৬২১
১৭	আড়তে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ লাইন স্থাপন	১	০.০৫৫	০.৪৪০৫
১৮	ক্ষুদ্র মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট স্থাপন	১৬	০.৫৫৫৫	৭.০৪৮৫
১৯	মুক্তা চাষ	১	০.০৩৮৫	০.৪৪০৫
২০	শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণের মিনি প্যান্ট	৩	০.০৬৫	১.৩২১৬
২১	হ্যাচারীতে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ লাইন স্থাপন	১	০.০৫৪৯	০.৪৪০৫
	মোট	২২৭	৮.৮২৫	১০০.০০

অনুদান প্রাপ্তির কারণে অর্জিত সাফল্য কাহিনি (Success Stories of AIF Matching Grant)

এআইএফ- ৩ এর আওতায় ভাসমান ফিস ফিড পিলেটিং মেশিন: এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অঙ্গের সহযোগিতায় কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার কালিকা প্রসাদ গ্রামের মোঃ ইসলাম উদ্দিন একজন মৎস্যচাষি থেকে সফল উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন, হয়েছেন অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মৎস্য সেক্টরে অবদান রেখে চলেছেন। মাছচাষে খাদ্যের উচ্চমূল্য, গুণগতমানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্যের চাহিদা

চিত্র: ভাসমান ফিস ফিড মেশিন বিতরণ

এবং ভৈরবে মাছের ভাসমান খাদ্য তৈরির কোনো ফ্যাক্টরি না থাকার কারণে কালিকাপ্রসাদ-১ মৎস্য সিআইজি সমিতির সদস্য জনাব মোঃ ইসলাম উদ্দিন এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় এআইএফ-৩ তহবিলের মাধ্যমে মাছের ভাসমান খাদ্য তৈরির মেশিন বাবদ ৩.৫০ লক্ষ টাকার (মোট ব্যয়ের ৫০%) জন্য নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভৈরবে আবেদন করেন। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও অনুদানের অর্থে স্থাপিত বিগত ১.৫ বছরে ১৬৬.৮০ মে.টন খাদ্য উৎপাদন করে ভৈরবসহ পার্শ্ববর্তী উপজেলায় সরবরাহ করেন। এনএটিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে এফআইকিউসি, সাভারে উৎপাদিত খাদ্য একাধিকবার

চিত্র: ভাসমান ফিস ফিড মেশিন বিতরণ

চিত্র: ভাসমান ফিশ ফিড মেশিন বিতরণ

পরীক্ষা করে মান নিশ্চিত করা হয়। উদ্যোক্তা পূর্বে পাদুকা শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন, এখন তিনি মৎস্য খাদ্য উৎপাদনে একজন সফল উদ্যোক্তা।

বরফকল স্থাপন: প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠা একজন উদ্যমী নারী জনাব আফরোজা খানম। খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া উপজেলার খর্ণিয়া ইউনিয়নের ছোট এক মফস্বল গ্রামে ১৯৮০ সালের ২০ নভেম্বর তাঁর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল নারী উদ্যোক্তা হওয়া। তবে সুযোগের অভাবে সে স্বপ্ন অঙ্কুরেই রয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তিনি ১৯৯৮ সালে মাধ্যমিক ও ২০০০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে জীবিকার তাগিদে মোসাব্বতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। ২০০১ সালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি এবার পেয়ে যান স্বপ্ন পূরণের এক সহযোদ্ধা। শৈশবের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের অভিপ্রায়ে জীবনসঙ্গীর অনুপ্রেরণায় তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যৌথ ব্যবসা শুরু করেন। আফরোজার দু'জন ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল; কিন্তু মতের অমিলের কারণে তাদেরকে হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি একাই তার স্বপ্নের পথে হাঁটা শুরু করেন।

তিনি খেয়াল করলেন তাঁর এলাকায় যত্রতত্র মাছ বিক্রয় হয় এবং বরফের বেশ চাহিদা রয়েছে। ব্যবসার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি তাঁর জমানো টাকায় খর্ণিয়া বাজারে একটি মৎস্য আড়ত এবং একটি বরফকল গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে মাদারতলা, কাঁঠালতলা, শোলগাতিয়া ও নতুন রাস্তাসহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বরফ বিক্রি হতে লাগলো। দিনদিন বরফের চাহিদা বাড়তে লাগলো। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম থাকায় পর্যাপ্ত বরফের সরবরাহ দিতে পারছিল না। কারণ তাঁর বরফকলে একটি মাত্র কুলিং কয়েল ও একটি ক্রাশার মেশিন ছিল যার উৎপাদন ক্ষমতাও কম। এভাবেই ঘাটতি নিয়ে চলছিল বরফের উৎপাদন।

অন্যদিকে বরফকলের কুলিং কয়েল ও ক্রাশার মেশিন পুরানো হয়ে যাওয়ায় ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে হঠাৎ একদিন পুরো মেশিন নষ্ট হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া। এমন অবস্থায় কুলিং কয়েল ও ক্রাশার মেশিন পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু অর্থের সংকট এ উদ্যোগের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আফরোজা চিন্তিত হয়ে পড়েন, ভাবতে থাকেন এবার মনে হয় তার স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। তিনি এ বিপদ থেকে নিজেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নিজ ইউনিয়নের এনএটিপি-২ প্রকল্পের স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর (লিফ) কথা মনে পড়ে। লিফের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তাঁকে ডুমুরিয়া সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

পরবর্তীতে তিনি ডুমুরিয়ার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে বন্ধ বরফকল সচল করার জন্য পরামর্শ চান। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক তাঁকে এনএটিপি-২ এর আওতায় এআইএফ-৩ এর অনুদানের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেন। আফরোজার চোখে মুখে আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান, 'এআইএফ-৩ এর আওতায় আপনি প্রায় ৫,৮১,০০০ টাকার অনুদান পেতে পারেন। বরফকল সচল করার জন্য বাকিটা আপনাকে জোগাড় করতে হবে।'

এআইএফ-৩ ফান্ডের বিস্তারিত শুনে আফরোজার অন্তরে এক নতুন সূর্যের উদয় হয়। ভাবতে থাকেন আবার তাঁর স্বপ্নের বরফকল চালু হবে। সকল প্রক্রিয়া মেনে আফরোজা খানম এআইএফ-৩ অনুদানের জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর প্রস্তাব পাশ হয়। এআইএফ-৩ হতে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে আবার আগের মত সচল হয় বরফ কল। এবারে তিনি দ্বিগুণ ক্ষমতার মেশিন স্থাপন করেন। পুরোদমে শুরু হয় বরফের উৎপাদন এবং তাতে তিন মাসে বরফের উৎপাদন ৭৭,৫০০ কেজি এবং আনুমানিক ২,৫০,০০০ টাকা আয় হয়।

এআইএফ-২ এর আওতায় পিকআপ ভ্যান (Purchase of Pick-up Van under AIF-2)

জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম যশোরের মণিরামপুর উপজেলার হরিহরনগর ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নিজস্ব জমি না থাকার কারণে আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে দিয়ে তিনি বেড়ে ওঠেন। পেশাগতভাবে প্রথমে একজন দর্জি ছিলেন এবং পাশাপাশি তিনি ২০০৮ সাল থেকে ৪০ শতাংশ জমি লিজ নিয়ে

চিত্র: এআইএফ-২ এর আওতায় পিকআপ ভ্যান বিতরণ

চিত্র: এআইএফ-২ এর আওতায় পিকআপ ভ্যান বিতরণ

চিত্র: এআইএফ-২ এর আওতায় পিকআপ ভ্যান বিতরণ

মাছচাষ শুরু করেন। কিন্তু অর্থের স্বল্পতা ও মাছ চাষ বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ না থাকায় তিনি মাছ চাষে প্রথমে সফলতার মুখ দেখতে পারেননি। ২০০৯ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের এনএটিপি-১ প্রকল্পের অধীনে ২০ জন সদস্য নিয়ে তেঁতুলিয়া কার্প মিশ্র চাষ সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ এর একজন সদস্য হিসেবে যুক্ত হন এবং তিনি উক্ত প্রকল্পের অধীনে মাছচাষ সম্পর্কিত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ পান এবং সমিতির অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তিনিও ২০০ টাকা করে প্রতি মাসে সঞ্চয় শুরু করেন। বর্তমানে তিনি মাছ চাষে সফলতার মুখ দেখেছেন এবং এখন তার নিজের ৩টি পুকুর যার মোট আয়তন ০.৯০ হেক্টর। জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম মণিরামপুর উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশনেরও একজন সক্রিয় সদস্য। কিন্তু মাছ চাষের পাশাপাশি উক্ত সমিতির সদস্যরা মাছ বিপণনের জন্য ভাড়াকৃত পিকআপ ভ্যানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠান যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই তাঁরা ২০১৯ সালে এনএটিপি-২ প্রকল্পের এআইএফ-২ উপপ্রকল্পের অনুদানের মাধ্যমে একটি পিকআপ ভ্যান ক্রয় করেন যার

চিত্র: এআইএফ-২ এর আওতায় পিকআপ ভ্যান বিতরণ

মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ মাছ চাষের বিভিন্ন উপকরণ একসাথে ক্রয় করে পরিবহন করেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পিকআপ ভ্যানের মাধ্যমে মাছ বিপণনের জন্য পরিবহন করেন। সিআইজি দলটি পিকআপ ব্যবহার করে জীবন্ত মাছ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন হাট-বাজার ও আড়তে সরবরাহ করে উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। পিকআপের মাধ্যমে মাছ ছাড়াও দলীয়ভাবে মাছের পোনা, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তিও এখন অনেক সহজ হয়েছে। পিকআপ হতে খরচ বাদে মাসে গড়ে প্রায় ১৬,০০০ টাকা সিআইজি'র তহবিলে জমা হয়। সঞ্চয়কৃত টাকা নিজেদের প্রয়োজনে দলের সদস্যদের মধ্যে সামান্য সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়। দলীয় সম্প্রীতি ও সুষ্ঠু সিআইজি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তেঁতুলিয়া কার্প মিশ্র চাষ সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ একটি মডেল, যা দেশের অন্যান্য সিআইজি'র জন্য অনুকরণীয়।

উপসংহার (Conclusion)

এআইএফ-২ ও ৩ তহবিল হতে (১) পরিবহনযান ক্রয়; (২) ফিস ফিড পিলেটিং মেশিন স্থাপন; (৩) বরফ কল স্থাপন; (৪) অ্যারেটর স্থাপন; (৫) মিনি ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্টসহ বিভিন্ন উপপ্রকল্পের জন্য অনুদান প্রাপ্তির মাধ্যমে মাছচাষি এবং সরবরাহ চেইনের সাথে জড়িত অন্যান্যদের সাথে পশ্চাৎ ও সম্মুখ সংযোগ স্থাপনে অবদান রাখছে। জীবিত মাছ পরিবহনের জন্য অক্সিজেন সরবরাহকারী স্টাইরোফোমের বাক্সসহ যানবাহন, বরফকল, মাছ প্রক্রিয়াজাত ইত্যাদি উপকরণ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, মাছ আহরণোত্তর ক্ষতি হ্রাস করছে। পাশাপাশি মাছ চাষিরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভালো মূল্য পাচ্ছেন এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত পুষ্টিমানসম্পন্ন মাছের উৎপাদনের কারণে গ্রাহকরা নিরাপদ মাছ খেতে পারছেন।

[১]পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অঙ্গ, মৎস্য অধিদপ্তর (ইমেইল: monidofi@gmail.com)
[২]সহকারী পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অঙ্গ, মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য বর্জ্য : সম্ভাবনাময় মূল্যবান সম্পদ

Fish Wastes : A Potential Valuable Resource

ড. কাজী আহসান হাবীব[১], মোহাম্মদ রাশেদ[২] ও মোঃ মাসুদ রানা[৩]

Abstract

Bangladesh is one of the leading fish-producing countries in the world. The country is producing more fish than it's demand. This staggeringly greater fish production is the reason behind the introduction of an unprecedented amount of fish wastes (e.g. fish scale, fish skin, fish viscera, shrimp and crab shell, mollusc shell etc.). More than 20% body mass of a fish is discarded as wastes. Devoid of proper utilization of these wastes is causing serious problem to our environment through creating pollution. Fish wastes, such as, scale, skin, swim bladder, fins, liver, bone, viscera, etc. can be transformed into highly valuable products viz. biodiesel, collagen, gelatin, oil, handbag, wallet, ornaments, food items, and so on. Several countries viz. Iceland, Thailand, India, Vietnam have already been successful in processing fish wastes into profitable products. Our country also needs to utilize these potentially valuable uprising fish wastes which are mostly discarded. Proper utilization of fish wastes will not only reduce pollution and protect our environment, but also be a booming sector in exporting and earning foreign money.

বাংলাদেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে দেশে বছরে ৪৬ লক্ষ মে.টনের বেশি মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের বর্জ্যও তৈরি হচ্ছে। সাধারণত একটা মাছের বা অন্য জলজ প্রাণী যেমন- চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদির ওজনের ২০-২৫% বর্জ্য (অর্থাৎ মৎস্য বর্জ্য বা fish wastes) হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এসব মৎস্য বর্জ্যকে যদি সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা যায়; তাহলে একদিকে যেমন পরিবেশের দূষণ কমিয়ে আনা যাবে; অন্যদিকে উৎপাদিত এসব বর্জ্যগুলো মানসম্পন্ন উপজাতপণ্য হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারলে তা থেকে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। তদুপরি এটি কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি অতি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারে।

মৎস্য বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of fish waste processing)

মাছের বাজার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলো যথেষ্ট পরিমাণে বর্জ্য ও উপজাত উৎপাদন করে; যা মূলত মানুষের খাদ্যের অনুপোযোগী। মাছের বর্জ্য মূলত মাছের আঁইশ, নাড়িভুঁড়ি, পাখনা, পটকা, ফুলকা, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাজাত চিংড়ি বা সামুদ্রিক মাছের মাথা, লেজ, চিংড়ির খোলস, হাড়, চর্বি, ইত্যাদি দ্বারা গঠিত এবং সে সাথে লিপিড, প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব ক্রিয়ামূলক যৌগ সমৃদ্ধ। মৎস্যশিল্পের এসব বর্জ্যগুলো একটি দূষণকারী হিসেবে বিবেচিত; যা পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মাছ ও চিংড়ির প্রসেসিং অপারেশন চলাকালীন সময়ে বর্জ্যগুলোর একটি বড় অংশ সাধারণত চামড়া, হাড়, আঁইশ ও নাড়িভুঁড়িসহ প্রায় ৩০% বা ততোধিক কাঁচামাল তৈরি হয়। মাছের বর্জ্য পচনকালীন সময়ে সাধারণত উচ্চ জৈব-রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা দেখায় যার ফলে জলজ পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায়। তদুপরি, এসব বর্জ্যের যথেষ্ট সঠিক ব্যবস্থাপনা করা হয় না বিধায় *Salmonella, Shigella*, পরজীবীর ডিম ও অ্যামোবিক সিস্টসহ আর অনেক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর আবাসস্থলে পরিণত হয়; যা কিনা জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় ঝুঁকি। সে সাথে মাছের বর্জ্যকে লাভজনক বিভিন্ন পণ্য হিসেবেও রূপান্তর করা যায়। এ জাতীয় পণ্যগুলোর মধ্যে বায়োঅ্যাকটিভ প্রোটিন ও পেপটাইডস, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কিছু ঔষধি পণ্য, প্রাকৃতিক রঞ্জক, শিল্প এনজাইম, বায়োডিজেল, বায়োগ্যাস, জৈব সার, কম্পোস্ট ইত্যাদি পণ্য উৎপাদনে মৎস্য বর্জ্য ব্যবহার করা যায়। এতে করে আর্থিকভাবেও অনেক লাভবান হওয়া যায়।

চিত্র: মৎস্য বর্জ্য

মৎস্য বর্জ্য থেকে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য কিছু পণ্যের পরিচিতি (Introduction to some notable products originated from fish wastes)

১. মাছের আঁইশ: মাছের আঁইশ এমন একটি বর্জ্য যার সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কোলাজেন ও হাইড্রোক্সিপ্যাটাইটের মতো উপজাত উৎপাদন করা সম্ভব। এসব উপজাতগুলো থেকে বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্য তৈরি করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ক. মাছের আঁইশ থেকে কোলাজেন/কোলাজেন পেপটাইড: কোলাজেন হাড়, ত্বক ও প্রাণীর সংযোগকারী টিস্যুতে উপস্থিত

একটি তন্তুযুক্ত প্রোটিন। মাছের আঁইশে প্রধানত কোলাজেন থাকে এবং এ কোলাজেনে খনিজলবণ- সোডিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়। গড়ে মাছের প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যের ৩০% হলো প্রোটিন কোলাজেন। কোলাজেনে তুলনামূলকভাবে উচ্চ পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন- গ্লাইসিন, প্রোলিন ও হাইড্রোক্সপ্রোলিন থাকে; যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কোলাজেনকে নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জৈবিকভাবে সক্রিয় পেপটাইড হিসেবে রূপান্তর করা যায়; যা ফার্মাসিউটিক্যাল, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ শিল্পের জন্য দরকারি। কোলাজেন পেপটাইডগুলোর ব্যবহার মানব শরীরের জন্য উপকারী হিসেবে প্রমাণিত।

চিত্র: মাছের আইশ

চিত্র: কোলাজেন পেপটাইড

খ. মাছের আঁইশ থেকে হাইড্রোক্সিপ্যাটাইট: হাইড্রোক্সিপ্যাটাইট $[Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2]$ স্ফটিক মাছের আরেকটি উপজাত। এটা মাছের হাড় এবং আঁইশের মতো প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে প্রাপ্ত। মাছের আঁইশে ৪০-৪৫ শতাংশ হাইড্রোক্সিপ্যাটাইট থাকে। মাছের আঁইশ থেকে উৎপাদিত হাইড্রোক্সাপ্যাটাইট জৈবিকভাবে নিরাপদ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এটি সস্তা কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত। হাইড্রোক্সিপ্যাটাইট মানুষের দেহের মধ্যে দাঁত ও হাড়গুলোতে পাওয়া যায়। হাইড্রোক্সিপ্যাটাইট ও ক্যালসিয়াম ফসফেটভিত্তিক উপকরণ হাড় ও কার্টিলেজ প্রতিস্থাপনের জন্য টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

চিত্র: হাইড্রোক্সিপ্যাটাইট

চিত্র: ফিস জিলাটিন

২. মাছের ত্বক: একটি কাঁচামাল যা প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় উৎপাদিত হয় এবং যা প্রায়শ অবমূল্যায়ন করা হয় তা হলো মাছের ত্বক। মাছের ত্বক থেকে চামড়া ও জিলেটিন তৈরি করা যায়; যেগুলোর বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে।

ক. মাছের ত্বক থেকে চামড়া: মাছের ত্বকের কিছু অংশ প্রক্রিয়াজাত করে স্থিতিস্থাপক এবং আকর্ষণীয় চামড়া তৈরি করা যায়। বিশেষত তেলাপিয়া ও ক্যাটফিস জাতীয় মাছের ত্বকের ব্যবহার এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। তবে সম্প্রতি হাঙ্গর, স্কেট ও স্টার্জন জাতীয় মাছের ত্বকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। উৎপাদিত এসব চামড়া থেকে হ্যান্ডব্যাগ, পার্স, জুতা, গহনা ও অলঙ্কারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও তেলাপিয়া মাছের ত্বকে অসংক্রামক অণুজীব, উচ্চ পরিমাণে কোলাজেন এবং মানব ত্বকের অনুরূপ গঠন রয়েছে। তাই এটি পোড়া জখমের ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্য জেনোগ্রাফট হিসেবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

চিত্র: পোড়া জখমে তেলাপিয়া মাছের চামড়া

খ. মাছের ত্বক থেকে জিলাটিন: মাছের ত্বক থেকে প্রস্তুতকৃত জিলাটিন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি মাছের ত্বকে কোলাজেনের হাইড্রোলাইসিস এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি অসংখ্য খাবারে থকথকে এবং ঘন হওয়ার এজেন্ট, ইমালসিফায়ার এবং স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে কাজ করে। এটি প্রসাধনী, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ফিল্ম উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। মুসলিম সমাজে বিভিন্ন পণ্যে জন্তুপায়ী প্রাণীর জিলাটিনগুলো ব্যবহারের গ্রহণযোগ্যতার নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ উঠে। কারণ প্রাণীটি হালাল কিনা বা হালাল উপায়ে জবাই করা হয়েছিল কিনা। অন্যদিকে মাছের জিলাটিনগুলোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। মুসলিমদের জন্য হালাল প্রসাধনী বা ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য তৈরিতে মাছের জিলাটিনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

৩. মৎস্য বর্জ্য থেকে এনজাইম: মাছের বর্জ্য যেমন- নাড়িভুঁড়ি, যকৃত, মাথা ও আঁইশ বিভিন্ন এনজাইম (Protease, Lipases, Transglutaminases)-এর উৎস হিসেবে বিবেচিত। মাছের বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত এনজাইমগুলো বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এনজাইমগুলো মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ অসংখ্য জৈবপ্রযুক্তির প্রক্রিয়াগুলোতে জৈব অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করে; যেমন- অনেক এনজাইম সামুদ্রিক পণ্যগুলো থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এনজাইমগুলো মাছের প্রক্রিয়াজাতকরণে ত্বক অপসারণে সহায়তা করে এবং পণ্যের সতেজতা ধরে রাখার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে; যা মাংসের ক্ষতি করে না।

৪. মাছের তেল: মাছের তেল সাধারণত মাছের নাড়িভুঁড়িকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াজাতকরণ করে চাপ দিয়ে আলাদা করা হয়। মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণ উপকারী ফ্যাটি এসিড যেমন ওমেগা-৩, ওমেগা-৬, ইকোসা পেন্টানয়িক এসিড, ডকোসা হেক্সানয়িক এসিড ইত্যাদি এবং প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন থাকে। মাছের তেল সরাসরি সেবন করা যায়; উপকারী ফ্যাটি এসিডের অভাব দূর করে; ওমেগা-৩, ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; হৃদরোগীদের উপকার করে; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৫. মাছের সাইলেজ: মাছের নাড়িভুঁড়ি ও অন্যান্য তরল পদার্থসমূহকে এসিড দিয়ে জারিত করে সাইলেজ প্রস্তুত করা যায়; যাতে প্রায় ৫৬ শতাংশ আমিষ পাওয়া যায়। ফিস সাইলেজ সরাসরি প্রাণীর খাদ্য বিশেষ করে মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। এতে মাছের উৎপাদন ও খরচ কমিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

এনজাইম

মাছের তেল

মাছের সাইলেজ

৬. মাছের পটকা: দক্ষিণপূর্ব এশিয়ান দেশগুলোতে কিছু বড় বড় মাছের পটকা খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চীনে এগুলো 'ফিস মাও' নামে পরিচিত এবং স্যুপে পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও কোলাজেনের উৎস হিসেবে খাদ্যশিল্পে মাছের পটকা ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত মাছের পটকা থেকে ৮০% পর্যন্ত কোলাজেন প্রোটিন পাওয়া যেখানে মাছের চামড়া, হাড়, পাখনা ও আঁইশ থেকে ৩০-৫০% কোলাজেন পাওয়া যায়। এমনকি মাছের পটকা থেকে একটি শক্তিশালী ও পানি প্রতিরোধী আঠা তৈরি হয়। কিছু মাছের পটকা থেকে অপারেশনের সেলাই করার সুতা তৈরি করা হয়; যা মানুষের শরীরের কাটা স্থান শুকানোর সাথে সাথে শরীরের সাথে মিশে যায় ফলে সুতা অপসারণের প্রয়োজন হয় না।

৭. চিংড়ির বহিরাবরণ থেকে তৈরি কাইটোস্যান: সামুদ্রিক জীবের বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপজাতগুলোর মধ্যে একটি হলো কাইটোস্যান; যা চিংড়ি ও অন্যান্য ক্রাস্টাসিয়ানগুলোর খোলস থেকে উৎপাদিত হয়। কাইটোস্যান প্রসাধনী ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তবে এর উপযোগিতা আরো ব্যাপক। ইতিবাচক চার্জ ও জমাট বাধার বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে কাইটোস্যানে জৈব পদার্থ আকর্ষণ করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি খাদ্যশিল্পের বর্জ্য পানিতে পাওয়া প্রোটিনযুক্ত অবশিষ্টাংশগুলোকে আবদ্ধ করে। তাছাড়া কাইটোস্যান ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট ও ছত্রাকজাতীয় জীবাণু মেরে ফেলার জন্য ফিল্টার হিসেবে কাজ করতে পারে।

চিত্র: কাইটোস্যান

৮. শামুক-ঝিনুকের খোলস: পুকুর, নদী কিংবা সমুদ্রে মাছ ধরার সময় জেলেদের জালে মাছের সাথে শামুক-ঝিনুকও উঠে আসে। এদের দেহের ভেতর কোমল মাংসল অংশটি হাঁস-মুরগির খাবার হিসেবে কাজে লাগে। আর শামুক-ঝিনুকের খোলসে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বনেট থাকায় এটি চুন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বায়োডিজেল তৈরিতে প্রাকৃতিক প্রভাবক হিসেবে শামুক-ঝিনুকের খোলস থেকে উৎপাদিত ক্যালসিয়াম অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে অতিক্ষুদ্র জীবাণুনাশক হিসেবে ও বায়োফিল্টার তৈরিতেও ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বনেটের ব্যবহার রয়েছে।

৯. শামুকের লালারস থেকে সাবান: সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সে শামুকের লালারস ব্যবহার করে এক প্রকার সাবান তৈরি করা হচ্ছে যেটা পুরো বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করেছে। এই লালারসে থাকে প্রচুর পরিমাণে উপকারী খনিজ পদার্থ থাকে যা মানুষের ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং বাজারমূল্য সাধারণ সাবানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। এছাড়াও শামুকের লালরস থেকে ত্বকের জন্য উপকারী ক্রিম তৈরি হচ্ছে যেটা আমেরিকাতে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

চিত্র: শামুকের লালারস থেকে তৈরি সাবান

বাংলাদেশের মৎস্য বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বর্তমান অবস্থা (Present status of fishery waste processing in Bangladesh)

বর্তমানে বাংলাদেশে ১০৭টি (ইইউ অনুমোদিত ৭৭) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে। এসব প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় তৈরি হওয়া মাছের বর্জ্য যেমন- মাছের মাথা, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি ফিস ফিড তৈরির জন্য স্থানীয়ভাবে বিক্রি করা হয়। আর চামড়া, পাখনা, পটকা ইত্যাদি বর্জ্যের একটি অংশ চীন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে রপ্তানি করা হয়। আবার কিছু অংশ সরাসরি ফিস মিল, পোলট্রি মিল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। আর বড় একটি অংশ সরাসরি পরিবেশে চলে যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশের কাঁচা বাজারে ও বাসাবাড়ির কাজে মাছের যেই বিপুল সংখ্যক বর্জ্য থেকে যায় সেগুলোর সিংহভাগই অব্যবস্থাপনার কারণে পরিবেশে সরাসরি চলে যাচ্ছে। এতে পরিবেশ দূষণের তীব্রতা বাড়ছে। কিছু উদ্যমী লোক মাছের বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পেরে নিজ উদ্যোগে বাজারের আর বাসাবাড়ির মাছের বর্জ্যগুলোকে স্বল্প পরিসরে প্রক্রিয়াজাতকরণের আওতায় এনে নিজেদের ভাগ্য বদলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এই লোকদের সংখ্যা একদমই অল্প।

বাংলাদেশ মাছের বর্জ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে একদমই পিছিয়ে। যেটুকু রপ্তানি হচ্ছে সেটার প্রায় সম্পূর্ণটাই মৎস্য

প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট-এর বর্জ্য এবং সেগুলো বিভিন্ন মূল্যবান পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে রপ্তানি হচ্ছে। এসব বর্জ্য আমদানি করা দেশগুলো পরবর্তীতে অধিক মূল্যবান পণ্য তৈরি করছে যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পণ্যের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে দক্ষ জনবলের অভাবে সরাসরি মূল্যবর্ধক পণ্য তৈরি করা যাচ্ছে না এক্ষেত্রে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং সরকারি উদ্যোগ ও প্রণোদনা। এ বিষয়টি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে প্রয়োজন জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

সামুদ্রিক মৎস্য বর্জ্যের উৎস ও উৎপাদিত পণ্য: সামুদ্রিক মৎস্য বর্জ্যের উৎস ও উৎপাদিত পণ্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

উৎস (Source)	বর্জ্য (Wastes)	মূল্যবান পণ্য (Valuable products)
গলদা/বাগদা চিংড়ি (Prawn/Shrimp)	মাথা, খোলস	কাইটিন, এনজাইম, ফ্লেবার, প্রোটিন হাইড্রলাইসেট
কাঁকড়া (Crab)	খোলস, নাড়িভুঁড়ি, ফুলকা	কাইটিন, রঞ্জক
লবস্টার (Lobster)	মাথা, খোলস	কাইটিন, রঞ্জক, ফ্লেবার
ক্রিল (Krill)	মাথা, খোলস	কাইটিন, রঞ্জক, প্রোটিন
ক্রেফিস (Crayfish)	মাথা, খোলস	কাইটিন, রঞ্জক, তেল, ফ্লেবার
মোলাস্ক (Molluscs)	খোলস, অখাদ্য অংশ, যকৃত, নাড়িভুঁড়ি, চোখ, মুখের অংশ	কাইটিন, এনজাইম, কোলাজেন, বায়োএকটিভ পেপটাইড, জিলেটিন
সী আর্চিন (Sea urchin), সামুদ্রিক শসা (Sea cucumber), জেলিফিস (Jelly fish)	খোলস, নাড়িভুঁড়ি	কোলাজেন, প্রোটিন হাইড্রলাইসেট, জিলেটিন

বাংলাদেশের মৎস্য বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভাবনা (Potentiality of fish waste processing in Bangladesh)

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়ে চলেছে মাছের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা। কিছু কিছু দেশ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উল্লেখিত ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যগুলো উৎপাদন করে মাছের বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করছে। এতে একদিকে তারা যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে; তার সাথে পরিবেশের দূষণও কমিয়ে আনতে পারছে। আইসল্যান্ড দেশটি অত্যন্ত সফলতার সাথে মাছের বর্জ্যের বহুমুখী ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন করছে। তারা মাছের যকৃত থেকে বিভিন্ন ওষুধ ও প্রসাধনীর কাঁচামাল, মাছের চামড়া থেকে ব্যাগ ও বেল্ট তৈরি করছে। এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে তারা প্রতিবছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করতে সক্ষম হচ্ছে। এমনকি ভারত, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম মাছের বর্জ্যকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচনা করছে। তাই আমাদের দেশেও এই খাতকে অবহেলা বা ছোট করে না দেখে একটি শিল্পখাত হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে। বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন এর একটি জরিপে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর মাছের যে পরিমাণ বর্জ্য থেকে যায় তার তিন ভাগের এক ভাগও যদি সংরক্ষণ করার মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তাহলে ৮০০০ কোটি টাকা আয় হতে পারে।

মাছের বর্জ্য ব্যবহারে করণীয় (Recommendations for utilization of fish wastes)

খাতটির সম্ভাবনার বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা, দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শ নিয়ে মাছের বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প-কারখানা স্থাপন, সরকারি প্রণোদনার আওতায় আনা, বাসাবাড়ি ও কাঁচাবাজারগুলো থেকে বর্জ্য সংগ্রহকরণ, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া।

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্য সেক্টর বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মৎস্য বর্জ্য তথা মাছের কোনো কিছুই আসলে ফেলনা নয়; এটি একটি মূল্যবান অর্থকরী সম্পদ- যদি সেগুলোকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এতে একদিকে যেমন উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভবপর হবে; অন্যদিকে উৎপাদিত মৎস্য উপজাত পণ্যগুলো রপ্তানি করে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে। কাজেই বলা যায়, মৎস্য বর্জ্য তথা- মাছের আঁইশ, পাখনা, কাটা, রক্ত, নাড়িভুঁড়ি, চামড়া, প্রোটিন ও উপকারি তেল, ইত্যাদিও হয়ে উঠতে পারে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি অমিত সম্ভাবনাময় খাত।

[১]অধ্যাপক, ফিসারিজ বায়োলজি ও জেনেটিক্স বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (ইমেইল: ahsan.sau@gmail.com)
[২]সহকারী অধ্যাপক, ফিসারিজ বায়োলজি ও জেনেটিক্স বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
[৩]সহকারী অধ্যাপক, ফিসিং ও পোস্ট হার্ভেস্ট টেকনোলোজি বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মৎস্যখাদ্যে এনজাইমের ব্যবহার : বর্তমান প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা

Application of Enzymes in Fish Feed : Present Status and Future Potentials

ড. এস এম রফিকুজ্জামান[১], নাজিয়া তাসনিম[২] ও মোঃ হাবিবুর রহমান[৩]

Abstract

Aquaculture is one of the most rapid growing sectors in the world as well as in Bangladesh. Burgeoning aquaculture sector creates huge demand for feeds. Fish meal is the main source of protein in feed, so the cost of feed is high. Profit in aquaculture mostly depends on feed cost. To minimize the cost, manufacturers are always searching alternatives other than fish meal. The most important challenges with plant products as protein sources in feeds for fishes are: low level of protein, digestibility and high level of carbohydrates, adverse amino acid profile, other nutrients and the presence of anti nutritional factors. In this context, different exoenzymes like protease, phytase, amylase, cellulase etc. can be the solution to these problems. Enzymes are catalyst that catalyze the reaction to convert complex substances into absorbable substances. Feeding the enzymes in the aquaculture sector has some nutritional advances since last few years and will also aid in reducing the effects of anti-nutritional factors. Moreover supplementation of enzymes in feed is one of the possible options for improvement of nutritional value of fish feed, dietary energy, and resulting in enhanced performance of fish/ shrimps. So, using good quality and species specefic enzymes in fish feed has great potential and could be a revolution in aquaculture for sustainable development of fisheries sector.

মাছচাষ বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান শিল্প। ধারাবাহিক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমানে মাছের উৎপাদন ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন যার ৫৭% চাষ হতে আসে। বর্তমানে চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম। নদীমাতৃক বাংলাদেশে ৩৮.৬০ লাখ হেক্টর এলাকাজুড়ে রয়েছে মিঠাপানির মুক্ত জলাশয়। এছাড়াও রয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলা লাখ লাখ পুকুর। ফলে আবহমানকাল থেকেই মৎস্য চাষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের জীবন।

মৎস্য চাষে আনুমানিক ৬৮-৭০ শতাংশ ব্যয় হয় মাছের খাবার যোগানের পেছনে, যার ৬০ ভাগ কাঁচামাল আমদানি নির্ভর। এছাড়াও খাদ্য অপচয় এবং পচনের ফলে পানির দূষণসহ নানাবিধ সমস্যা তো রয়েছেই। ফলে ব্যহত হচ্ছে মাছের স্বাভাবিক বিকাশ। ফলশ্রুতিতে মৎস্যখাতে বাংলাদেশের অর্জন অসামান্য হলেও এ অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে বিপুল পরিমাণে মৎস্যখাদ্যের অপচয়। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা হয় যে, দেশে প্রতিবছর গড়ে মাছের ৩৫ হাজার টন ভাসমান খাবার এবং ৭-৮ লাখ টন ডুবন্ত খাবার অপচয় হচ্ছে। মূলত খাবার প্রয়োগে ভুল পদ্ধতি অনুসরণ ও পুকুরে চাষ পদ্ধতিতে সঠিক পরিকল্পনার অভাব থাকার কারণেই এ বিপুল পরিমাণ মৎস্যখাদ্য নষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে দেশে মৎস্যখাদ্যের বাজারব্যাপ্তি ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, এর অর্ধেকই নষ্ট হচ্ছে পানিতে। ফলে মাছের খাদ্যের অপচয় রোধ করা গেলে একদিক থেকে যেমন দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি পুকুরের পরিবেশ সঠিক মাত্রায় সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হবে। মাছের খাদ্যের খরচ কমানোর ক্ষেত্রে এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মাছের খাদ্যের উচ্চমূল্যের অন্যতম কারণ হল মাছের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের ব্যবহার। প্রাণিজ আমিষের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ আমিষ ব্যবহার করা গেলে দাম অনেক কমিয়ে আনা যায়। উদ্ভিজ্জ আমিষ উৎসের প্রধান সমস্যা হলো এতে বিদ্যমান অ্যান্টি-নিউট্রিশনাল উপাদান, যেমন: ফাইটিক এসিড, ট্যানিন ইত্যাদি। এনজাইম ব্যবহারের মাধ্যমে এসব অ্যান্টি-নিউট্রিশনাল উপাদানগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে মৎস্যখাদ্যে উদ্ভিজ্জ আমিষ ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন মৎস্যখাদ্যের খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব, অন্যদিকে মাছের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যের অপচয়ও কমিয়ে আনা যায়। এসব কারণে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পোল্ট্রি ও মৎস্যখাদ্যে এনজাইমের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এনজাইমের বিবিধ উপকারিতার কারণে বাংলাদেশেও এর ব্যবহার দিনে দিনে বাড়ছে। তবে বাংলাদেশে ব্যবহৃত এসব এনজাইম বাইরের দেশ থেকে আমদানিকৃত এবং এসব এনজাইম এদেশের মাছের প্রজাতিভেদে নির্দিষ্ট নয়। এছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এনজাইম, মাছের খাদ্যে পূর্ব মিশ্রিত (premix) অবস্থায় ব্যবহার করা হয়, যার ফলে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে প্রকৃতপক্ষে এনজাইমের সুফল এদেশের মাছ চাষিরা এখনও পাচ্ছেনা। তাই, গবেষণার মাধ্যমে ব্যাক্টেরিয়া থেকে দেশের পরিবেশ উপযোগী এনজাইম উৎপাদন সম্ভব হলে তা সঠিক উপায়ে মাছের খাদ্যে ব্যবহারের মাধ্যমে মাছ চাষে টেকসই উন্নয়ন আনা সম্ভব হবে।

এনজাইম কী? (what is Enzyme)

এনজাইম মূলত এক ধরনের জৈব-রাসায়নিক অনুঘটক যা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে। শিল্প কারখানায় বিজ্ঞানীরা উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন করে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম তৈরি করে থাকেন। এটি ফিড এডিটিভ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মৎস্যখাদ্যে এনজাইমের ব্যবহার মাছের বিপাক ক্রিয়া বাড়ায়। এছাড়াও জটিল উপাদানগুলোকে সরল উপাদানে রূপান্তর করে। ফলে অল্প পরিমাণ খাবার সরবরাহ করে অধিক

উৎপাদন পাওয়া যায়। এতে একদিকে যেমন মাছের খাদ্যের অপচয় কমে, অন্যদিকে এন্টি নিউট্রিশনাল উপাদানগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে, যার ফলে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের শোষণ সহজ হয়।

এনজাইমের উৎস (Source of enzymes)

এনজাইম সকল জীবেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণি থেকে একবারে আদি এককোষী জীবেও এটি পাওয়া যায়। মাছ/চিংড়ির অন্ত্রে বসবাসকৃত কতিপয় অণুজীবের ক্রিয়ায় এদের অন্ত্রে প্রাকৃতিকভাবেই প্রোটিওলাইটিক এনজাইম এবং স্বল্প পরিমাণে সেলুলেজ এনজাইম উৎপন্ন হয়।

মাছের অন্ত্র থেকে এনজাইম পরিশোধন করে ফিডে ব্যবহার একইসাথে কঠিন এবং ব্যয়বহুল। বিশেষ কিছুক্ষেত্রে এনজাইম উৎপাদনের জন্য ডায়েটে সরাসরি অণুজীব যোগ করা হয়ে থাকে। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাইক্রোবিয়াল ফারমেন্টেশন প্রযুক্তি দ্বারা এনজাইম উৎপাদিত হয়। মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত এনজাইমগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত আবাদ মাধ্যমে শিল্পকারখানায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয়-

সারণি: বিভিন্ন এনজাইমের উৎস

ব্যাকটেরিয়া	ফানজাই	অণুজীব
➢ *Bacillus subtilis,* ➢ *Bacillus lentils* এবং ➢ *Bacillus stearother-mophilvs*	➢ *Trichoderma longibrachiatum* ➢ *Aspergillus niger* এবং ➢ Yeast	➢ এমাইলেজ: *Bacillus subtilis, B. cereus* এবং *Aspergillus, Mucor* ➢ প্রোটিয়েজ: *Bacillus licheniformis, B. firmus, Streptomyces fradiae Aspergillus niger, A. flavus* ➢ জাইলেজেজ- *Aspergillus, Endothia parasitica* ➢ লাইপেজ: *Pennicillium chrysogenum, Mucor spp*

এনজাইম প্রয়োগের বিবেচ্য বিষয় (Consideration of enzyme applications)

মৎস্য খাদ্যে এনজাইম এর সঠিক প্রয়োগ ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে-

(ক) ফিডে প্রয়োগকৃত এনজাইমগুলির স্থায়িত্বের উপর তাপমাত্রার প্রভাব;

(খ) তাপীয় প্রক্রিয়াজাতকরণের পরে যদি এনজাইমগুলি ফিডে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তবে তা পানিতে নষ্ট হবার সম্ভাবনা; এবং

(গ) উষ্ণ তাপমাত্রায় মাইক্রোবিয়াল ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে উৎপাদিত এনজাইমগুলির কার্যকারিতা।

ফিডে এনজাইম অন্তর্ভুক্তি সাধারণত দুটি উপায়ে করা হয়- প্রক্রিয়াধীন সংযোজন এবং প্রক্রিয়াত্তোর সংযোজন। এনজাইম নিষ্কাশনের সময় তাপমাত্রা ১১০ থেকে ১২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর পরিসীমা পর্যন্ত বেড়ে যায়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে এনজাইম এবং প্রোবায়োটিকের মতো তাপ সংবেদনশীল পরিপূরক প্রয়োগ সম্ভব নয়।

তাই সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে ফিড পিলেট তৈরির পরে তরল সংযোজন আকারে এনজাইম প্রয়োগ সবচেয়ে ভাল বিকল্প। এভাবে সঠিক এনজাইম সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে ফিডের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতা (Functions of different enzymes)

ফিডে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের এনজাইম রয়েছে যার মধ্যে ফাইটেজ, জাইলেনেজ, সেলুলেজ, লাইপেজ, প্রোটিয়েজ, অ্যামাইলেজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি এনজাইমের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বা কার্যকারিতা রয়েছে, নিম্নের সারণিতে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

এনজাইম	কার্যকারিতা
অ্যামাইলেজ	জটিল শর্করা ও স্টার্চ পরিপাকে সহায়তা করে
সেলুলেজ	সেলুলোজ ভাঙতে সহায়তা করে
লাইপেজ	তেল ও চর্বি পরিপাকে সহায়তা করে এবং ইমালসিফায়ার (Enulsifier) হিসেবে কাজ করে
ফাইটেজ	ফাইটেট-পি, গৌণ খনিজ উপাদান এবং প্রোটিনকে জৈবউপলভ্য (Bioavailable) করে
প্রোটিয়েজ	প্রোটিন পরিপাকে সহায়তা করে
জাইলেনেজ	নন-স্টার্চ পলিস্যাকারাইড পেন্টোসান কে ভাঙতে সহায়তা করে
পেক্টিনেজ	এন্টি নিউট্রিশনাল উপাদানগুলোকে ভেঙে ফেলে নিষ্ক্রিয় করে
ম্যানানেজ	নন-স্টার্চ পলিস্যাকারাইড ম্যানান কে ভাঙতে সহায়তা করে
কেরাটিনেজ	কেরাটিন ভাঙতে সহায়তা করে
ট্যানেজ	এন্টি নিউট্রিশনাল উপাদান ট্যানিনকে দূর করতে সহায়তা করে
অ্যারাবিনেজ	এন্টি নিউট্রিশনাল উপাদানগুলোকে ভেঙে ফেলে নিষ্ক্রিয় করে
আলফা-গ্যালাক্টোসাইডেজ	আলফা- গ্যালাক্টোসাইড কে ভেঙে ফেলে যাতে এন্টি নিউট্রিশনাল উপাদানগুলো কমে যায়
বিটা-গ্লুকোসাইডেজ	বিটা গ্লুকান এর কার্যকারিতা নষ্ট করে যাতে পুষ্টি উপাদান সঠিকভাবে কাজ করতে পারে

তবে এনজাইমের কার্যকারিতা বিবেচনা করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে সকল এনজাইম সকল মাছের জন্য উপযুক্ত নয়। যেমন প্রোটিয়েজ এনজাইম মূলত মাংসাশী বা সর্বভুক মাছের জন্য বেশি প্রয়োজন। আবার শাকাশী মাছের জন্য ফাইটেজ ও সেলুলেজ বেশি প্রয়োজন। এনজাইমের কার্যকারিতায় প্রজাতি সম্পর্কিত পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা ছাড়াও, এটিও সম্ভব যে ফিডে ব্যবহৃত উপাদানগুলির সাথে এনজাইম

কার্যকর নয়। মূলত এসকল বিষয় বিবেচনায় রেখে এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: ফাইটেজ

চিত্র: সেলুলেজ

মৎস্যখাদ্যে এনজাইম ব্যবহারের প্রেক্ষাপট (Background of using enzymes in fish feed)

প্রাকৃতিক নিয়মে পুকুরে মাছের যেসব খাবার (প্ল্যাঙ্কটন) উৎপাদন হয়, তা সার্বিক পুষ্টি চাহিদা মেটানোয় যথেষ্ট নয়। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাবার মাছের উৎপাদন বাড়াতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলো হচ্ছে চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ফিশমিল, গরু-ছাগলের রক্ত, নাড়িভুঁড়ি, রেশম কীট এবং জলজ উদ্ভিদ যেমন কচুরিপানা, খুদেপানা, কুটিপানা ইত্যাদি। বিশ্বজুড়ে একোয়াকালচারের বিকাশের সাথে সাথে বর্ধিত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গবেষকরা প্রতিনিয়ত মৎস্য খাদ্যের সাথে পরিপূরক এনজাইম ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য খাদ্যের মান উন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ফিশফিড উৎপাদনে ফিশমিল প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কমার্শিয়াল মৎস্য খাদ্যে প্রোটিনের উৎস হিসেবে সাধারণত ৩০-৫০ শতাংশ ফিশমিল ব্যবহার করা হয়। তবে ফিশমিল অপ্রতুল ও ব্যয়বহুল হওয়ায় গত দশকের শুরু থেকেই ফিশমিলে এনজাইমের ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টিগুণ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাছের অন্ত্র থেকে সংগৃহিত এনজাইম প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। প্রোটিওলাইটিক এনজাইম মাছের খাবারে যুক্ত করে তেমন কোন বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। পরবর্তীতে, স্টার্চ হজমকারী এনজাইম এমাইলেজ, যখন ০.২% হারে যুক্ত হয়, তখন ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ফিড এডিটিভ হিসেবে এনজাইম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ফিড শিল্পে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য এনজাইমগুলো হলো সেলুলেজ, ফাইটেজ, প্রোটিয়েজ, লাইপেজ, গ্যালাকটোসাইডেজ ইত্যাদি।

ফিডে এনজাইম সরবরাহের মাধ্যমে মাছের বিপাক ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় বিধায় অল্প ফিড প্রয়োগেই মাছের উৎপাদন বেশি হয়, ফলে এফ.সি.আর (FCR) কমে আসে। এছাড়াও, মাছের প্রাথমিক বিকাশের সময় বা সারাজীবন নির্দিষ্ট কিছু হজম এনজাইমের ঘাটতি থাকে। মাছে / চিংড়ির ক্ষেত্রেও প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ও কিছু নির্দিষ্ট এনজাইমের ঘাটতির ক্ষেত্রে, ফিড তৈরিতে এনজাইম এর প্রয়োগের ফলে এনজাইমগুলো মাছের উন্নত বিপাকক্রিয়া ও সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করে।

এভাবে ফিডে এনজাইমের ব্যবহার একইসাথে উন্নত বিপাকক্রিয়া নিশ্চিত করে এবং মৎস্য খাদ্যের ব্যয় হ্রাস করে। তাই গত দশক থেকে মৎস্য ও গো-খাদ্যে এনজাইমের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ফলে পুষ্টি নিশ্চিত হয় এবং পাশাপাশি মাছ চাষে ব্যয় কমে আসে।

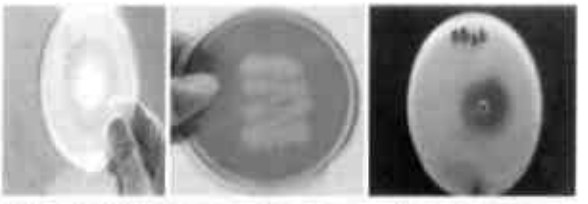

চিত্র: সেলুলেজ জিন

চিত্র: প্রোটিয়েজ জিন

চিত্র: ফাইটেজ জিন

মৎস্যখাদ্যে এনজাইম ব্যবহারের উপকারিতা (Benefits of using enzyme in fish feed)

সফল এবং টেকসই মৎস্য চাষ অর্থনৈতিকভাবে টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব খাদ্যের উপর নির্ভর করে। খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের এনজাইম রয়েছে যা পুষ্টির উপস্থিতি বাড়াতে পারে, হজমের সময় পুষ্টির শোষণ, মাছের বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে তোলে এবং জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মাছকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। এছাড়াও এনজাইমের ব্যবহারে খাবার অপচয় কমে, ফলে ফিডগুলি সাশ্রয়ী হয়।

এনজাইমসমূহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের গাজনের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত পণ্য এবং তাই মাছ/চিংড়ির স্বাস্থ্য এবং পুকুরের পরিবেশের জন্য কোনও হুমকি নেই। এনজাইমসমূহ পুকুরের পরিবেশে উচ্চ ফসফরাস আউটপুট সমস্যা হ্রাস করে। এছাড়াও এটি পুকুরের পানিতে অ্যামোনিয়ার মাত্রা হ্রাস করে।

তাছাড়া মাছের এনজাইম ব্যবহারের ফলে লার্ভা মৃত্যুর হার কমে আসে। এনজাইমযুক্ত খাদ্য, লার্ভার বিকাশের জন্য অত্যন্ত

উপযোগী। এনজাইম প্রয়োগের ফলে মাছ ফাইটোপ্লাঙ্কটন এবং জলজ শৈবাল থেকে পুষ্টি নিতে পারে ফলে ক্যারোটিনয়েড এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এনজাইম অ্যাকোয়া ফিডে ফিশমিলের ব্যবহার হ্রাস করতে পারে এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ উপাদানে এনজাইম প্রয়োগের মাধ্যমে অ্যান্টি-নিউট্রিশনাল উপাদানগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে এটি মৎস্যখাদ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত মাছের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে। এর পাশাপাশি ফিশমিলের চাহিদা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটি। এছাড়া এনজাইমের কিছু সাধারণ উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

- মাছের হজম শক্তি বাড়ায় এবং পুষ্টি উপাদানের শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (বিশেষভাবে স্নেহ ও আমিষ জাতীয় উপাদান)
- খাদ্যের আপাত বিপাক শক্তি (apparent metabolize energy) বৃদ্ধি করে
- খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং ওজন ও ফিড গ্রহণ এর অনুপাত বৃদ্ধি পায়
- অ্যামোনিয়া উৎপাদন হ্রাস পায়
- অধিক মানসম্মত মৎস্যজাত পণ্যের বাড়তি চাহিদার মেটায়
- অধিক খাদ্যগুণ সম্পন্ন বিকল্প খাদ্যের চাহিদা মেটায়
- অতি দ্রুত মুনাফা লাভ করা যায়।

মৎস্যখাদ্যে এনজাইম ব্যবহারের বর্তমান পরিস্থিতি (Present status of using enzymes in fish feed)

দেশীয় এনজাইম শিল্প অনেকটাই আমদানি নির্ভর। হাতে গোনা কিছু প্রতিষ্ঠান এনজাইম এর বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় এনজাইম ব্যবহার শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে এসব এনজাইম নির্দিষ্ট প্রজাতিভিত্তিক না হওয়ায় এবং ব্যবহারের প্রয়োগ বিধি যথোপযুক্ত না হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এদেশে এর তেমন কোন সুফল প্রতীয়মান হচ্ছে না। এর সুফল পেতে হলে প্রজাতিভিত্তিক নির্দিষ্ট এনজাইম প্রয়োজন যা দেশীয় নমুনা থেকে নির্দিষ্ট ব্যাক্টেরিয়া আলাদা করে তা থেকে উৎপাদন করা যায়। এরপর এ এনজাইম যথাযথভাবে মাছের খাদ্যে ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন যেমন বাড়ানো যাবে, ঠিক তেমনি মাছের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় কমিয়ে খাদ্যের খরচও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। চলমান গবেষণায় দেখা গেছে যে আমদানিকৃত বাণিজ্যিক এনজাইমের চেয়ে দেশীয় নমুনা থেকে নির্দিষ্ট ব্যাক্টেরিয়া আলাদা করে তা থেকে উৎপাদিত এনজাইম এর গুণগত মান অনেক ভালো। দেশে মৎস্য খাদ্যে এনজাইম এর ব্যবহার নিয়ে গবেষণার পরিসর আরো বাড়ানো উচিত এবং এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলে দেশের মৎস্য খাদ্য শিল্পে যুগান্তকারী ও টেকসই পরিবর্তন ও উন্নয়ন আনা সম্ভব।

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত মৎস্যখাদ্যে বর্তমানে ব্যাপকহারে এনজাইমের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বজুড়ে মাছ চাষে মৎস্যখাদ্যে এনজাইমের ব্যবহার দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। Novozymes এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাদের বিশ্বব্যাপী ৪০% এর বেশি মার্কেট শেয়ার আছে বলে ধারণা করা হয়। অন্যান্য প্রধান সরবরাহকারীদের মধ্যে রয়েছে BASF এবং Danisco। ফিড এডিটিভ কোম্পানি যেমন Kemin, Alltech এবং DSM এরাও ফিড এনজাইম ব্যবসার সাথে যুক্ত। কিছু চীনা কোম্পানিও বর্তমানে ফিড এনজাইম প্রস্তুত করে বলে দাবি করে। ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত BIOCON কে এনজাইম এর সর্ববৃহৎ উৎপাদক ও রপ্তানিকারক হিসেবে ধারণা করা হয়।

মৎস্যখাদ্যে এনজাইম ব্যবহারের ভবিষ্যত সম্ভাবনা (Future potentials of using enzymes in fish feed)

দেশে বর্তমানে চাষকৃত মাছের উৎপাদন ও আবাদ এলাকা বাড়ছে ৫-৮ শতাংশ হারে। ২৬ লক্ষ মে.টন চাষকৃত মাছের মধ্যে শুধু পুকুরেই মাছের উৎপাদন দাড়িয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ মে.টন। বর্ধিত জনসংখ্যার পুষ্টিচাহিদা মেটাতে মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন উন্নত মানের মৎস্যখাদ্য। এছাড়া মৎস্যখাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য মৎস্যখাদ্যের অপচয় কমিয়ে আনা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন খাদ্যের দামও কমিয়ে আনা। মৎস্যখাদ্যে প্রাণিজ উপাদানের পরিবর্তে উদ্ভিদ ভিত্তিক উপাদান যেমন চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, সয়াবিন মিল অধিকহারে ব্যবহার করা গেলে খাদ্যের দাম অনেকাংশে কমিয়ে আনা যেত। তবে উদ্ভিজ্জ আমিষ উপাদান ব্যবহারের মূল সমস্যাগুলো হলো- মাছের উদ্ভিজ্জ আমিষের পরিপাক ক্ষমতা কম থাকা, উচ্চমাত্রায় শর্করার উপস্থিতি, প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড না থাকা, এন্টি-নিউট্রিশনাল উপাদানের উপস্থিতি ইত্যাদি। খাদ্যে এনজাইম ব্যবহারের মাধ্যমে এসব সমস্যা অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব কেননা এনজাইম, উদ্ভিজ্জ আমিষ উপাদানের এন্টি-নিউট্রিশনাল উপাদান দূর করার পাশাপাশি এর পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি, প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি, মাছের বিপাক ক্রিয়া বাড়ানোর মত কাজগুলো করে থাকে। তাই বলা যায়, মৎস্যখাদ্যে উন্নত ও কার্যকরী এনজাইমের ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মৎস্যখাতের বিপ্লব ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

উপসংহার (Conclusion)

বর্তমানে এনজাইম ব্যবহারের মাধ্যমে ফিশমিলের ব্যবহার প্রায় ৫% পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, যা আগামী বছরগুলিতে ফিশমিলের চাহিদা হ্রাস করতে সহায়তা করবে। এনজাইমের ব্যবহার কেবল মাছের দৈহিক বৃদ্ধিকেই ত্বরান্বিত করে না, হজম না হওয়া খাবার এবং ফসফরাস নিঃসরণের কারণে পুকুরের পানির ইউট্রোফিকেশন হ্রাস করে। ফলে পানির গুণমান এবং মাছের স্বাস্থ্য বজায় থাকে। এর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে যেমন খামারির আয় বাড়বে, তেমনি দেশও হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধিশালী। এছাড়া এ বিষয়ে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাগুলোকেও ভালোভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

*প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (ইমেইল : rahquzzaman@bsmrau.edu.bd)
**রিসার্চ ফেলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
***রিসার্চ ফেলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

গলদা চিংড়ি হ্যাচারির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : সেফটি-উইনরক এর উদ্যোগ

Bangladesh Freshwater Prawn Hatchery Challenges, Prospects, and Initiatives from SAFETI-Winrock

Sukumar Biswas[1] and Dr. Mohammad Mokarrom Hossain[2]

Abstract

Bangladesh has over 65,000 hectares of farms suitable for freshwater prawn farming. To support grow-out farming by 2009 Bangladesh had approximately 80 private and NGO operated hatcheries with an estimated total production of between 190 and 220 million postlarvae (PL). Since 2011, Bangladesh hatcheries have been experiencing high mortalities during the larval rearing stages. By 2022, the number of functional private owned hatcheries had declined to only 15, with a total production of 35 million postlarvae (PL). Other countries in the region including China, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Vietnam, have observed similar problems but thus have switched to the use of mainly domesticated and SPF (Specific Pathogen Free) broodstock (including China, Thailand, and Vietnam) report they have largely resolved the problem, while those still using wild broodstock (Bangladesh, Myanmar, Malaysia) report they have not. Currently most broodstock used by Bangladesh hatcheries are collected from the wild – mainly from rivers and inland water bodies. A move towards disease free domesticated broodstock instead of the use of wild broodstock could be a vital step in revitalizing the industry.

গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*) চাষের দীর্ঘ ইতিহাসে আশি দশক পর্যন্ত বিশ্বে গলদা চিংড়ির উৎপাদন ছিল মাত্র ৩,০০০ মে.টনেরও কম। সত্তর দশকে গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদনে সফলতা পাওয়ার সাথে সাথে গলদা চিংড়ির চাষ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২০১৮ সালে বিশ্বে মোট গলদা চিংড়ির উৎপাদন ২,৩৭,১২৪.৫০ মে.টনে উন্নীত হয় (FAO database); যার মধ্যে ১৩৩,২৬৬ মে.টন উৎপাদন করে চীন প্রথম এবং ৫১,৫৭১ মে.টন উৎপাদন করে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। কিন্তু গত দশকে অন্যান্য দেশগুলোর উৎপাদন হ্রাস পায়।

নব্বই দশকের শেষের দিকে গলদা চিংড়ির চাষ লাভজনক এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় ব্যবসা হিসেবে গড়ে ওঠে। গলদা চিংড়ির রোগ সংবেদনশীলতা লোনা পানির বাগদা চিংড়ি অপেক্ষা অনেক কম হওয়ায় উৎপাদন ও বিনিয়োগ ঝুঁকিও কম। বাংলাদেশে গলদা চাষের জন্য ৬৫,০০০ হেক্টরের বেশি উপযোগী জলাশয় রয়েছে যেখানে চাষের জন্য বছরে প্রায় ১৫০-২০০ কোটি পিএল প্রয়োজন হয়। হ্যাচারিতে লার্ভার ব্যাপক মৃত্যুর কারণে ২০১১ সাল থেকে হ্যাচারিগুলোতে বছরে মাত্র ২-৫ কোটি পিএল উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে টেকসই চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য হ্যাচারি উৎসের ভালো গুণগতমানের পিএল উৎপাদন জরুরি।

গলদা হ্যাচারি সম্প্রসারণ (Expansion of galda hatcheries)

নব্বই দশকের গোড়ার দিকে হ্যাচারিতে অল্প পরিসরে গলদার পিএল উৎপাদন শুরু হয় এবং চিংড়ি চাষের ক্রমাগত সম্প্রসারণ, পিএল-এর চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধি, নদীর পিএল-এর প্রাপ্যতা কমে যাওয়া এবং সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে নদী উৎসের পিএল ধরতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে বেসরকারি হ্যাচারির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও হ্যাচারি উৎপাদিত পিএল-এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও বেসরকারি খাতে হ্যাচারি স্থাপনে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৯ সালের মধ্যে দেশে মোট বেসরকারি ও এনজিও সেক্টরের স্থাপিত হ্যাচারির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮০টি এবং হ্যাচারি থেকে মোট ২০ কোটি পিএল উৎপাদনের পাশাপাশি সরকারি হ্যাচারি থেকেও অতিরিক্ত পিএল এর যোগান ছিল। বর্তমানে দেশে ছোট বড় মোট বেসরকারি বাণিজ্যিক হ্যাচারির সংখ্যা ৮১টি; যার মোট পিএল উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৮৫ কোটি।

গলদা হ্যাচারিতে গত চৌদ্দ বছরের পিএল উৎপাদন চিত্র (Total PL production of galda hatcheries during last14 years)

২০০৯ সালে ৬০টি হ্যাচারিতে সর্বোচ্চ ২০ কোটি পিএল উৎপাদিত হয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালে হ্যাচারির সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৫টি এবং মোট পিএল উৎপাদন হয় মাত্র ৩.৫ কোটি (প্রায়); যা বিশাল চাহিদার মাত্র ১.৭%। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ২৭টি গলদা হ্যাচারির মধ্যে

অর্ধেকের বেশি হ্যাচারিতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় ও বেশ কয়েকটি হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদনে সফলতা এসেছে।

চিত্র: বাংলাদেশের গলদা হ্যাচারিতে মোট পিএল উৎপাদন

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও করণীয় (Potentials and Measures to be taken)

বাংলাদেশের চিংড়ি সেক্টর অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত যা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতে পারে। এ সম্ভাবনাময় খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হলো হ্যাচারি উৎপাদিত ভালো গুণগতমানের পিএল-এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। চাষ পদ্ধতির উন্নয়নের সাথে সাথে পিএল-এর চাহিদাও বেড়ে যাবে, আবার প্রাকৃতিক বা নদী উৎসের পিএল ধরা বন্ধের নীতিমালা কার্যকর থাকলে চাষের জন্য শতভাগ পিএল হ্যাচারি হতে সরবরাহ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রায় ২০০ কোটি পিএল সরবরাহের জন্য মাঝারি আয়তনের (৫০ লক্ষ/চক্র) প্রায় ২০০-২৫০টি হ্যাচারির দরকার হবে। সুতরাং প্রয়োজনীয় পিএল সরবরাহের জন্য হ্যাচারির সংখ্যা ও উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

হ্যাচারিতে ভালো গুণগতমানের পিএল উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে অনিয়ন্ত্রিত নদী বা ঘের উৎসের ব্রুডস্টক ব্যবহারের পরিবর্তে রোগমুক্ত ও কৌলিতাত্ত্বিকভাবে উন্নত ব্রুডস্টক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেসব দেশ যেমন- চীন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম যারা পূর্বে পিএল উৎপাদনে একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে; বর্তমানে তারা হ্যাচারিতে ডোমিস্টিকেটেড ও এসপিএফ (Specific Pathogen Free) ব্রুডস্টক ব্যবহারের মাধ্যমে ভালো গুণগতমানের পিএল উৎপাদন করছে। এমতাবস্থায় দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ হলো অনিয়ন্ত্রিত নদী বা ঘের উৎসের ব্রুডস্টক ব্যবহারের পরিবর্তে ডোমিস্টিকেটেড ও এসপিএফ ব্রুডস্টকের ব্যবহার; যা বাংলাদেশের গলদা হ্যাচারিগুলোকে পুনরায় সফলভাবে পিএল উৎপাদনে ফিরিয়ে আনতে পারে। এজন্য আশু করণীয় হলো- (১) অগ্রাধিকারভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাণিজ্যিকভাবে গলদার ডোমিস্টিকেটেড ব্রুডস্টক গড়ে তোলা ও চাহিদামতো হ্যাচারিগুলোতে তা সরবরাহ করা; এবং (২) বাইরের দেশ হতে গলদার এসপিএফ ব্রুডস্টক আনার সরকারি অনুমতি প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজতর করা; যাতে গলদা হ্যাচারিগুলো এসপিএফ ব্রুডস্টক ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে ভালো গুণগতমানের পিএল উৎপাদন করতে পারে। আর চাষের জন্য প্রয়োজনীয় হ্যাচারি উৎপাদিত ভালো গুণগতমানের পিএল সরবরাহ নিশ্চিত হলে গলদা চিংড়ির উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং সেসাথে রপ্তানি আয়ও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

সেফটি-উইনরক এর উদ্যোগ (SAFETI-Winrock Initiatives)

ইউএসডিএ-এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা উইনরক বাস্তবায়নাধীন সেফটি প্রকল্প চিংড়ি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদনে চলমান সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এজন্য সেফটি, বিএফআরআই, প্রকল্প পার্টনার ওয়ার্ল্ডফিস, যুক্তরাষ্ট্রের অবার্ন ইউনিভার্সিটি এবং কেন্টাকি স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের সিফাস (CEFAS- সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট, ফিসারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার সায়েন্স), থাইল্যান্ডের সেন্টেক্স (CENTEX) এবং দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কাজ করছে। সেফটি প্রকল্পের উদ্যোগে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১. হ্যাচারি সমস্যার কারণ অনুসন্ধান ও রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণা: ২০১৭ সাল থেকে ওয়ার্ল্ডফিস এবং সেফটি প্রকল্প গলদা হ্যাচারিতে লার্ভার ব্যাপক মৃত্যু সমস্যার রোগ সংক্রান্ত দিকগুলো উদঘাটনে যৌথভাবে কাজ করছে। ২০১৯ সালে, ওয়ার্ল্ডফিসের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে সিফাস (CEFAS) বিভিন্ন নদী ও ঘের থেকে সংগৃহীত ব্রুডস্টকের নমুনা এবং হ্যাচারি থেকে সংগৃহীত দূর্বল ও মৃতপ্রায় লার্ভার নমুনা পরীক্ষা করে। সিফাস অধিকতর পরীক্ষণের জন্য উপযুক্ত নমুনা সংগ্রহ, সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য পরামর্শ দেয় কিন্তু কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ ও সরবরাহ স্থগিত হয়ে যায়।

২. দেশীয় গলদা স্টকের ডোমিস্টিকেশন: এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের (চীন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড) মতো বাংলাদেশের গলদা হ্যাচারিতে ডোমিস্টিকেটেড ব্রুডস্টক ব্যবহার হ্যাচারি খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সেফটি প্রকল্প বিএফআরআই, ওয়ার্ল্ডফিস ও বেসরকারি কোম্পানি ফিসটেক বিডি লিঃ-এর সাথে গলদার

ছিত্র: ফিসটেক গলদা ডোমিস্টিকেশন ফার্ম

ডোমিস্টিকেটেড ব্রুডস্টক গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। এটি একটি কমপক্ষে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম এবং এজন্য ফিসটেক পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ডোমিস্টিকেশন ফার্ম স্থাপন করেছে। ২০২১ সালে ফিসটেক বিডি ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর সহায়তায় ডোমিস্টিকেশনের প্রথম ধাপ বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে দেশের ৪টি নির্বাচিত নদী থেকে প্রয়োজনীয় ব্রুডস্টক সংগ্রহ করে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহের (MrNV, MrTV, XSV, novel virus MrGV, *Spiroplasma eriocheiris* and *Metanophrys sinensis*) পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে শুধু রোগমুক্ত ব্রুডস্টক থেকে প্রাপ্ত লার্ভা উৎস অনুযায়ী পৃথক পৃথক ট্যাংকে প্রতিপালন করা হয় এবং উৎপাদিত পিএল উৎস অনুযায়ী পৃথক পৃথক পুকুরে মজুদ করা হয়। পরবর্তীতে স্টকসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রজনন এর উদ্দেশ্যে পৃথক প্রথক স্টক থেকে স্ত্রী ও পুরুষ নির্দিষ্ট অনুপাতে (২:১) ব্রিডিং পুকুরে মজুদ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, ব্রিডিং পুকুর থেকে ব্রুডস্টক সংগ্রহ করে ১ম বছরের মত একইভাবে ব্রুডস্টক এর নমুনা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রোগমুক্ত ব্রুডস্টক থেকে প্রাপ্ত লার্ভা উৎস অনুযায়ী পৃথক পৃথক ট্যাংকে প্রতিপালন শুরু হয়েছে এবং উৎপাদিত পিএল উৎস অনুযায়ী পৃথক পৃথক পুকুরে মজুদ করা হবে। এভাবে অন্তত চার জেনারেশন পর প্রাকৃতিকভাবে একটি সুস্থ ব্রুডস্টক গড়ে উঠবে; যা দেশের গলদা হ্যাচারিগুলোকে আবার সফলভাবে পিএল উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে।

চিত্র: কুয়াকাটায় ফিসটেক গলদা ডোমেস্টিকেশন ফার্ম

৩) বায়োফিল্টার বা আরএএস (একই পানির পুনঃব্যবহার পদ্ধতি) প্রযুক্তির সাহায্যে হ্যাচারি পরিচালনা ট্রায়াল: ২০০৫ সালের পর হতে দেশের গলদা হ্যাচারিগুলো নিয়মিত পানি পরিবর্তন পদ্ধতিতে (flow through system) পরিচালিত হয়ে আসছে। এই পদ্ধতির বড় সমস্যা হলো লার্ভা ট্যাংকের পানিতে আন-আয়োনাইজড অ্যামোনিয়ার (NH3) মাত্রা প্রায়শই ০.১ পিপিএম এর ওপরে থাকে অর্থাৎ টোটাল অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের (TAN) মাত্রা প্রায়শই ১-২ পিপিএম থাকে এবং অনেক সময় ৪-৬ পিপিএম পর্যন্ত দেখা যায় (পিএইচ ৭.৮ এবং ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ০.২-০.৩ আন-আয়োনাইজড অ্যামোনিয়ার সমতুল্য) যা গলদা লার্ভার জন্য খুবই ক্ষতিকর ও মৃত্যুর কারণ হয়। লার্ভা ট্যাংকের পানিতে অ্যামোনিয়া লেভেল বেড়ে যায় বিধায় নিয়মিত পানি পরিবর্তন করতে হয় এবং প্রয়োজনে ২-৩ দিন পরপর প্রায় সম্পূর্ণ পানি পরিবর্তন করতে হয়। ফলে লার্ভা প্রতিপালনে

চিত্র: ব্র্যাক হ্যাচারিতে আরএএস পদ্ধতিতে লার্ভা প্রতিপালন

প্রচুর আধা লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হয়, এজন্য উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। আবার প্রতিনিয়ত পানি পরিবর্তন করতে হয় জন্য পানির সঠিক গুণাগুন বজায় রাখা যায় না, যা লার্ভার জন্য ক্ষতিকর হয়। বায়োফিল্টার বা আরএএস (RAS) পদ্ধতিতে লার্ভা ট্যাংকের পানিতে তৈরি হওয়া অ্যামোনিয়া সম্পূর্ণ দূর করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং পানির গুণাগুনও অনুকূলে রাখা যায়; যা গলদা লার্ভার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়। আরএএস প্রযুক্তি বাস্তবায়নে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অবার্ন ইউনিভার্সিটি এবং কেন্টাকি স্টেট ইউনিভার্সিটির কারিগরি তত্ত্বাবধানে সেফটি প্রকল্প বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক এর বরিশাল হ্যাচারিতে আরএএস প্রযুক্তির সাহায্যে একটি উৎপাদন চক্র পরিচালনা করে, যেখানে প্রচলিত দেশীয় মিডিয়া-পাথর, ঝিনুক ও নাইলনের মাল্টুনি ব্যবহার করা হয়। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে ফলো-আপ ট্রায়ালটি স্থগিত হয়। ২০২১ সালে, ফিসটেক কর্তৃক স্থাপিত কুয়াকাটা গলদা হ্যাচারিতে আরএএস ট্রায়ালটি পুনরায় শুরু হয়; যেখানে বিদেশে তৈরি আধুনিক ও উন্নতমানের K1 ও K5 প্লাস্টিক মিডিয়া ব্যবহার করা হয় এবং পানি পরিবর্তন পদ্ধতির তুলনায় কম খরচে বেশি পিএল পাওয়া যায়। ২০২২ সালে অধিকতর নিরীক্ষণ ও পরিষ্কার তুলনামূলক ফলাফলের জন্য ফিসটেক গলদা হ্যাচারিতে পুনরায় আরএএস ও প্রচলিত পানি পরিবর্তন পদ্ধতিতে লার্ভা প্রতিপালন শুরু হয়েছে।

চিত্র: ফিসটেক হ্যাচারিতে আরএএস পদ্ধতিতে লার্ভা প্রতিপালন

৪) হ্যাচারি টেকনিশিয়ানদের জন্য প্রশিক্ষণ: সফল ও বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত হ্যাচারি পরিচালনা পদ্ধতি এবং সঠিক জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিগুলোকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সেফটি প্রকল্প সরকারি-বেসরকারি গলদা হ্যাচারি টেকনিশিয়ানদের জন্য ২০১৯-২০২২ সাল পর্যন্ত 'উন্নত পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ৩-৫ দিনের ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে।

চিত্র: গলদা হ্যাচারি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

চিত্র: গলদা হ্যাচারি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

৫) গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনা বিষয়ক কারিগরি ম্যানুয়াল (SOP) তৈরি ও প্রকাশনা: বাংলাদেশের বেশির ভাগ গলদা হ্যাচারি নব্বই দশকে তৈরি হ্যাচারি ম্যানুয়লের সুপারিশ অনুসরণ করে পরিচালিত হয় কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন হয়নি। সেফটি প্রকল্প-এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে অভিজ্ঞ হ্যাচারি বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশকৃত উন্নত ও বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত হ্যাচারি পরিচালনা পদ্ধতি সংযোজন করে গলদা হ্যাচারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি আধুনিক ও সংশোধিত কারিগরি ম্যানুয়াল (SOP) তৈরি করেছে; যেটি দেশের গলদা হ্যাচারিগুলো পরিচালনায় সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র: হ্যাচারি পরিচালনা ম্যানুয়াল

উপসংহার (Conclusion)

স্বাদু পানির গলদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকারি-বেসরকারি হ্যাচারিতে সফলভাবে পিএল উৎপাদনে চলমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রয়োজন; যেমন- প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুডস্টক ব্যবহারের পরিবর্তে বাণিজ্যিকভাবে গলদা চিংড়ির ডোমিস্টিকেটেড ব্রুডস্টক উৎপাদন ও চাহিদা মতো তা হ্যাচারিগুলোতে সরবরাহ করা; বাইরের দেশ হতে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে উন্নতমানের গলদা চিংড়ির এসপিএফ ব্রুডস্টক আনার সরকারি অনুমতি প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজতর করা; যাতে গলদা হ্যাচারিগুলো ডোমিস্টিকেটেড ও এসপিএফ ব্রুডস্টক ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে সফলতার সাথে ভালো গুণগতমানের পিএল উৎপাদন করতে পারে। এছাড়া হ্যাচারিতে সফলভাবে উন্নতমানের গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে অধিকতর গবেষণা পরিচালনা; হ্যাচারির প্রয়োজনে বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের ল্যাব স্থাপন-যেখানে পানির গুণাগুন বিশ্লেষণ, ব্রুডস্টকের নমুনা পরীক্ষা, লার্ভা ও পিএল-এর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ; লার্ভা ট্যাংকে ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্ন প্যারাসাইটের উপস্থিতি ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন পরীক্ষণের কাজগুলো সহজে করা যায়। অধিকন্তু হ্যাচারিতে জৈবনিরাপত্তা জোরদারকরণের মাধ্যমে গুণগতমানের পিএল উৎপাদন বৃদ্ধি করে চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গলদা চিংড়ির উৎপাদন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

---

[1]Prawn Hatchery & Farming Specialist, SAFETI Project-Winrock International (Email: sukumar.biswas@winrock.org)
[2]Former Head of BRAC Fisheries Program, COP of USDA funded Winrock-SAFETI Project, currently, working for WorldFish.

এসপিএফ হ্যাচারিতে উৎপাদিত হাই হেল্‌থ পিএল : জৈব-নিরাপদ চিংড়ি নার্সারির গুরুত্ব

High Health PL Produced in SPF Shrimp Hatcheries : Importance of Biosecured Shrimp Nurseries

Aung Kyaw Mra

Abstract

In the fisheries sector of Bangladesh, farmed shrimp plays an important role contributing significantly to the country's aquaculture production, export of frozen foods and the livelihoods of an estimated one million people. The national shrimp value chain includes shrimp seed production in hatcheries, seed traders, shrimp nurseries, grow-out farms, intermediate markets, processing plants, exporters, as well as suppliers of feed and other production inputs. In the entire chain, the production of shrimp seed in the hatchery and thereafter, nursing PL (Post Larvae) in nurseries in shrimp culture area, is of prime importance, as the grow-out farms are dependent on having an adequate supply of dependable quality PL. Usually small farmers in the remote area collect very few number of PL for their shrimp farms and have no or very less connectivity with SPF (Specific Pathogen Free) hatchery or their marketing channels and fully depends on sub agents or other sources, which is not dependable source of quality PL. To make available of stress and key disease free high health PL to the small farmers, Improved & Bio-secured nursery could be a solution. In Bangladesh, SAFETI project is continuing its work in SAFETI working area with interested and capable nursery owners to ensure the production of stress & specific disease-free high health post larvae (HH PL) and their delivery to the small farmers in remote areas who are practicing their shrimp culture in a bio-secured way.

বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ, দেশজ মোট মৎস্য উৎপাদন, হিমায়িত মৎস্য জাতীয় পণ্যের রপ্তানি এবং সর্বোপরি চিংড়ি চাষ সংশ্লিষ্ট প্রায় দশ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। আমাদের দেশের শ্রিম্প ভ্যালু চেইন (shrimp value chain), হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন, চিংড়ি পোনা বিপণনকারী, নার্সারি, খামার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, রপ্তানিকারক এবং এর পাশাপাশি হ্যাচারি-নার্সারি এবং খামারে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহকারীরা জড়িত। এই পুরো শ্রিম্প ভ্যালু চেইনে হ্যাচারিতে চিংড়ির পোনা উৎপাদন এবং পরবর্তীতে চিংড়ি চাষ অঞ্চলে নার্সারিতে পিএল (PL) নার্সিং করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চিংড়ি খামারগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভ্যালো মানের পীড়ন ও রোগমুক্ত চিংড়ি পিএল এবং এর পর্যাপ্ত সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল।

চিংড়ি চাষ অঞ্চল খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকেরা তাদের চিংড়ি খামারগুলোর জন্য খুব অল্পসংখ্যক পিএল প্রয়োজন হয় এবং এক্ষেত্রে তারা স্থানীয় চিংড়ি ব্যবসায়ী অথবা খামারের কাছাকাছি কোনো প্রচলিত নার্সারি (conventional shrimp nursery) থেকে সংগ্রহ করে থাকেন এবং এক্ষেত্রে চিংড়ি পিএল-এর গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না এবং প্রায় সময়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আধুনিক বিশ্বের চিংড়ি চাষ পদ্ধতি অনুযায়ী, পুকুরে চিংড়ি পিএল অবমুক্ত করার আগে সেগুলোকে উন্নত ও জৈব-নিরাপদ নার্সারিতে ১০-১৫ দিনের হাই হেল্‌থ (high health- HH) চিংড়ি পিএল প্রায় ৭-৩০ দিন পর্যন্ত নার্সিং করা অত্যাবশ্যক। এ কাজের ফলে নার্সারি থেকে কৃষকদেরকে বয়সে বড়, পীড়ন ও রোগমুক্ত উচ্চ-স্বাস্থ্যের (HH) চিংড়ি পিএল সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশে 'সেফটি প্রকল্প'-এর কর্মএলাকায় মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ক্ষুদ্র চিংড়ি চাষিদেরকে পীড়ন ও রোগমুক্ত সুস্থ-সবল উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল সরবরাহ নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার উৎসাহী এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নার্সারি মালিকদের সাথে জৈব-নিরাপদ (bio-secured) উপায়ে, পীড়ন ও রোগমুক্ত উচ্চ-স্বাস্থ্যের চিংড়ি পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের এসপিএফ বাগদা হ্যাচারির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief history of the SPF bagda hatchery in Bangladesh)

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিক থেকে বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ির পিএল (পোস্ট লার্ভি) উৎপাদনে নিয়োজিত হ্যাচারির সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও চিংড়ি চাষিদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পীড়ন ও রোগমুক্ত স্বাস্থ্যকর পিএল উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে এখনো বড় ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি পোনা উৎপাদনে নিয়োজিত ৫২টি হ্যাচারির মধ্যে ৩টি হ্যাচারি বঙ্গোপসাগর হতে আহরিত মাদার চিংড়ি বা ব্রুড ব্যবহারের পরিবর্তে ডমিস্টিকেটেড এসপিএফ (স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রি) মাদার চিংড়ি বা ব্রুড ব্যবহার করে উচ্চ-স্বাস্থ্যের বাগদা চিংড়ি পিএল উৎপাদনে নিয়োজিত আছে। এ ৩টি হ্যাচারি হলো কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত (১) এমকেএ হ্যাচারি (২) ফিসটেক হ্যাচারি লিমিটেড (FishTech Hatchery Ltd.) এবং (৩) খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় অবস্থিত দেশ-বাংলা এসপিএফ হ্যাচারি (Desh-Bangla SPF hatchery)।

এমকেএ হ্যাচারি প্রচলিত পোনা উৎপাদনের জন্য (বঙ্গোপসাগরের মাদার চিংড়ি ব্যবহার করে) ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১৩ সালে ডমিস্টিকেটেড এসপিএফ মাদার চিংড়ি/ব্রুড (SPF brood) ব্যবহার করে উচ্চ- স্বাস্থ্যের পিএল (HH PL) উৎপাদনের জন্য হ্যাচারির অবকাঠামো পরিবর্তন করে হ্যাচারিটি ২০১৪ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর যথাক্রমে ২, ৩০, ১৫০, ১৮০, ১৫০, ২৭০ এবং ৩৩৬.৪ মিলিয়ন উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল উৎপাদন করতে সক্ষম

হয়। এমকেএ হ্যাচারি যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ে অবস্থিত মোয়ানা টেকনোলোজিস হতে মাদার চিংড়ি/ব্রুড, কিশোর চিংড়ি এবং পিপিএল (Parent PL) আমদানি করে থাকে।

দেশ-বাংলা এসপিএফ হ্যাচারি ২০১৭ সালে ডমিস্টিকেটেড এসপিএফ মাদার চিংড়ি/ব্রুড ব্যবহার করে উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণ নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালে যথাক্রমে ২৫, ৭৮ ও ৪৬.২ মিলিয়ন পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। দেশ-বাংলা এসপিএফ হ্যাচারি থাইল্যান্ডের চারোয়ান পোকফ্যান্ড ফুডস (Charoen Pokphand Foods- CPF) কোম্পানি হতে পূর্ণবয়স্ক ব্রুডস্টক আমদানি করে থাকে।

ফিসটেক হ্যাচারি লিমিটেড ২০২০ সালে উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল উৎপাদন শুরু করে এবং ঐ বছর ৭৯.৪২ মিলিয়ন পোনা উৎপাদনে সক্ষম হয়। ফিসটেক হ্যাচারিও থাইল্যান্ডের চারোয়ান পোকফ্যান্ড ফুডস কোম্পানি হতে পূর্ণবয়স্ক ব্রুডস্টক আমদানি করে থাকে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসপিএফ হ্যাচারিগুলোর উৎপাদন (Production of SPF hatcheries in recent years)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (২০১৪-২০২০) বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি হ্যাচারিগুলোর মোট বার্ষিক পিএল উৎপাদন ৮০০-১৩০০০ মিলিয়ন; যেখানে উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল-এর উৎপাদন মোট উৎপাদনের মাত্র ০.০২-৬.৬ শতাংশ নিম্নবর্ণিত সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি: বাংলাদেশের হ্যাচারিগুলোর ২০১৪ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক পিএল উৎপাদনের চিত্র (২০১৪-২০১৬ মৎস্য অধিদপ্তরের এবং ২০১৭ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত সেফটি'র তথ্য)

উৎপাদন বছর	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মোট পোনা উৎপাদন (মিলিয়ন)	১১৫৮৮	১২৪৪০	১৩১৪২	১৩৮৩০.৪	১৪১২০.৪	৯৭১৩.৭	৭৯২৯.৫
উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল উৎপাদন (মিলিয়ন)	২	৩০	১৫০	১৮০	১৭৫	৭৯৮.৫	৪০১
উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল, মোট পিএলের শতাংশ হিসেবে (%)	০.০২%	০.২৪%	১.১৪%	১.৩%	১.২%	৬.৬%	৫.০%

সারণি লক্ষ্য করলে এটি স্পষ্ট যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসপিএফ হ্যাচারিগুলো কৃষকদের চাহিদা মেটাতে ক্রমবর্ধমান উচ্চ স্বাস্থ্যের পিএল উৎপাদন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মোট ৭৯৮.৫ মিলিয়ন হাই-হেলথ পোনা উৎপাদিত হয়েছিল। এমকেএ হ্যাচারি এবং দেশ-বাংলা হ্যাচারি দুটি মিলে মোট ৩৪৮ মিলিয়ন পোনা এবং বাকি ৪৫০.৫ মিলিয়ন পোনা অন্যান্য ৭টি প্রচলিত হ্যাচারি উৎপাদন করেছিল (এমকেএ হ্যাচারির নপ্লি ব্যবহার করে)।

সম্ভাবনাময় এ খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার হ্যাচারিগুলোকে প্রচলিত প্রাকৃতিক মাদার চিংড়ি/ব্রুড ব্যবহার না করে ডমিস্টিকেটেড এসপিএফ মাদার চিংড়ি/ব্রুড ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করে যাচ্ছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বেসরকারিভাবে ২০টি এসপিএফ হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি বছর ৩০০ মিলিয়ন উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল-এর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে[১]। সেফটি প্রকল্প এ লক্ষ্য পূরণের সহায়তা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নত ও জৈব-নিরাপদ বাগদা চিংড়ি নার্সারি উন্নয়নে সেফটি প্রকল্পের উদ্যোগ (Initiative of SAFETI Project for development of improved and bio-Secure bagda shrimp nursery)

বাংলাদেশের বেশির ভাগ চিংড়ি খামার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। কক্সবাজারে উৎপাদিত প্রায় ৯০ শতাংশ পোনা কার্গো বিমানের মাধ্যমে কক্সবাজার-যশোর বিমানবন্দর হয়ে সাতক্ষীরা পোনা-বাজারে পরিবহণ করা হয়। হ্যাচারিতে প্যাকিং থেকে খামারে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রায় ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ পরিবহনের সময় আরও দীর্ঘ হয়। কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত এই দীর্ঘ পরিবহণ সময়ের কারণে পোনাগুলোতে সহজেই পীড়নের সৃষ্টি হয় এবং এই পিএলগুলো সরাসরি পুকুরে অবমুক্ত করা হলে পরিবহণ ও মজুদকালীন পীড়নের কারণে দূর্বল হয়ে চিংড়ির বৃদ্ধি ধীর গতি হতে পারে; রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হতে পারে এবং বেঁচে থাকার হার কমে যেতে পারে। সর্বোপরি পুকুরের উৎপাদনশীলতা অনেক কমে যেতে পারে। তাই মজুদের আগে উন্নত কারিগরি ব্যবস্থাপনায় জৈব-নিরাপদ উপায়ে উচ্চ-স্বাস্থ্য পিএল স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ৩ থেকে ৭ দিনের নার্সিং করে নিলে শারীরিক পীড়ন থেকে মুক্তি পাবে ফলে চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এ নার্সারি ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষিরা সহজেই তাদের প্রয়োজন মাফিক উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল যেকোনো সময়ে সংগ্রহ করতে পারবে।

সম্প্রতি মানসম্পন্ন নার্সিং করা রোগ ও পীড়নমুক্ত উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় সেফটি প্রকল্পের প্রত্যক্ষ কারিগরি সহযোগিতায় বেশ কিছু জৈব-নিরাপদ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন বাগদা চিংড়ির নার্সারি গড়ে উঠেছে এবং ২০২০ সাল থেকে উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল-এর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। চাষিরা এ নার্সিং পিএলগুলোর জন্য উচ্চমূল্য দিতে আগ্রহী। কারণ তারা পুকুরে হ্যাচারি থেকে সরাসরি আসা পিএল মজুদ-এর তুলনায় স্থানীয় জৈব-নিরাপদ নার্সারি হতে রোগ ও পীড়নমুক্ত উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল মজুদ করে উচ্চতর বেঁচে থাকার হার এবং অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে পেরেছে।

১. *Draft National Action Plan for Sustainable Shrimp Sector Growth in Bangladesh, 14 February 2018. Developed by DoF with support from Solidaridad Network Asia and Bangladesh, Bangladesh Shrimp & Fish Foundation.*

সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার বাগদা চিংড়ি চাষ উপযোগী উপজেলাগুলোতে আনুমানিক ৪০০-৫০০টি বাগদা চিংড়ি নার্সারি অপারেটর রয়েছে। সেফটি প্রকল্পের কারিগরি সহযোগিতায় ২০১৯ সালে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটায়, 'কাজী শ্রিম্প পিএল নার্সারি'-এর সাথে যৌথভাবে উন্নত বায়োসিকিউরিটি, পানি প্রস্তুতি এবং উন্নত নার্সারি ব্যবস্থাপনায়, উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল-এর একটি পরীক্ষামূলক নার্সিং (Trial PL nursing) পরিচালিত হয়।

এক্ষেত্রে সেফটি প্রকল্পের অংশীদার ওয়ার্ল্ডফিস, নার্সারিতে পিএল মজুদের পূর্বে এবং নার্সারি হতে সরবরাহের পূর্বে প্রয়োজনীয় রোগের পরীক্ষা সম্পন্ন করে এবং এতে কোনো ধরনের সংক্রমণ পাওয়া যায়নি। 'পরীক্ষামূলক নার্সিং'-এর সাফল্যের ভিত্তিতে 'কাজী চিংড়ি পিএল নার্সারি'-এর মালিক তাঁর নার্সারির নাম পরিবর্তন করে 'কাজী এসপিএফ নার্সিং পয়েন্ট' নামকরণ করেন এবং ঐ নার্সারি হতে ২০২০ ও ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত যথাক্রমে ১৩.৯ ও ৯.০ মিলিয়ন নার্সিং করা উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল স্থানীয় চিংড়ি চাষিদের মধ্যে বিক্রয় করেছেন। সেফটি প্রকল্প কর্তৃক যৌথভাবে জৈব-নিরাপদ ও উন্নত ব্যবস্থাপনায় নার্সারি পরিচালনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল অন্যান্য দেশে সফলভাবে ব্যবহৃত গুড অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস (GAP) পদ্ধতি বাংলাদেশের নার্সারিগুলোতে প্রবর্তন করা।

চিত্র: কাজী এসপিএফ নার্সারিতে [illegible]

সেফটি প্রকল্প খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় ২০২০ সালের প্রথমদিকে মোট ৭৫ জন এবং ডিসেম্বর মাসে ৫০ জন নার্সারি মালিক ও টেকনিশিয়ানদের জন্য 'বায়োসিকিউর নার্সারি অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ের ওপর দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রশিক্ষণের পর সেফটি-প্রকল্প আগ্রহী এবং বায়োসিকিউর নার্সারি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ৫টি নার্সারির সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে বাছাইকৃত সাধারণ নার্সারিগুলোকে অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল উৎপাদন-কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষণ

চিত্র: বাদাবন হ্যাচারি অ্যান্ড নার্সারিতে পোনা মজুদের প্রস্তুতি

প্রদানের মাধ্যমে জৈব-নিরাপদ উপায়ে পীড়নমুক্ত এবং রোগজীবাণুমুক্ত উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল উৎপাদনে সক্ষমতা লাভ করতে পারে।

২০২০-২১ সালে নির্বাচিত ৫টি নার্সারির ৪টি সেফটি প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তায় প্রচলিত সাধারণ নার্সারি হতে জৈব-নিরাপদ নার্সারিতে রূপান্তরকরণ শেষ করেছে এবং বাগেরহাট জেলার মংলায় অবস্থিত 'বাদাবন হ্যাচারি অ্যান্ড নার্সিং পয়েন্ট' এবং সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনী উপজেলায় অবস্থিত 'জয় নার্সিং পয়েন্ট' ২০২১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত যথাক্রমে ৭.০ ও ১.৬ মিলিয়ন নার্সিং করা উচ্চ-স্বাস্থ্যের পিএল স্থানীয় ক্ষুদ্র চিংড়ি চাষিদের মধ্যে বিতরণ/বিক্রি করেছে। সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত অন্য দুটি নার্সারি (মায়ের আশীর্বাদ নার্সিং পয়েন্ট ও স্বদেশ হ্যাচারি অ্যান্ড নার্সারি) মে ২০২১ এর মাঝামাঝি সময়ে পোনা নার্সিং করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যবান চিংড়ির পিএল উৎপাদনের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এর স্থায়িত্বশীল চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য সেফটি প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর ও দেশের বেসরকারি চিংড়ি হ্যাচারি ও নার্সারি মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দেশীয় চাহিদা পূরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের চিংড়ি চাষের অবস্থানকে সুসংহত করতে বায়োসিকিউরড নার্সারিতে স্বাস্থ্যকর পিএল উৎপাদনের গুরুত্ব অনুধাবন করেই সেফটি প্রকল্প সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত। এই প্রতীতি সময়োচিত কার্যকর উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টাকে আরও সুদৃঢ় করবে।

Shrimp Hatchery and Maturation Specialist & District Manager, Winrock International -SAFETI, Project (Email: aung.kyaw@winrock.org)

মাছসহ সকল জলজ প্রাণীতে অ্যান্টিবায়োটিকের দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ ব্যবহার

Responsible and Prudent Use of Antimicrobial Agents in Fishes including other Aquatic Animals

সুজিত কুমার চাটার্জী[১] ও মুহাঃ নওশের আলী[২]

Abstract

Aquaculture production in Bangladesh is increasing tremendously. To meet the demand of growing population, aquaculture is to be intensified more that ultimately increasing the susceptibility of disease infection and also increasing the risks of economic loss to the fish farmers. To combat fish diseases, various types of aqua products need to use in order to run a profitable aquaculture establishment. Prudent and responsible use of these aqua products will ensure the environment health, fish and other aquatic animal health, and ultimately our human health. Aqua products production, importation, distribution, prescription by the aquatic health professionals and use by the farmers need to be monitored by the competent authorities to ensure fish or other aquatic animal health as well as human health by saving the farmers from economic loss. AMR in aquaculture is a growing health concerns caused mainly by the imprudent use of antibiotics that ultimately makes it difficult to control or prevent fish diseases due to limited choice of antimicrobials against AMR pathogens. Therefore, AMR needs to be focused on embedding in one health approach to prevent the emergence and spread of AMR pathogens. Every entity involved with aquatic animal health activities should play an important role in this perspective.

সংক্রামক রোগের জীবাণুসমূহ বিবিধ কারণে মানুষ, মাছ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর রোগসমূহের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের প্রতি রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের অপব্যবহার এবং অতিরিক্ত ব্যবহার এই প্রক্রিয়াটিকে আরও ত্বরান্বিত করছে। এ ঔষধসমূহের ভুল প্রেসক্রিপশন করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসক্রিপশন করা, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু শনাক্ত না করেই প্রেসক্রিপশন করা এবং চিকিৎসার কোর্সগুলো যথাযথভাবে সম্পূর্ণ না করা ইত্যাদি এ রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধিতে বেশি ভূমিকা রাখছে। এ পরিস্থিতিতে মানুষ, মাছ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া যায় না; যা এসব প্রাণীর মৃত্যুসহ অন্যান্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অর্থের অপচয়ও হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মতে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের কারণে বিশ্বব্যাপী বছরে প্রায় সাত লক্ষ মানুষ মারা যায়। মৎস্যচাষ ও পশুপালনে নিযুক্ত ব্যক্তি ও উদ্যোক্তাগণের এ কারণে রোগ নিয়ন্ত্রণে বিপুল অর্থের অপচয় ঘটে এবং অনেকে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। কারণ যেসব রোগজীবাণু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের ওপর প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে তা আর ঐসব ঔষধে কাজে আসে না। তাছাড়াও রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের রেসিডিউ থাকা মাছ কিংবা অন্য সব প্রাণীর মাংস গ্রহণও নানাবিধ জটিল রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নভেম্বর ২০১৭ সালে অক্সফোর্ড মার্টিন স্কুলের সিনিয়র গবেষক এবং Our World in Data এর প্রধান ড. হান্না রিচে'র প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বৈশ্বিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ৭০-৮০% এর মতো প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহার করা হয়। তবে স্থলভাগের অন্যান্য প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের চিকিৎসার তুলনায় মৎস্য স্বাস্থ্য চিকিৎসায় খুব সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় এবং বাংলাদেশে মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় আইনানুগভাবে টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন (নির্দিষ্ট মাত্রায় উইথড্রয়াল পিরিয়ড এর প্রতিপালনপূর্বক) ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অনুমতি নেই। পরিতাপের বিষয় হলো, মানব স্বাস্থ্য, প্রাণী চিকিৎসা কিংবা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এ ঔষধসমূহ কোনো না কোনোভাবে পানিতে গিয়ে পড়ে; যা মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মোকাবেলা করা তথা এ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। মাছচাষে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স কমাতে এ সেক্টরের সাথে যুক্ত অংশীজনসহ প্রত্যেকের বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে যা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দায়িত্বশীল এবং বিচক্ষণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যসমূহ (Purpose of responsible and prudent use)

- প্রাণী এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের উপযোগিতা ও নিরাপদতা যাচাই এবং এসব ঔষধের দায়িত্বশীল, বিচক্ষণ ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- জলজ প্রাণীর সুস্বাস্থ্যের জন্য নৈতিক বাধ্যবাধকতা (ethical obligation) এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেনে চলা;
- জলজ প্রাণী থেকে মানুষ এবং স্থলজ প্রাণীতে রেজিস্ট্যান্স নির্ধারকসহ রেজিস্ট্যান্স অণুজীব-এর স্থানান্তর প্রতিরোধ বা হ্রাস;
- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অবশিষ্টাংশগুলো প্রতিরোধ করা যা খাবারে সংঘটিত সর্বোচ্চ সীমাবদ্ধতার সীমা (Maximum Residue Limit-MRL) অতিক্রম করে।

মাছসহ সকল জলজ প্রাণীতে ব্যবহার্য সকল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধসমূহের দায়িত্বশীল এবং বিচক্ষণ ব্যবহার মানুষ ও প্রাণী উভয়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও এ সম্পর্কিত অংশীজনের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করা হলো:

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব (Responsibilities of Competent Authority)

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পণ্যের বিপণন অনুমোদনের জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পণ্য অনুমোদনের শর্তাদি নির্দিষ্টকরণ এবং মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য

পেশাদারকে পণ্য লেবেলিংয়ের মাধ্যমে এবং / বা অন্য উপায়ে, সহযোগিতা করার নিমিত্ত জলজ প্রাণীর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পণ্যের বিচক্ষণ ব্যবহারে সঠিক তথ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পণ্যসমূহের ব্যবহার মূল্যায়নের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি করার জন্য হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করাও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। প্রয়োজনে প্রাণী ও জনস্বাস্থ্য পেশাদারদের সহযোগিতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সামগ্রিক কৌশল হিসাবে, মাছ ও জলজ প্রাণীর জন্য ব্যবহার্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পণ্যের বিচক্ষণ ব্যবহার সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণা জন্য একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

একটি বিস্তৃত কৌশলের উপাদানগুলোর মধ্যে থাকবে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন, ভ্যাকসিন নীতি এবং খামার পর্যায়ে মৎস্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য পেশাদারের পরামর্শ গ্রহণ, আর এগুলির সবই মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর রোগের প্রকোপ এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল চিকিৎসার প্রয়োজন হ্রাসে অবদান রাখবে। গুণমানসম্পন্ন, কার্যকরী এবং নিরাপদ মানদন্ডগুলি পূরণ করা হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে দ্রুততার সাথে বিপণনের অনুমোদন দেয়া যুক্তিযুক্ত।

বিপণন অনুমোদনের আবেদন পরীক্ষার মধ্যে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধ ব্যবহারের ফলে প্রাণী, মানুষ এবং পরিবেশের জন্য ঝুঁকির একটি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা, মূল্যায়নের সময় প্রতিটি পৃথক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের উপর গুরুত্বারোপ করা এবং নির্দিষ্ট সক্রিয় পদার্থের (active ingredient) সাথে সম্পর্কিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের শ্রেণি বিবেচনা করার দায়িত্ব বর্তায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ওপর। নিরাপদতা মূল্যায়নের মধ্যে মাছ ও জলজ প্রাণীতে অ্যান্টিমাইক্রোবাইল ঔষধ প্রয়োগের প্রভাবসহ প্রাপ্ত জীবাণুর সম্ভাব্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স অর্জনের কারণে প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের ওপরে কী প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো, পরিবেশের ওপর এর প্রস্তাবিত ব্যবহারে কী প্রভাব পড়ে তারও একটি মূল্যায়ন করা।

প্রাসঙ্গিক আইন এবং বিপণনের অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ব্যতিত মৎস্যচাষে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের ব্যবহার না করা এবং মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নোট ব্যতিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানোও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য পেশাদারদের নিকট নজরদারি কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের প্রবণতা সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা এবং সংবেদনশীলতা পরীক্ষাগারগুলির কার্যকারিতাও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। অব্যবহৃত বা মেয়াদোত্তীর্ণ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষুধের নিরাপদ সংগ্রহ এবং ধ্বংসের কার্যকর প্রক্রিয়া সরবরাহের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং অংশীদারদের সম্মিলিত কার্যক্রম ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে।

মৎস্যচাষের ঔষধ প্রস্তুত সম্পর্কিত ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের দায়িত্বসমূহ (Responsibilities of Pharmaceutical Industries involved aquamedicines)

মৎস্যচাষের ঔষধ প্রস্তুত সম্পর্কিত ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের দায়িত্ব হচ্ছে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধসমূহের গুণমান, কার্যকারিতা এবং নিরাপদতা সম্পর্কিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা। তাছাড়াও এসব দ্রব্যসমূহ উৎপাদন, বিক্রয়, আমদানি, লেবেলিং, বিজ্ঞাপন এবং ফার্মাকোভিজিলেন্সসহ বিপণন পূর্ব ও পরবর্তী পর্যায়গুলি দেখভাল করার দায়িত্বও এ ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ওপর বর্তায়। এ শিল্পের দায়িত্বের মধ্যে আরও রয়েছে যে, বিভিন্ন কাজে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিপণনকৃত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধসমূহের পরিমাণ ও অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা। এ শিল্পসমূহকে মৎস্যচাষি/উৎপাদকের কাছে সরাসরি এ ঔষধসমূহের বিক্রয় সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা চালানো উচিৎ নয়।

পাইকারি ও খুচরা বিতরণকারীদের দায়িত্বসমূহ (Responsibilities of Wholesale and Retail Distributors)

বিতরণকারীদের অবশ্যই সকল কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। বিতরণকারীদের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধসমূহের যথাযথ ব্যবহার এবং বিলি-বন্দোবস্ত যেন প্রস্তুতকারকের বিতরণকৃত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক পেশাদারদের দায়িত্বসমূহ (Responsibilities of Fish and other Aquatic Animal Health Professionals)

মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক পেশাদারদের দায়িত্ব হলো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধসমূহের ব্যবহার সীমিতকরণে উত্তম মৎস্যচাষ চর্চা অনুসরণ, জৈব নিরাপত্তা জোরদারকরণ, হাইজিন সেনিটেশন প্রতিপালন, ভ্যাকসিন ব্যবহার কিংবা অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করা এবং মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং সে মোতাবেক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ। কেবলমাত্র মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুমোদিত পেশাদারগণই মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তার নিবিড় তত্ত্বাবধানে রোগটির চিকিৎসায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের একটি নির্দিষ্ট কোর্স নির্ধারণকরতঃ সে মোতাবেক চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন।

তাঁদের আরও দায়িত্ব হলো রোগটির চিকিৎসায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের একটি নির্দিষ্ট কোর্স নির্ধারণের পূর্বে মাছ বা মাছগুলির ক্লিনিকাল পরীক্ষা, ময়না তদন্ত পরীক্ষা এবং সংবেদনশীলতা ও কালচারসহ ব্যাকটিরিওলজি ও অন্যান্য ল্যাবরেটরী পরীক্ষাসহ সম্ভবত সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ে একটি সম্পূর্ণ ক্লিনিকাল অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করা। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের একটি নির্দিষ্ট কোর্স নির্ধারণের পূর্বে তাঁকে পানির গুণাগুণসহ পরিবেশগত ও উৎপাদন সম্পর্কিত অন্যান্য নির্ধারকসমূহ যা রোগ সংক্রমণের জন্য প্রাথমিক কারণ হিসেবে দায়ী তা যথাযথভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের সাথে

থেরাপিউটিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় তবে এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করা উচিত। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধ নির্বাচন তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে হওয়া উচিত।

যত দ্রুত সম্ভব অণুজীবের সংবেদনশীলতা (Antimicrobial Sensitivity Test-AST) পরীক্ষা পরবর্তী চিকিৎসার পছন্দক্রম নির্ধারণ করতে হবে। অণুজীবের সংবেদনশীলতা (Antimicrobial Sensitivity Test-AST) পরীক্ষার ফল অবশ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তা সংরক্ষণের জন্য প্রদান করতে হবে। অনুমোদিত পেশাদারদের ঔষধের ব্যবহার মাত্রা, চিকিৎসার ব্যবধান ও সময়কালসহ প্রত্যাহারের সময়কাল এবং ব্যবহার্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধের পরিমাণ এবং কতটি মাছে/জলজ প্রাণীতে ব্যবহার করা যাবে ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে মৎস্যচাষি/উৎপাদককে নির্দেশনা দিতে হবে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধসমূহের ব্যবহারের সাথে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিসমূহ মোতাবেক অতিরিক্ত লেবেল/অফ-লেবেল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষধসমূহের ব্যবহার সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি প্রাসঙ্গিক আইন অনুসারে রাখতে হবে। খামারে অনুমোদিত পেশাদারদের নির্দেশ/পরামর্শ মোতাবেক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধ ব্যবহার হচ্ছে কি-না এবং এবং ঔষধসমূহের কার্যকারিতা নিরূপণে মাঝে মাঝে রেকর্ডগুলি পর্যালোচনা করা উচিত।

মৎস্যচাষি/উৎপাদনকারীগণের দায়িত্বসমূহ (Responsibilities of Fish Farmers/Producers)

মৎস্যচাষি/উৎপাদনকারীগণকে তাদের খামারে মাছের স্বাস্থ্য এবং খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা ও প্রোগ্রাম গ্রহণ করা উচিত। মাছের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে কৌশলগত চাষ বিষয়ক পর্যাপ্ত পরিকল্পনা, বায়োসিকিউরিটি প্রোগ্রাম, উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি, ভ্যাকসিন, পানির মান রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তাদেরকে মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুমোদিত পেশাদারদের পরামর্শ নোট মোতাবেক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধ ব্যবহার করা উচিত এবং তাঁদের নির্দেশিত ব্যবহার মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং প্রত্যাহারের সময়কাল অনুসরণ করা উচিৎ। রোগজীবাণু নির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ, রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাটাস জানার পর তাদেরকে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নোট মোতাবেক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিৎ তবে কোনমতে জলাশয়ের পানিতে সরাসরি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ না করে মৎস্য খাদ্যের সাথে প্রয়োগ করতে হবে এবং দুই বা ততোধিক অ্যান্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণ প্রয়োগ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। মৎস্যচাষি/উৎপাদনকারীগণকে সরাসরি অ্যান্টিবায়োটিক জলাশয়ের পানিতে না প্রয়োগ এবং তাদেরকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, হ্যান্ডেল করা এবং ব্যবহার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (Steps taken by the Department of Fisheries Bangladesh to Prevent Antimicrobial Resistance)

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে মৎস্যচাষি/মৎস্য উৎপাদনকারীগণকে নিরুৎসাহিত করে। 'মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০', 'মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১', 'মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০' ও 'মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১' এ সময়ের প্রত্যাহার কাল অনুসরণপূর্বক গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন ছাড়া অন্য কোন অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল সাবস্ট্যান্স ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়নি। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে মানুষ ও মৎস্যসহ সকল জলজ জীবের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা এ সংস্থাটি সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা, হ্যাচারি মালিক এবং খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত মালিক, ব্যবসায়ী ও বিক্রয় প্রতিনিধিগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মৎস্য অধিদপ্তর ২০১২ সাল হতে National Residue Control Plan (NRCP) এর মাধ্যমে ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং মৎস্য খাদ্য ও খাদ্য উপকরণে অন্যান্য মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ও রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষণের পাশাপাশি টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, মেট্রোনিডাজল, নাইট্রোফিউরান মেটাবোলাইটস, অ্যামোক্সিসিলিন, জেন্টামাইসিন ও টাইলোসিন অ্যান্টিবায়োটিকের রেসিডিউ সফলভাবে পরীক্ষাপূর্বক সুনামের সাথে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বিদেশে রপ্তানির ধারা অব্যাহত রেখেছে।

উপসংহার (Conclusion)

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, মৎস্যচাষের ঔষধ প্রস্তুত সম্পর্কিত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিসমূহ, পাইকারি ও খুচরা বিতরণকারী, মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক পেশাদারগণ, মৎস্যচাষি/মৎস্য উৎপাদনকারীগণ এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনসাধারণের এ বিষয়ে যথাযথ দায়িত্বপালন ও সচেতনতাই পারে অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল রেজিস্ট্যান্স নামক বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবেলা করতে। এ সমস্যার সাথে জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ তথা সকল স্টেকহোল্ডারের দায়িত্বশীল আচরণ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বিত প্রচেষ্টা মানব সম্প্রদায়, পরিবেশ এবং মৎস্যসহ সকল জলজ ও স্থলজ প্রাণী স্বাস্থ্যের হুমকি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে – এটাই সবার কাম্য।

---

[১]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর (ইমেইল: sujit_llac24@yahoo.com)
[২]সহকারী পরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশে সী-উইড হতে জৈব-উপাদানের আহরণ সম্ভাবনা এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার

Extraction Potentials and Commercial Utilization of Bio-materials from Seaweeds of Bangladesh

ড. মোঃ মহিবুল্লাহ[১], ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া[২] ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আবছার খান[৩]

Abstract

The post-harvest utilization of seaweeds from the coast of the Bay of Bengal (BoB) has been demarcated as a new economic window to potentially explore the blue-economy in Bangladesh. Valorization and commercialization of these under-explored seaweed resources are extremely rudimentary in practice. The present search is to identify the commercial seaweeds in BoB based on previously published literature and gives an overview of potentially exploitable bio-materials from seaweeds to be used in the food and pharmaceutical industries in Bangladesh. From a nutritional perspective, seaweeds contain all necessary health components such as protein, lipid, carbohydrates, dietary fiber, minerals, etc. at a premium level than those of terrestrial plants. It is emphasized that adding seaweed extract or powder, or its bioactive materials, to food products such as processed fish and meat, bakery, and other products can improve the physico-chemical, textural, and nutritional properties. Since seaweed contains a diverse range of bioactive compounds, all lifestyle-related diseases, particularly cancer, diabetes, obesity, neurodegenerative complications and other health difficulties can be alleviated when such bio-materials act as alternative medicine are highlighted in this article. Therefore, seaweed can be considered a useful functional material in any technological development, from value-added food products to pharmaceuticals in Bangladesh.

সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ, যেখানে আমাদের জানা ও অজানা অসংখ্য জীবের বসবাস। সামুদ্রিক জলরাশিতে সী-উইডের উপস্থিতি এর গুরুত্বকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। সী-উইড সামুদ্রিক পরিবেশে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী যৌগ উপাদান তৈরি করে, যা তাদের শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এই যৌগ উপাদানের কাঠামোগত বৈচিত্র্যতা ও কার্যকারিতা, বিশেষ করে পুষ্টিগত ও ঔষধিগুণে অনন্য। সী-উইড সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে মধ্যবর্তী বিভিন্ন উপকরী যৌগ উপাদান সমুন্নত রাখা যায় এবং প্রচলিত খাদ্য ও ঔষধ উৎপাদনে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। বিভিন্ন দেশে সক্রিয় খাদ্য (functional food) হিসেবে সী-উইডের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, ভিয়েতনাম অন্যতম। সক্রিয় খাদ্য বা ফাংশনাল ফুড বলতে বুঝায় স্বাভাবিক পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ এমন খাবার যার মধ্যে এক বা একাধিক বিশেষ সক্রিয় যৌগ উপাদান বিদ্যমান থাকে যা শরীরে নির্দিষ্ট কোন রোগ প্রতিরোধে বা প্রশমনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফাংশনাল ফুড গ্রহণে শরীরে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না। কারণ এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উৎসজাত। তাই ফাংশনাল গুণসম্পন্ন বিভিন্ন সী-উইডকে কিভাবে খাদ্য ও ঔষধ পণ্য তৈরিতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় সে লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী নতুন নতুন গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল দ্বারা সী-উইডের নানাবিধ প্রায়োগিক জ্ঞানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী সী-উইডের বাজারের আকার ছিল ৪ হাজার ৯৮ মিলিয়ন ডলার এবং তা ২০২৪ সালের মধ্যে ৯ হাজার ৭৬ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে, যেখানে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ১২% হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সবুজ, লাল এবং বাদামী সী-উইড এশীয় দেশগুলিতে মোট সী-উইড গ্রহণের যথাক্রমে ৫%, ৬৬.৫% এবং ৩৩% অবদান রাখে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ১০ গ্রাম সী-উইড গ্রহণে ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফাইবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব, যা দেহ গঠনে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অন্যতম ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশে, বিশেষত খাদ্য ও ওষুধ শিল্পে সী-উইডের ব্যবহার এখনো গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। এই নিবন্ধটি হলো সী-উইডের উচ্চ পুষ্টিগুণ এবং তা হতে উৎপন্ন স্বাস্থ্যকর-সক্রিয় যৌগ উপাদানগুলো কিভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহার করা যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন এবং সুপারিশ, যা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে সী-উইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

সী-উইড এবং এর প্রকারভেদ (Seaweed and its types)

সী-উইড বলতে ম্যাক্রোএলগি বুঝায় যা ম্যাক্রোস্কোপিক এবং একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত; সত্যিকারের শিকড়, কাণ্ড ও পাতাবিহীন অতি আদিম প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ। সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত শক্ত কোন অবলম্বনকে হোল্ডফাস্ট প্রত্যঙ্গ দ্বারা আঁকড়ে ধরে থাকে এবং সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সী-উইডকে শ্রেণিগতভাবে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ক্লোরোফাইটা (সবুজ), রোডোফাইটা (লাল) ও ফাইওফাইটা (বাদামী)।

চিত্র: লাল, বাদামি ও সবুজ সী-উইড

বটম ক্লিন রেসওয়ে : আধুনিক মাছ চাষে নব দিগন্তের সূচনা

Bottom Clean Raceway : A New Horizon of Modern Fish Farming

জয়দেব পাল

Abstract

As a result of technological advancement, fish production has been moving ahead through a continuous revolutionary changes. Bottom Clean Raceway Technology has become a high definition technology for both fish and shrimp culture that facilitates high stocking density followed by a successive removal of sludge from pond bottom. It ensures the production of safe organic fish and shrimp by lowering the overall costs involved in a production cycle. The bottom clean raceway method has the potential to increase fish production ten to twenty times more than that of traditional culture. Through this technology, a maximum of 300 tonnes of fish is possible to produce from a 100 decimal waterbody. Expanding Bottom Clean Raceway Technology notify a bigger success in fish farming in the country.

বর্তমান বিশ্বের সময় হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মৎস্য উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে কৃষিশিল্প হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাযুক্ত (এআই) প্রযুক্তির পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে, অল্প খরচে বেশি উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে সবাই। বিশেষ করে কৃষি শিল্পে সাধিত হচ্ছে যুগান্তকারী পরিবর্তন; যা বছর পাঁচেক আগেও কল্পনা করা যেতো না, এমন প্রযুক্তির বাস্তবিক প্রয়োগ বিস্ময়করভাবে সফলতার বার্তা দিচ্ছে। প্রযুক্তির প্রভাবেই উন্নত দেশগুলোর উন্নত প্রযুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। ফলে আমাদের দেশের মফস্বলের শিক্ষিত উদ্যোগী তরুণটিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে সর্বশেষ খবর। কৃষিপ্রযুক্তি যেন প্রতিনিয়ত উদ্যোগী খামারিদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে। নতুন উদ্যোগ গ্রহণের যথেষ্ট সাহস এখন আমাদের উদ্যোক্তাদের। আর এদের সাহসের ফলেই আমাদের কৃষি সফলতা। সাম্প্রতি মাছ চাষে তরুণদের আগ্রহ দেশে নতুন রূপালি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

গত শতাব্দীর আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে হাকিম আলী নামের একটি চরিত্র সৃষ্টি করে মাছ চাষে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। নানা আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখিয়ে তাদের মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। ঠিক সেই সময় থেকে তিন যুগ পর আজ মাছ চাষে যে সাহসী উদ্যোগ ও সাফল্য দেখছি তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ (Bottom Clean Raceway Technology)

বটম ক্লিন কী: বটম অর্থ নিচ, ক্লিন অর্থ পরিষ্কার। শব্দটি যখন পুকুরে মাছ চাষের বেলায় ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় পুকুরের তলার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা। অতিরিক্ত খাবার প্রয়োগের ফলে অবশিষ্ট খাবারগুলো পচে ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি করে এবং অতি ঘনত্বে মাছ চাষ করার কারণে পুকুরের তলায় অতিরিক্ত যে মলমূত্র জমা হয়, সেই পঁচা অতিরিক্ত খাবার ও মাছের মলমূত্রকে মটরের সাহায্যে পুকুরের তলা থেকে বের করে নেয়ার পদ্ধতির নামই হচ্ছে বটম ক্লিন।

মাছ চাষের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো পানির গুণাগুণ বজায় রাখা। পানির গুণাগুণ বলতে দুটি ফ্যাক্টরকে বোঝায়। (১) পানির কেমিক্যাল ফ্যাক্টর: এবং (২) বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর। কমবেশি সবাই পানির কেমিক্যাল ফ্যাক্টর সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ পানির পিএইচ, অ্যামোনিয়া, দ্রবীভূত অক্সিজেন, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, হার্ডনেস ইত্যাদি। মূলত মাছ চাষের জন্য এ ফ্যাক্টরগুলোর কাঙ্ক্ষিত মাত্রা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। দ্বিতীয় ফ্যাক্টর হচ্ছে বায়োলজিক্যাল: পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তথা ফাইটোপ্লাঙ্কটন, জুপ্লাঙ্কটন ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট-এর প্রাচুর্য। এ দুটির সমন্বয় ঘটলে এটাকে আদর্শ পানি বা মাছের ভালো আবাসস্থল বলা যায়। এছাড়া মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে পুকুরে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এখন মাছ চাষ করতে গেলে মৎস্যচাষিরা যে সমস্যায় সচরাচর পড়ে থাকেন তা হলো পুকুরের তলদেশে মাত্রাতিরিক্ত আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট খাদ্য, চাষকৃত মাছের মল ইত্যাদি প্রতিনিয়ত জমা হতে হতে এক সময় পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। পুকুরে অ্যামোনিয়া, সালফারের মতো বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়, যা মাছের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়া এর ক্ষতিকর প্রভাবে মাছের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও এসব ক্ষতিকারক গ্যাস দূর করার জন্য বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহারের ফলে চাষের খরচ বৃদ্ধি পায়। ফলে মৎস্যচাষিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই এখন সময় হয়েছে পুকুরটাকেই এমন একটা ডিজাইনে তৈরি করা, যেখানে খুব সহজেই তলদেশে জমা হওয়া ময়লা পরিষ্কার করা যায়। বটম ক্লিন টেকনোলজি হলো এর সহজ সমাধান। খুব সহজে এবং অত্যন্ত কম খরচে এবং হাতের কাছে থাকা প্রযুক্তি দিয়েই এটি করা সম্ভব।

চিত্র: বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছ চাষে পুকুর প্রস্তুতি

আধানিবিড় চাষ ব্যবস্থাপনায় কিছু স্থানে ব্যাক্তি উদ্যোগে বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছচাষ শুরু হয়েছে, যা হতে পারে মাছচাষে নতুন বিপ্লব।

বটম ক্লিন ব্যবহারের সুবিধাসমূহ (Advantages)

- ক্ষতিকারক অ্যামোনিয়াসহ যেকোনো গ্যাস দূর হয়;
- মাটি ও পানির গুণাগুণ/পরিবেশ ভালো থাকে;
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় (দেড় থেকে দুই গুণ বেশি ঘনত্বে); এবং
- পুকুর ব্যবস্থাপনা সহজ ও পানি ব্যবস্থাপনা খরচ কম হয়।

বটম ক্লিন রেসওয়ে-এর প্রধান অংশসমূহ (Main Parts of Bottom Clean Raceway)

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত অত্যাধুনিক মাছচাষ প্রযুক্তি। বটম ক্লিন রেসওয়ে-এর প্রধান অংশসমূহ নিম্নরূপ:

- গোলাকার ট্যাংক ইউনিট;
- বটম ট্যাংক/ মৎস্য টয়লেট (বটম ক্লিন টয়লেট) ইউনিট;
- বটম অ্যারেশন সিস্টেম;
- ওয়েস্ট কালেকশন সিস্টেম;
- রেসওয়ে ইউনিট;
- ফিডিং সিস্টেম; এবং
- বিদ্যুৎ সরবরাহ/বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট।

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে ট্যাংকের গঠন ও আকার (Tank Structure & Volume of Bottom Clean Raceway)

ট্যাংক গোলাকার হলে সব থেকে ভালো ও উপযোগী। গোলাকার ট্যাংকে অ্যারেশন করলে সহজে স্রোত তৈরি হয়। এই স্রোতের মাধ্যমে মাছ থেকে তৈরি বর্জ্য বা তলানি খুব সহজে বটম ট্যাংকে জমা হয়। এখানে পুরো পুকুর উন্নতভাবে ট্যাংকে পরিণত করতে হয়। বটম ক্লিনের একটি ট্যাংক ১০০ শতাংশ বা তার বেশি হতে পারে। বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে পানিতে রেস বা স্রোত তৈরি করা হয় এবং জলাশয়ের তলানি পরিষ্কারের মাধ্যমে পানির পরিবেশ মাছের জন্য উপযোগী করা হয়।

চিত্র: বটম ক্লিন রেসওয়ে ট্যাংক ইউনিট

বটম ট্যাংক/মৎস্য টয়লেট (বটম ক্লিন টয়লেট) ইউনিট (Bottom Tank/Toilet Unit)

মাছ চাষের বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে পুকুরে মাঝ বরাবর একটি ঢালু গোলাকার আকৃতির ট্যাংক তৈরি করা প্রয়োজন যার গভীরতা ৭ ফুট এবং ব্যাসার্ধ ১৩-১৪ ফুট হলে ভালো। এই ট্যাংক থেকে পাম্পের মাধ্যমে মাছের বর্জ্য বা তলানি প্রতি তিন ঘন্টা পর পর তুলে ফেলতে হবে।

চিত্র: পুকুরে বটম ক্লিন টয়লেট (যেখানে ময়লা জমা হয়) ইউনিট

এটা খুব জটিল কোনো ডিজাইন নয়। পুকুরের তলদেশ যেনো ঢালু হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ধরা যাক, পুকুরের আয়তন ২০ শতাংশ। পুকুর তৈরি করার সময় এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ২.৫ ফুট ব্যাসার্ধ ও ৪ ফুট গভীর করে একটি গর্ত করা হয়; এর মাঝে একটি সিমেন্টের তৈরি রিং স্থাপন করা হয় এবং এর তলা কনক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হয়।

পুকুরের তলা ৪৫ ডিগ্রি ঢালু করে ড্রেসিং করে মাঝ গর্ত বরাবর মিশিয়ে দেয়া হয়; যাতে পানি পড়ার সাথে সাথে গড়িয়ে মাঝ গর্তে চলে যায়। যেহেতু মাটিতে মাছের মল আটকে থাকে তাই মাঝ গর্ত হতে ২২ ফুট দৈর্ঘ্য টেনে একটি বৃত্ত একে এর মাঝে পভলাইনার দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হয়; যাতে মাছের ময়লাগুলো খুব সহজেই পানির স্রোতে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে এসে জমা হয়।

মাঝের গর্তকে একটি লোহার গোল খাঁচা স্থাপন করা হয় এবং খাঁচার বাইরের অংশ নেট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় যাতে মাছ এর ভেতরে প্রবেশ না করতে পারে। এই খাঁচার ভেতর একটি

চিত্র: বটম ক্লিন টয়লেটে স্থাপিত লোহার খাঁচা

মাডপাম্প স্থাপন করা হয় যেন খুব সহজেই জমাকৃত ময়লা পাম্পের সাহায্যে বের করা যায়। পুকুরের কিনারায় আরেকটি এক অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয় যাতে পুকুরের পানিটাকেই সার্বক্ষণিক পাম্প করে এবং পুকুরের পানিতে ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়। ফলে পুকুরের তলদেশের জমা হওয়া ময়লা পুকুরের কেন্দ্রে জমা হবে। এভাবে কিছুদিন পর পর পাম্পের সাহায্যে ময়লা পুকুরের বাইরে বের করে দিলে পানির গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে খাদ্য প্রয়োগ (Application of Food in Bottom Clean Raceway Method)

মৎস্যখাদ্যের মান ভালো হওয়া খুব জরুরি। সাধারণ জলাশয়ে খাবার দেয়ার অনুপাত অনুসারে বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছের খাবার দিতে হয়।

চাষের বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে (Bottom Clean Raceway System) মাছের খাদ্য পরিবর্তন হার (FCR = Feed Conversion Ratio) সাধারণ জলাশয়ের খাদ্য পরিবর্তন হার থেকে অনেক কম হয়, অর্থাৎ মাছচাষে খাদ্যের পরিমাণ কম লাগে। বায়োফ্লকে (biofloc) মাছের খাদ্য পরিবর্তন হার যেখানে ১.৫:১, সেখানে বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছের খাদ্য পরিবর্তন (FCR) হার ১.২ : ১ হয়ে থাকে। বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছের উৎপাদন পুকুর বা জলাশয়ের মাছের উৎপাদনের চেয়ে ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি। এ পদ্ধতিতে মাছচাষে একশ শতাংশের একটি জলাশয় থেকে বছরে সর্বোচ্চ ৩০০ মে.টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে বিনিয়োগের হার (Investment Rate in Bottom Clean Raceway Method)

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য একটি এক একর ট্যাংক তৈরি করতে ৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু এ বিনিয়োগ প্রথম বছরই ফেরত নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়।

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছের ঘনত্ব (Stocking Density in Bottom Clean Raceway Method)

এই পদ্ধতিতে মাছের ঘনত্ব সাধারণ জলাশয়ে মাছ চাষের থেকে ১০ গুণ বেশি দেয়া যায়। ১০০ শতাংশ একটি পুকুরে দশ লক্ষ শিং এবং গুলশার সাথে দশ হাজার কার্প মাছ মজুদ করা যায়। পানির গভীরতা ৬ ফুট হলে মাছ চাষে তিন স্তরে মাছ দেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে উপরের স্তরে কার্প এবং মধ্যস্তরে পাবদা ও নিচের স্তরে শিং ও গুলশা দেয়া উত্তম।

বটম ক্লিন রেসওয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব (Cost-Benefit Analysis of Bottom Clean Raceway)

বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছ চাষের আয় ও ব্যয় দুটোই অধিক। এ পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়। সে জন্য এক বছরে ১০০ শতাংশের একটি ট্যাংক পুকুরে আয়-ব্যয়ের হিসাব পার্শ্বে উপস্থাপন করা হলো।

ক. বটম ক্লিন রেসওয়ের ব্যয়ের হিসাব

নং	উপকরণ/ব্যয়ের খাত	পরিমাণ/সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
১	মাছের পোনা ক্রয় (পাবদা)	৮,০০,০০০টি	৬,৪০,০০০.০০
২	কার্প জাতীয় মাছের পোনা ক্রয় (রুই, কাতলা ও মৃগেল)	৬০,০০০টি	৪,২৫,০০০.০০
৩	মাছের খাদ্য (পিলেট ফিড)	৫৬,০০০ কেজি	৪২,০০,০০০.০০
৪	প্রোবায়োটিক, মেডিসিন	থোক	৩,০০,০০০.০০
৫	বিদ্যুৎ বিল (০৭ মাস)	-	৫,০০,০০০.০০
৬	কর্মচারীদের বেতন	থোক	২,৫০,০০০.০০
৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩,৫০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়			৬৬,৬৫,০০০.০০

খ. বটম ক্লিন রেসওয়ের আয়ের হিসাব

নং	উৎপাদন/আয়ের খাত	পরিমাণ/কেজি	মোট টাকা
১	পাবদা মাছের উৎপাদন	২৭,০০০ কেজি ৬,৭৫,০০০টি বাঁচার হার-প্রায় ৮৫%	৮১,০০,০০০.০০
২	কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন (রুই, কাতলা ও মৃগেল)	১৩,০০০ কেজি	২৬,০০,০০০.০০
সর্বমোট আয়		৪০,০০০ কেজি	১,০৭,০০,০০০.০০

গ. বটম ক্লিন রেসওয়ের নীট লাভ

(ক) ব্যয় : ৬৬,৬৫,০০০ টাকা

(খ) আয় : ১,০৭,০০,০০০ টাকা

(গ) নীট মুনাফা : ৪০,৩৫,০০০ টাকা

মূল তথ্য (Key Information)

- মজুদ ঘনত্ব: ৮৬০০টি/শতাংশ, মোট পোনা: ৮৬,০০০টি;
- চাষের সময়কাল: ২১০ দিন
- প্রতি কেজি মাছের উৎপাদন ব্যয়: ১৬৬.৬২৫ টাকা; এবং
- প্রতি কেজি মাছের গড় মূল্য : ২৬৭.৫০ টাকা।

চিত্র: পুকুরে মাছ আহরণ

উপসংহার (Conclusion)

মাছ চাষে নতুন নতুন সব প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে মাছ চাষে আরও বড় সাফল্য সূচিত হবে। এক্ষেত্রে পরিমিত ও মানসম্মত মৎস্য খাদ্যের ব্যবহার, সঠিক মজুদ ঘনত্ব বজায় রাখা, বিদ্যুৎ শক্তির পরিমিত ব্যবহারসহ সার্বিক বিষয়ে নজর দেয়া জরুরি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মৎস্য চাষে নতুন বিপ্লব সাধিত হবে। মৎস্যখাত নতুন যুগে প্রবেশ করবে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর (ইমেইল: joydeb77@yahoo.com)

আপেল শামুক চাষের সম্ভাবনা, প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা

Breeding, Nursery Management and Culture Potentiality of Snail

মোঃ শরিফুল ইসলাম[১], রাখি দাশ[২] ও নিলুফা বেগম[২]

Abstract

The freshwater apple snail, *Pila globosa* is one of the most abundant and commercially valued molluscs. The present condition of *P. globosa* in south west region is alarming due to indiscriminate killing for Prawn farming. The present study was aimed at elucidating the breeding behavior and reproduction process of *P. globosa*. The natural breeding experiment was conducted in two ponds- 52 decimal pond in Gopalganj sadar and 40 decimal pond in Kotalipara. The ponds were prepared and wild snails were stocked at the rate of 600 no./decimal. Organic compost (cow-dung, mustard oil cake and urea at the ratio of 1:1:0.5 at the rate of 2.5kg/decimal respectively) spread throughout the pond. Several male and female specimens were collected from experimental gher and brought to the laboratory aquarium to observe their breeding behavior. Breeding involved with three processes: copulation, fertilization and Egg laying. Copulation occurred in water on moist land and it takes about 3-4 hrs, then both separated. Fertilization happened internally for *P. globosa*. Egg laying started 2 or 3 days after copulation. They laid eggs in sheltered places or moist land near water in the dyke. A single female lays 180-200 no. per season. The time elapsed between the first and the last hatchings ranged from 6 to 25 days and for 80% of the 5 egg masses were studied. It needs about 25 days for full clot to be hatched. In the laboratory condition, hatching success was observed about 80-85%. The baby snails reared using formulated pellet feed diets gave better performance in terms of survival and mean growth rate than those reared on other diets. This was a preliminary research and more research should be carried out for development of culture techniques.

বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০ প্রজাতির শামুক রয়েছে (Gain, 1998), যার মধ্যে প্রাপ্যতা এবং বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান হচ্ছে মিঠাপানির আপেল শামুক, *Pila globosa* (Swainson, 1822)। এটি সকল ধরণের অস্থায়ী এবং স্থায়ী জলাশয় যেমন পুকুর, বিল, হাওর এবং বাওড় এ পাওয়া যায়। এ প্রজাতিটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় বায়োফিল্টার এবং জলজ পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণত বাংলাদেশের ২৯টি উপজাতি যেমনঃ বাওন, গারো, মারমা, হাজং, তংচঙ্গা ইত্যাদি জনগোষ্ঠী শামুক খেতে বিশেষ অভ্যস্থ। যদিও বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ শামুক খায় না। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন জাপান, থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শামুক খাবার হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া, সারা বাংলাদেশে শামুকের খোলস হতে মাংস বের করে কুঁচিকুঁচি করে কেটে চিংড়ি, হাঁস ও মুরগিকে খাওয়ানো হয়। তবে বাংলাদেশের শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই গলদা চিংড়ির ঘেরে প্রায় ০.৩ কেজি/শতাংশ/দিন হারে শামুকের মাংস ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও চিংড়ি ও পোল্ট্রি শিল্পে প্রোটিনের এক অনন্য উৎস হিসেবে ফিসমিলের পরিবর্তে শামুকের মাংসল অংশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শামুকের খোলসটিতে প্রচুর পরিমাণ $CaCO_3$ এর উপস্থিতির কারণে চুন উৎপাদন এবং পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতসব অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে প্রকৃতি থেকে নির্বিচারে শামুক আহরণ করার কারণে প্রকৃতিতে এর প্রাপ্যতা দিনদিন কমে যাচ্ছে। এছাড়াও চাষের জমিতে অতিরিক্ত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহারের কারণেও শামুকের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে স্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশ রক্ষা করা যাচ্ছে না এবং জলজ জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আপেল শামুক চাষের সম্ভাবনা (Culture Potentiality of Snail for Socio-Economic Development, Employment Opportunity of country)

দেশের পুকুর, খাল, বিল, হাওর এবং বাওড়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটিয়ে আপেল শামুকের প্রাপ্যতা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যাতে করে আগ্রহী জনগোষ্ঠী তাদের চাহিদা মত আপেল শামুক চাষ বা আহরণ করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে পারে। যেমনঃ মাছ চাষী ও হাঁস-মুরগির খামারিরা শামুকের মাংসল অংশ ব্যবহার করে মাছচাষে এবং হাঁস-মুরগি খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। কারণ, শামুকের মাংসে প্রোটিনের আধিক্য থাকায় চিংড়ি, পাঙ্গাস, শিং, মাগুর, কই ও তেলাপিয়া এবং হাঁস-মুরগির খুবই উপকারী এবং প্রিয়। এছাড়া, শামুকের মাংস ফিসমিলের পরিবর্তে ব্যবহার করলে খামারিদের খাদ্য ব্যয় অনেকাংশে কমে আসে। আর তাই খামারির মাছ বা হাঁস-মুরগির উৎপাদন ব্যয় অর্ধেক হয়ে যায়। ফলে, খামারিদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এছাড়া, শামুকের মাংসে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক না থাকায় তা মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এর ব্যবহার প্রচুর। এরফলে, বাগেরহাট জেলার ফলতিতা বাজারে স্তূপ আকারে শামুকের খোলস পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু, শামুকের এ খোলস থেকে সহজেই চুন উৎপাদন করা সম্ভব। আর সে চুন সরাসরি পানের সাথে গ্রহণ করা ছাড়াও মাছের পুকুরে এবং হাঁস-মুরগির খামারেও ব্যবহৃত হতে পারে। এ চুন উৎপাদনের সাথে গ্রামের মহিলারা খুব সহজেই যুক্ত হতে পারে এবং এটি তাদের একটি বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় অপ্রচলিত এ জলজ প্রাণীর বাণিজ্যিক চাষের উদ্যোগ নিলে সহজেই লাভবান হওয়া সম্ভব। গ্রীসে আপেল শামুকের চাষ করে সে দেশের বেকার যুবক-যুবতীরা সহজেই স্বাবলম্বী হয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের উৎপাদনের ৭০% রপ্তানি করে থাকে। আর তাই সঠিক পদ্ধতিতে শামুক উৎপাদন করে জীবন-জীবিকার উন্নয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশে আপেল শামুক খাদ্য হিসেবে গ্রহণে অভ্যস্থ না হলেও বিদেশের যেসব দেশের মানুষ এটাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেসব দেশ বাংলাদেশের জন্য রপ্তানির একটি বড় বাজার হতে পারে। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাঁচ তারকা হোটেলগুলোতে শামুকের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত মেনু পাওয়া যায়। আর তাই বলা যায়, আপেল শামুকের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে বা চাষের আওতায় আনতে পারলে তা দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় আপেল শামুক চাষের সম্ভাবনা (Culture Potentiality of Snail for Natural Environment Protection of Country)

আপেল শামুক আমাদের দূষিত জলজ পরিবেশের জন্য বায়োফিল্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ, শামুকের শরীরে রয়েছে প্রাকৃতিক জলশোধন ব্যবস্থা (ফিল্টার)। এরা ময়লামুক্ত পানি পান করে এবং ময়লাগুলো খাদ্য হিসেবে ছেঁকে রেখে যে জলটা বাইরে ছাড়ে তা বিশুদ্ধ। পরিবেশবান্ধব এগুণের কারণে আমাদের দেশের বিভিন্ন জলাশয়ের পানি পরিষ্কারক হিসেবেও এ শামুক ব্যবহার হতে পারে। আমাদের আশপাশের জলাশয়গুলোতে পূর্ববর্তী সময়ে জলজ পরিবেশ যতটা পরিষ্কার ছিলো বর্তমানে তা খুবই নাজুক অবস্থায় আছে। তাই, এ জলজ বায়োফিল্টার শামুকের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলজ পরিবেশের পূর্ববর্তী স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এর ফলে বলা যায়, মাছচাষে শামুকের ব্যবহার যেমন সাশ্রয়ী তেমনি পরিবেশবান্ধব। অনেক ক্ষেত্রেই মাছচাষের পাশাপাশি শামুক চাষে শামুকের জন্য আলাদা খাবার দেয়ার দরকার হবে না এবং শামুক পুকুরে বায়োফিল্টার হিসেবে কাজ করে বলে পানির গুণাগুণ ভালো থাকবে। এটা প্রতীয়মান হয় যে, মাছের সাথে শামুক সমন্বিত চাষ করলে লাভজনক এবং পরিবেশবান্ধব হবে।

আপেল শামুকের জীববৈচিত্র্য ও প্রজনন কলাকৌশল পর্যবেক্ষণ (Observation on Biodiversity and Breeding Technology of Freshwater Apple Snail)

প্রকৃতিতে শামুকের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং চাষ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রজাতিটির প্রজনন কৌশল সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর বিজ্ঞানীগণ গত দুইবছর ধরে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও সদর উপজেলায় দুইজন চাষির ঘের লিজ নিয়ে শামুকের প্রজননের জন্য উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করে শামুক মজুদ করে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে আসছে। শামুক মজুদের পূর্বে ঘেরে উত্তম রূপে নেট ও বাঁশ দিয়ে বেড়া দেয়া হয় যাতে করে আপেল শামুক ঘের থেকে বের হয়ে যেতে না পারে। এরপর ঘেরে বেড়ার পাশে এবং মধ্যখানে কিছু কিছু জায়গায় আপেল শামুকের ডিম পারার জন্য উঁচু করে আইল/ভিবি তৈরি করে দেয়া হয়। ঘেরে শামুকের খাদ্য এবং আশ্রয় নেয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জলজ গাছপালা যেমন: কলমিলতা, নলখাগড়া, ক্ষুদিপানা ও কচুরিপানা ইত্যাদি রাখা হয়। মাঝেমাঝে ঘেরে চুন ও ফিশমিল প্রয়োগ করা হয়। যা শামুকের দেহবৃদ্ধি এবং খোলস তৈরিতে কাজে লাগে।

এর পাশাপাশি বিজ্ঞানীগণ আরো ভালোভাবে প্রজনন কৌশল পর্যবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রের গবেষণাগারের অ্যাকুরিয়ামেও শামুকের পরিচর্যা করে আসছে। অ্যাকুরিয়ামে উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এবং সার্বক্ষণিক অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্য হিসেবে ক্ষুদিপানা, বিভিন্ন জলজ আগাছা এবং ফিশমিল প্রদান করা হয়।

চিত্র: গোপালগঞ্জ সদরে অবস্থিত ঘের

চিত্র: কোটালীপাড়ায় অবস্থিত ঘের

আপেল শামুকের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity of Freshwater Apple Snail)

শামুক একটি শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী। শুষ্ক প্রতিকূল শীতমৌসুমে শামুক শীতযাপন (Hibernation) করার জন্য মাটির চার (০৪) ফুট নীচ পর্যন্ত অবস্থান নিয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য এদের জীবনচক্রে এ প্রক্রিয়াটি অপরিহার্য। এসময় তারা কোন খাবার গ্রহণ করে না এবং শীতযাপনকালে প্রায় ১০-১২% শামুকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। বায়ু, পরিবেশ এবং শব্দদূষণ শামুকের বৃদ্ধি এবং প্রজনন প্রভাবিত করে। সাধারণত বর্ষাকালের শুরুতে বেশিরভাগ আপেল শামুকের প্রজনন ঘটে থাকে। বাংলাদেশের মত নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দেশে বছরের মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত আদ্র আবহাওয়া বজায় থাকায় শামুক এসময়কালে প্রজনন করে থাকে। আপেল শামুকের

লিঙ্গগুলি পুরুষ-স্ত্রী ভেদে পৃথক পৃথক এবং পুরুষদের দেহ আবরণে বা শেলটিতে দেহ-ঘূর্ণায় কম ফোলা থাকে।

আপেল শামুকের প্রাকৃতিক প্রজনন (Natural Breeding of Freshwater Apple Snail)

পুরুষ ও স্ত্রী শামুকের মিলনের প্রক্রিয়া শুরু করে প্রণয়/আকৃষ্টকরণের মধ্য দিয়ে। এ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ২-১২ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সঙ্গী সন্ধানের জন্য শামুক প্রাথমিকভাবে তাদের সঙ্গীর ছাড়া রাসায়নিকের গন্ধ এবং স্পর্শবোধের ওপর নির্ভর করে কারণ তাদের চাক্ষুষ ক্ষমতাটি আংশিকভাবে বিকশিত এবং শ্রবণশক্তিহীন। শামুকের প্রজননে সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়া জড়িত: সঙ্গম, নিষেকরণ এবং ডিমপ্রসব।

আপেল শামুকের সঙ্গম (Copulation of Freshwater Apple Snail)

সঙ্গমের সময় শামুকের পা এবং মাথা প্রসারিত থাকে এবং স্বাচ্ছন্দে ক্ষুদিপানা বা অন্যান্য আগাছা খেতে থাকে। গবেষণাগারের অ্যাকুরিয়ামে দেখা যায় স্ত্রী শামুক একুরিয়ামের কাঁচের পাশে বয়ে বেড়ায় এবং জলের পৃষ্ঠের কাছে উঠে আসে, তখন পুরুষ শামুকটি স্ত্রী শামুকের উপরে আহরণ করে, তার যথাযথ অবস্থান গ্রহণ করে এবং এর লিঙ্গ-শিথল এবং লিঙ্গকে নারী শামুকের ম্যান্টেল-গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করায়।

সঙ্গম প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে গড়ে ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগতে দেখা যায়। প্রকৃতিতে সঙ্গম প্রক্রিয়াটি আর্দ্র জমিতে বা পানিতে ঘটে।

আপেল শামুকের নিষেক এবং ডিমপ্রসব (Hatching and Egg Laying of Freshwater Apple Snail)

সঙ্গমের এক বা দুদিন পরে ডিম স্ত্রী শামুকের জরায়ুতে নিষিক্ত হওয়া শুরু করে। নিষেকের পরে শামুকের অভ্যন্তরে ডিমগুলির

চিত্র: শামুকের সঙ্গম

চিত্র: শামুকের ডিম প্রসব

বৃদ্ধি প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যতক্ষণ না প্রসবের জন্য প্রস্তুত হয়। সঙ্গমের ২ বা ৩ দিন পরে স্ত্রী শামুক ডিম দেওয়া শুরু করে। তারা আশ্রয়স্থলগুলিতে বা আইলের পানির নিকটে আর্দ্র জমিতে ডিম দেয়। নিষিক্ত ডিমগুলি আর্দ্র ভূমিতে একত্রিত অবস্থায় উঁচু অঞ্চলে থাকে যাতে ডিমের আর্দ্রতা হ্রাস না পেয়ে উপযুক্ত অবস্থায় থাকে। একটি পরিপক্ক শামুক কয়েকধাপে ডিম দেয়া সম্পন্ন করে থাকে। প্রথমধাপে ৮০-১০০টি, পরবর্তী ধাপে ৫০-৭০টি এবং শেষ ধাপে ২০-৩০টি ডিম দিয়ে থাকে। এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ১৮০-২০০টি ডিম দিয়ে থাকে। গুচ্ছবদ্ধ ডিমগুলি গোলকৃতির হয়, মটরশুটি বীজের আকার এবং সাদা আস্তরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সঠিক পরিস্থিতিতে একটি আপেল শামুক বেশ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রতি ৪-৭ দিন পরপর একটি ডিমগুচ্ছ ছাড়তে পারে। প্রত্যেকবার ডিমছাড়ার পর স্ত্রী শামুকের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং স্ত্রী শামুক আবারো শক্তি সঞ্চয় করে ডিম প্রসব করে। ডিমের উৎপাদন তাপমাত্রা এবং খাবারের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল। ঘের থেকে গুচ্ছবদ্ধ ডিম সংগ্রহ করে একুরিয়ামের আদ্র জায়গায় ডিম ফোটা/হ্যাচিং পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়। ডিম ছাড়ার ১০-১২ দিন পর থেকে ফোটা শুরু হয় এবং একটি ডিমের গুচ্ছ সম্পূর্ণ হ্যাচ করতে ২৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে ডিমফোটার হার ৮০-৮৫% পাওয়া যায়।

আপেল শামুকের নার্সারি ব্যবস্থাপনা (Nursery Management of Apple Snail)

গবেষণাগারে উৎপাদিত ছোট শামুক এর নার্সারি ব্যবস্থাপনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মজুদ হারে বিভিন্ন খাদ্য ব্যবহার করে ছোট শামুকের বৃদ্ধির ও বেঁচে থাকার হার পর্যবেক্ষন করা হয়। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমে অ্যাকুরিয়ামে এক (০১) লিটার পানিতে ৬০টি এবং ৩০টি হারে শামুকের বাচ্চা মজুদ করে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ১০% দেহ ওজন হারে সরবরাহ করা হয়। খাদ্যগুলো যথাক্রমে: ক) ১০০% পিলেট খাদ্য; খ) ১০০% ফিশমিল এবং গ) ৫০% ফিসমিল ও ৫০% ক্ষুদিপানার চূর্ণ। এসময় অ্যাকুরিয়ামের পানি সাতদিন অন্তর অন্তর বদলানো হয় এবং অ্যায়ারেটর দিয়ে সার্বক্ষণিক অক্সিজেন এর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া, অ্যাকুরিয়ামের পানির গুণাগুণ চাষ উপযোগী রাখা হয়। এভাবে একমাস প্রতিপালনের পরে শামুকের বাচ্চার দেহবৃদ্ধির হার এবং বেঁচে থাকার হার নিরুপণ করা হয়।

এভাবে, উত্তম পরিবেশ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার পর দেখা যায় যে, ৩০টি/লিটার পানি হারে মজুদকৃত শামুকের বাচ্চার বৃদ্ধিও হার অন্যগুলোর চেয়ে বেশি। অন্যদিকে ১০০% পিলেট ফিড প্রদানকৃত শামুকের বাচ্চার বৃদ্ধির হার অন্যগুলোর চেয়ে বেশি পাওয়া যায়। আর বেঁচে থাকার হার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১০০% পিলেট প্রদানকৃত শামুকের বাচ্চা এবং ৩০টি/লিটার পানি হারে মজুদকৃত শামুকের বাচ্চার বেঁচে থাকার হার বেশি পাওয়া যায়। এ গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, আপেল শামুক বাজারে সহজলভ্য পিলেট ফিড দিয়ে চাষ করা সম্ভব এবং সাধারণত ২৮-৩২ টি/লিটার পানি হারে মজুদ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

বর্তমান গবেষণাটি কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শামুক প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনার সফল সম্ভাবনা যাচাইয়ের প্রাথমিক কাজ: জৈব প্রজনন, পোনা উৎপাদন এবং

ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম : নিরাপদ এবং রোগমুক্ত মাছ উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ার

Fisheries Quarantine Activities : Great Measures for Safe and Disease Free Fish Production

মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ চৌধুরী[১] ও মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির[২]

Abstract

Fisheries quarantine is one of the components of fisheries biosecurity programme, which includes a set of standard operating procedures (SOPs). Fisheries quarantine means maintaining a batch of aquatic animals in isolation with no direct or indirect contact with other of fish, fisheries products, probiotics and packing materials in order to undergo observation for a specified length of time and, if appropriate, testing and treatment of stocks in isolation. Fisheries quarantine is an important risk management measure that can be applied to reduce the risk posed by serious aquatic animal diseases when aquatic animals are moved internationally or domestically between different regions or zones. The primary purpose of fisheries quarantine is to minimize the risk of introducing pathogens into the territory of the importing country and their transmission to susceptible species. It is necessary to impose the provisions of import control and quarantine for the protection of health of fisheries and to protect spread of transboundary zoonotic and fish diseases and the germs inside of Bangladesh in the context of the international transport of the fish, fisheries and probiotics and packing materials. For quarantine of the fish, fishery products and probiotics, Bangladesh government imposed an Act named Fisheries Quarantine Act, 2018.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৯ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ ২য় স্থানে রয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম। এই যখন পরিসংখ্যান ঠিক তখনই মৎস্য সংগনিরোধ তথা ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন এর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন রোগমুক্ত ও নিরাপদ মাছ উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, পরিবহণ এবং খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের কারণে আঞ্চলদেশীয় সীমান্ত পেরিয়ে রোগ বিস্তার বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বগ্রাম ধারণার এই সময়ে প্রতিটি পণ্য বৈশ্বিক পণ্য হিসেবে বিবেচিত, আর উন্নয়ন ধারণাতো আঞ্চলদেশীয় সমন্বয় ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রজাতি বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করতে এক দেশ হতে অন্য দেশে নানা প্রজাতির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। আর এধরণের অনুপ্রবেশে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রাণঘাতী ভাইরাসের আগমন ঘটতে পারে যা জুনোটিক (প্রাণী হতে মানুষে ছড়ানো) রোগ হিসেবে মহামারির আকার ধারণ করতে পারে। জুনোটিক রোগ ছাড়াও অন্যান্য ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগবালাই আমাদের ক্রমবর্ধমান মৎস্য সেক্টরের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রায় ৫১৯২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মৎস্যপণ্যের আমদানিকারক দেশসমূহ তাদের বন্দরে যথাযথ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা অনুসরণ করে কেবল নিরাপদ পণ্যের প্রবেশ অনুমোদন করে। একইভাবে বাংলাদেশের মৎস্য আমদানির ক্ষেত্রে বন্দরগুলোতে মৎস্য সংগনিরোধের ঘাটতি থাকলে রোগজীবাণু অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মৎস্যখাত ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সংক্রমণ ঝুঁকি এড়াতেই বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে জারি করেছে "মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১৮"।

ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন (মৎস্য সঙ্গনিরোধ) কী? (What is Fisheries Quarantine?)

মৎস্যরোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার রোধকল্পে আমদানিকৃত জীবিত মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদি পৃথকীকরণ (isolation) এবং পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন স্থানে মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অন্তরীণ (confined) রাখা এবং পর্যবেক্ষণ করাকে মৎস্য সঙ্গনিরোধ (Fisheries Quarantine) বলে।

আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রাণীর সাথে জুনোটিক রোগের সম্পর্ক (Interrelation between zoonotic diseases and different imported animals)

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী) দ্বারা অন্যান্য প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের দেহে ছড়ানো রোগকে জুনোটিক রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। জুনোটিক রোগসমূহ একটি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র পৃথিবীর জন্য বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ (COVID - 19) রোগটিকে জুনোটিক রোগ হিসেবে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছে যা মহামারি আকারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৯ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত করোনা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট কোভিড-১৯ মহামারীতে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি চীন থেকে হলেও সংক্রমণের উৎস নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা কাটেনি। এক্ষেত্রে কখনো বন্যপ্রাণী, কখনো বনরুই বা বনরুই সদৃশ প্যাঙ্গোলিন, কখনো বা আধাজলজ প্রাণী নিঙ্ক, কখনো বা মাছ এমনকি সামুদ্রিক মাছের বাজারকে সংক্রমনের উৎস বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি জুনোটিক রোগ সারা পৃথিবীতে মানুষের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে আছে যেগুলো বিগত সময়ে অনেক মানুষের

মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জুনোটিক রোগ হলোঃ Animal Flu, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Anthrax, Bird Flu, Bovine Tuberculosis, Dengue Fever, Ebola, Hepatitis e, Malaria, Plague, Rabbis, Swine Flu ইত্যাদি।

কোয়ারেন্টাইনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের ঝুঁকিসমূহ (Threats of fisheries resources of Bangladesh in quarantine context)

সম্ভাবনাময় এ মৎস্যখাত বহির্বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশের ফলে সম্ভাবনাময় এই মৎস্যখাত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। অবাধ বাণিজ্যের বিশ্বায়নের এ যুগে বন্দরগুলোতে মৎস্য কোয়ারেন্টাইনের ঘাটতি থাকলে রোগজীবাণু অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এদেশের মৎস্য সম্পদে বিস্তার লাভ করতে পারে যা দেশের মৎস্য সম্পদে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। একইসঙ্গে মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কোনো রোগের বিস্তার লাভ করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজার দখলের আন্তঃদেশীয় ষড়যন্ত্রের আশংকায় বন্দরগুলোতে মৎস্য কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

মৎস্য সঙ্গনিরোধ (কোয়ারেন্টাইন) আইনের প্রেক্ষিত (Perspective of Fisheries Quarantine Act)

মৎস্য, মৎস্যপণ্য ও উপকারী জীবাণুর আন্তর্জাতিক পরিবহনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ও বিস্তার রোধকল্পে এবং মৎস্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রণীত 'মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১৮' সরকারের একটি যুগান্তকারী আইন। এই আইন মোতাবেক 'মৎস্য' বলতে সকল প্রকার মাছ, স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি, উভচর জলজ প্রাণী, কাছিম, কাঁকড়া, কুমির, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী, শামুক বা ঝিনুক জাতীয় জলজ প্রাণী, একাইনোডার্মস জাতীয় প্রাণী, ব্যাঙ এবং এদের জীবন্ত কোষ ও জীবনচক্রের যে কোনো ধাপকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মৎস্যপণ্য বলতে মৎস্য হতে উৎপন্ন পণ্য বা প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত পণ্যকে বোঝানো হয়েছে।

আমদানিকৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের প্রবেশ বন্দরসমূহ (Entry ports of imported fish, fishery products and probiotics)

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দর দিয়ে যেকোনো পণ্যই আমদানি ও রপ্তানি হয়ে থাকে। কিছু সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও আমাদের দেশের ১৭টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। আমাদের দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যসমূহ নিম্নবর্ণিত ১৭টি বন্দরের মাধ্যমে আমদানি হয়ে থাকে।

ক. বিমান বন্দর

১. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা;
২. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম; এবং
৩. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

খ. সমুদ্র বন্দর

১. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম; এবং
২. মংলা সমুদ্র বন্দর, মংলা, বাগেরহাট।

গ. স্থলবন্দর

১. আখাউড়া স্থলবন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া;
২. কসবা স্থলবন্দর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া;
৩. টেকনাফ স্থলবন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার;
৪. সুতারকান্দি স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট;
৫. তামাবিল স্থলবন্দর, গোয়াইনঘাট, সিলেট;
৬. সোনা মসজিদ স্থলবন্দর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ;
৭. হিলি স্থলবন্দর, হাকিমপুর, দিনাজপুর;
৮. বুড়িমারী স্থলবন্দর, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট;
৯. চিলাহাটি স্থলবন্দর, চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী;
১০. বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, শার্শা, যশোর;
১১. ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা; এবং
১২. নাকুগাঁও স্থলবন্দর, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

মৎস্য কোয়ারেন্টাইন সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কার্যাবলি (Functions of quarantine related offices)

- বাংলাদেশে বিদ্যমান মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের আলোকে বহির্বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত উপকারী জীবাণু, মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি, উপকারী জীবাণু-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ও বিস্তাররোধ এবং মৎস্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- স্থলবন্দর, সমুদ্র বন্দর বা বিমান বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত জীবন্ত মাছে ক্ষতিকর ও সংক্রামক রোগজীবাণু, পোকামাকড় বা কোনো পরজীবী আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং এরূপ কিছু পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা।
- বহির্বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রকার জীবন্ত মৎস্য যেমন- চিংড়ি পোনা, ব্রুড মাছ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন মাছের রেণু ও পোনা ইত্যাদির স্বাস্থ্যগত মান যাচাই এবং বাংলাদেশের জলজ পরিবেশের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা, মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিনা তার কারিগরি দিক যাচাই করা।
- রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধের লক্ষ্যে মৎস্য, মৎস্যপণ্য, উপকারী জীবাণু বা প্যাকিং দ্রব্যাদির বাহন, গুদাম ও এর অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আমদানিকৃত জীবিত মৎস্য অথবা মৎস্যপণ্য পরিদর্শন করা।
- কাস্টমস এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম সম্পাদন করা।
- আমদানিকৃত মৎস্য অথবা মৎস্যপণ্যের প্যাকিং লিস্ট, এয়ারওয়ে বিল, কমার্শিয়াল ইনভয়েস ও হেলথ সার্টিফিকেট যথাযথভাবে যাচাই করে ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বন্দরসমূহ দিয়ে আমদানিকৃত মৎস্য এবং মৎস্যপণ্যের বিবরণ (An overview of imported fish and fishery products)

বাংলাদেশে বিমানবন্দরগুলো দিয়ে জীবিত অ্যাকোয়ারিয়াম ফিস, জীবিত অন্যান্য চাষযোগ্য মাছের রেণু ও পোনা, এসপিএফ (স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রি) চিংড়ির ব্রুড ও পিএল, হিমায়িত মাছ, জীবন্ত পলিকীটস এবং মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত হরমোন ইত্যাদি আমদানি করা হয়ে থাকে। সমুদ্র বন্দর দিয়ে মূলত ফিস মিল, ফিস ফিড, মৎস্য খাদ্য তৈরির উপকরণসমূহ, প্রোবায়োটিক্স, কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত হরমোন, বিভিন্ন অ্যাকোয়া প্রডাক্টস-এর উপকরণসমূহ যেমন- জিওলাইট, অক্সিজেন সাপ্লিমেন্ট, প্রোবায়োটিক্স ইত্যাদি আমদানি করা হয়। স্থলবন্দরগুলো দিয়ে মূলত ফিস ফিড, মৎস্য খাদ্য তৈরির উপকরণসমূহ, হিমায়িত ও বরফায়িত মাছ, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি আমদানি করা হয়।

আমদানিকৃত মাছ ও মৎস্যপণ্যসমূহের রোগ পরীক্ষণ বিবরণ (Disease diagnosis of imported fish and fishery products)

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত অনাপত্তিপত্র/আমদানি অনুমতিপত্র (NOC/IP) অনুযায়ী অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমদানিকৃত জীবিত মাছের রেণু, পোনা এবং ব্রুড বা মৎস্যপণ্যের নমুনা রোগজীবাণু পরীক্ষার জন্য বিএফআরআই অথবা মৎস্য অধিদপ্তরাধীন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিসমূহে প্রেরণ করা হয়।

জীবিত চিংড়ির ব্রুড/পিএল আমদানির ক্ষেত্রে দেশের খুলনা ও চট্টগ্রামে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন আন্তর্জাতিক মানের দুটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে ৫টি ভাইরাসজনিত এবং দুটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ পরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে। ভাইরাসজনিত ৫টি রোগ হলো WSSV (White Spot Syndrome Virus Disease), YHV (Yellow Head Virus Disease), IHHNV (Infectious Hypodermal & Haematopoietic Necrosis Virus Disease), IMV (Infectious Myonecrosis Virus Disease) ও TSV (Taura Syndrome Virus Disease)। ব্যাকটেরিয়াজনিত দুটি রোগ হলো AHPN (Acute Haematopancreatic Necrosis Disease also known as EMS- Early Mortality Syndrome) ও NHP (Necrotising Haematopancreatitis Disease)। হিমায়িত মৎস্য, শুঁটকি মাছ ও মৎস্যপণ্যের ক্ষেত্রে ফরমালিন কীটের সাহায্যে ফরমালিন পরীক্ষা করে পরবর্তীতে পণ্য ছাড় দেয়া হয়।

জীবিত মৎস্যের কোয়ারেন্টাইনের বর্তমান সমস্যা এবং সুপারিশসমূহ (Limitations of live fish quarantine and recommendations)

- মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ এর আলোকে মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে;
- প্রাথমিকভাবে ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক

চিত্র: ফিসটেক হ্যাচারি, কক্সবাজার কর্তৃক থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত এসপিএফ ব্রুড বাগদা চিংড়ি (*P. monodon*) থেকে রোগ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ

  বিমানবন্দরে জীবিত মাছের কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত যেকোনো রোগ পরীক্ষার জন্য ঢাকার সাভারে অবস্থিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি অথবা ময়মনসিংহে অবস্থিত বিএফআরআই-কে নির্ধারণ করতে হবে;
- জীবিত চিংড়ির কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত রোগ পরীক্ষার জন্য ঢাকা (সাভার), চট্টগ্রাম ও খুলনা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিকে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ উক্ত তিনটি ল্যাবরেটরিতে চিংড়ির রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে;
- গুরুত্বপূর্ণ কোয়ারেন্টাইন দপ্তরসমূহে পিসিআর (PCR) মেশিনসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাব এবং কোয়ারেন্টাইন সংশ্লিষ্ট অত্যাধুনিক ভৌত অবকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে এবং দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে; এবং
- মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১৮ সংশোধনপূর্বক মৎস্য, মৎস্যপণ্য ও উপকারী জীবাণু রপ্তানির ক্ষেত্রে ফিস হেলথ সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

দক্ষ জনবল সংকট, নিজস্ব স্থাপনা/অবকাঠামোর অভাব, কোয়ারেন্টাইন সংশ্লিষ্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের ১৭টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। ক্রমবিকাশমান এবং কৃষিজ জিডিপি-তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা বাংলাদেশের মৎস্যখাত বহির্বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশের ফলে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। সংক্রামক রোগ, জুনোটিক রোগসহ মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ট্রান্সবাউন্ডারি ডিজিজ থেকে রক্ষার জন্য মৎস্য সঙ্গনিরোধ কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে পরিচালনা করতে হবে।

---

[1]উপ প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর (ইমেইল: mamunc2010@gmail.com)
[2]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ, নিবৃত্তি ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

National Plan of Action to Prevent and Control of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী[১], আ.ন.ম. নাজিম উদ্দিন[২] ও শওকত কবির চৌধুরী[৩]

Abstract

The fisheries sector of Bangladesh plays a significant role in the sustainable management of the marine resources and conservation of threatened aquatic species, while supplying essential food, nutrition, employment, income and export earnings. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing has affected the economic and social livelihood of the fishers, as well as leads to negative impacts on the fishing industry. As a member state of the United Nations for the conservation and management of marine fisheries resources, Bangladesh has ratified and followed the UNs Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. The Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) adopted the International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) in 2001. The IPOA-IUU called on States to develop and implement the National Plan of Action (NPOA)-IUU Fishing by June 2004. In accordance with this, the NPOA to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (NPOA-IUU) of Bangladesh was drafted in 2019 with the technical assistance of FAO. This NPOA-IUU Fishing contains a record of ongoing actions and focal areas totaling 45 actions with a time frame by 2020-2024 and action plan will be reviewed after every 4-year on an ongoing basis. The development of the NPOA-IUU Fishing is considered as a key step towards the Sustainable Development Goal (SDG) 14: Life Below Water.

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ আইইউইউ (Illegal, Unreported and Unregulated) ফিসিং হলো জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক বা নিয়মবহির্ভূত ও অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে মৎস্য আহরণ। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় আইইউইউ ফিসিং বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে; যা বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জন্যও হুমকিস্বরূপ। আইইউইউ ফিসিং-এর ফলে মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন সৃষ্টিসহ ভবিষ্যতে মাছের মজুদ ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মৎস্যজীবী জেলেদের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ের মৎস্যকুলের প্রাচুর্য (fish stock) দ্রুত হ্রাসমান হওয়ায় ৯০ দশকের শেষ দিক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও FAO-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আইইউইউ ফিসিং প্রতিরোধে সোচ্চার হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ২০০১ সালে আইইউইউ মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে 'International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU)' প্রণয়ন করে এবং সদস্য দেশসমূহকে ২০০৪ সালের মধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা 'National Plan of Action (NPOA)-IUU Fishing' প্রণয়নে আহ্বান জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে FAO-এর কারিগরি সহায়তায় 'National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (NPOA-IUU)' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবছর ৫ জুন আন্তর্জাতিক আইইউইউ (IUU) ফিসিং প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়ে আসছে।

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ (Illegal, Unreported and Unregulated fishing)

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA- IUU) অনুযায়ী অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

অবৈধ মৎস্য আহরণ: অনুমতি ছাড়া দেশীয় বা বিদেশি নৌযান দ্বারা রাষ্ট্রীয় জলসীমায় মৎস্য আহরণ অথবা সে দেশের আইন বহির্ভূতভাবে মৎস্য আহরণ। কোনো আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার (Regional Fisheries Management Organizations, RFMOs) সদস্য হয়ে উক্ত সংস্থার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে মৎস্য আহরণ।

অনুল্লিখিত মৎস্য আহরণ: আহরিত মাছের তথ্য না দেয়া বা ভুল তথ্য প্রদান করা; যা দেশের আইনের পরিপন্থী। একইভাবে কোনো আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার (RFMO) সদস্য হয়ে উক্ত সংস্থার মৎস্য আহরণ প্রতিবেদনের পরিপন্থীভাবে আহরিত মাছের তথ্য না দেয়া বা ভুল তথ্য প্রদান করা।

অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ: একটি আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার (RFMO) মৎস্য আহরণ এলাকায় রাষ্ট্রীয় পতাকাবিহীন নৌযান (vessels without nationality) দ্বারা মৎস্য আহরণ বা সদস্য দেশের বাইরের কোনো সদস্য কর্তৃক মৎস্য আহরণ বা উক্ত সংস্থার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে মৎস্য আহরণ। কোনো সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যতীত মৎস্য আহরণ যা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

চিত্র: অবৈধ জাল দ্বারা মৎস্য শিকার

বাংলাদেশে আইইউইউ মৎস্য আহরণের বর্তমান অবস্থা (Present status of IUU fishing of Bangladesh)

বর্তমানে প্রায় সত্তর হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান উপকূল ও অগভীর সমুদ্রে এবং প্রায় আড়াই শত বাণিজ্যিক ট্রলার বহর বঙ্গোপসাগরের গভীর অংশে বাংলাদেশের Exclusive Economic Zone (EEZ)-এর ভেতর মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদও আইইউইউ ফিসিং হতে মুক্ত নয়। আমাদের দেশে যে প্রক্রিয়ায় আইইউইউ (IUU) ফিসিং হচ্ছে:

- যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত ও লাইসেন্সবিহীন নৌযান, ক্যাচ ডকুমেন্টেশন অথবা আহরিত মাছের অপর্যাপ্ত তথ্য;
- বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ভঙ্গ করে ৪০ মিটার গভীরতার ভেতর মৎস্য আহরণ;
- বিদেশি মৎস্য নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ;
- অবৈধ মৎস্য জাল ও সরঞ্জামের ব্যবহার; এবং
- সরকার ঘোষিত বন্ধ মৌসুমে মৎস্য আহরণ।

আইইউইউ ফিসিং-এর ক্ষতিকর প্রভাব (Adverse effect of IUU Fishing)

- আইইউইউ ফিসিং সামুদ্রিক পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবসহ সামুদ্রিক প্রতিবেশ ও মৎস্যকূলের উপর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে;
- টেকসইভাবে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা (consrevation and management) প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়;
- রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স ফি আদায় না হওয়ায় দেশ রাজস্ব আয় বঞ্চিত হয়;
- ফিসিং ভ্যাসেল কর্তৃক প্রচলিত আইন ও বিধিমালা ভঙ্গ করে মৎস্য আহরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়;

চিত্র: আইইউইউ (IUU) ফিসিং একটি সংগঠিত অপরাধ

- উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী (small scale fisheries) সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা ব্যাহত হয়;
- বৈধ ও অবৈধ প্রক্রিয়ায় মৎস্য আহরণের ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়;
- কার্যকর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিশেষত Monitoring Control and Surveillance (MCS)-এর অভাবে আইইউইউ ফিসিং একটি সঙ্গবদ্ধ অপরাধ (organized fisheries crime)-এ পরিণত হওয়ার প্রবণতা থাকে;
- আইইউইউ ফিসিং-এর মাধ্যমে আহরিত মাছ হতে উৎপাদিত মৎস্যপণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; এবং
- সর্বোপরি, আইইউইউ ফিসিং জীবন-জীবিকার জন্য হুমকিস্বরূপ, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিবন্ধকতা এবং খাদ্য অনিরাপত্তা (food insecurity) সৃষ্টি করে।

আইইউইউ ফিসিং নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান (Legal Framework regarding IUU Fishing)

- সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করতে ১৯৮৩ সালে 'সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩' জারি করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের অধীন 'সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩' এবং ১৯৯২ সালে উক্ত বিধিমালার সংশোধনী জারি করা হয়;
- ২০২০ সালে 'সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩'-এর পরিবর্তে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০' জারি করা হয়।
- উক্ত আইনে আইইউইউ ফিসিংকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে;
- বিদেশি মৎস্য নৌযান বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবৈধ মৎস্য নৌযান বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশ করলে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০'-এর আওতায় শাস্তির বিধান রয়েছে;
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলি যেমন- ফিসিং ভেসেলের বৈধ ফিসিং লাইসেন্স থাকা, 'সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন' এবং 'সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন' থাকতে হবে;
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রতিটি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান/ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মেরিন ফিসারিজ অফিস হতে সমুদ্র যাত্রার অনুমতি বাধ্যতামূলক;
- সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষিত এলাকায় এবং সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটারের কম গভীরতায় ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ। যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানগুলোর জন্য ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণ এলাকা নির্ধারিত;
- একজন ফিসিং লাইসেন্সধারী মৎস্য আহরণ ও বিক্রয় বিষয়ক সকল তথ্য নির্ধারিত ফর্মে সংরক্ষণ ও এর কপি পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রদান;
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ভেসেল/ট্রলারের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক;

- ফিসিং ভেসেল/ট্রলারকর্তৃক ধৃত মাছ ল্যান্ডিং বা ট্রান্সশিপমেন্ট-এর সময় একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
- সমুদ্র হতে আহরিত মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের জন্য সে দেশের সরকার অনুমোদিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে 'আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট' গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে;
- 'আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট' ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগারে রপ্তানিতব্য মাছের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হারে রাজস্ব প্রদান করতে হয়;
- বিভিন্ন ফিসিং গিয়ার-সরঞ্জামাদি, নৌযান, বিভিন্ন শ্রেণির ট্রলার ইত্যাদি কর্তৃক মৎস্য আহরণ এলাকা ও গভীরতা নির্ধারণ করা রয়েছে;
- সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফিসিং ভেসেল কর্তৃক ব্যবহৃত জালের কড-অ্যান্ড ফাঁসের আকার ও পরিধি নির্ধারিত আছে; এবং
- পোনাজাল, মোহনা বেহুন্দিজাল, টানাজাল ইত্যাদি ক্ষতিকারক জাল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং জালসমূহ দ্বারা যেকোনো ধরনের মৎস্য ও চিংড়ি পোনা আহরণ নিষিদ্ধ।

IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ

- FAO International Plan of Action-IUU (IPOA-IUU) 2001; এবং
- The Agreement of Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated Fishing (PSMA)-2009।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (National Plan of Action-IUU Fishing)

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ 'The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982' অনুসরণ ও অনুমোদন করেছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা যেমন- FAO, ILO, IMO সহ বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা কর্তৃক প্রণয়নকৃত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নির্দেশিকা অনুসরণ করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা বা সংগঠন যেমন- Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Bay of Bengal Programme-Inter Governmental Organisation (BOBP-IGO), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC) ইত্যাদি কর্তৃক প্রণীত সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণে বাংলাদেশ চুক্তিবদ্ধ। জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৬-৩০ মেয়াদী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) লক্ষ্যমাত্রার ১৪ নং লক্ষ্যমাত্রা: জলজ জীবন (Life Below Water) এ টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ১৪.৪ লক্ষ্যমাত্রায় ২০২০ সালের মধ্যে মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতিআহরণ, আইইউইউ এবং সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ-পদ্ধতির অবসান ঘটানোর জন্য বলা হয়েছে এবং সূচক ১৪.৬.১ এ আইইউইউ মৎস্য আহরণ সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিরিখে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য FAO-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে FAO এর কারিগরি সহায়তায় NPOA-IUU এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

NPOA-IUU উন্নয়ন (Development of NPOA-IUU)

২০১৬ সালে FAO কর্তৃক আয়োজিত ৩৩তম Asia Pacific Regional Conference-এ সদস্য দেশসমূহের অনুরোধে Bangladesh, Cambodia, Myanmar, Thailand and Vietnam পাঁচটি দেশ নিয়ে FAO ২০১৮ সালে একটি Regional Technical Cooperation Project (TCP) 'Support to Countries to address Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU) [TCP/RAS/3621]' গ্রহণ করে। এ TCP এর সহায়তায় International Plan of Action (IPOA)-IUU এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের জন্য আইইউইউ ফিসিং প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা 'National Plan of Action (NPOA)-IUU Fishing' -এর খসড়া উন্নয়ন এবং থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার 'National Plan of Action (NPOA)-IUU Fishing' হালনাগাদ করা হয়।

NPOA-IUU Fishing-এর খসড়া তৈরি করার জন্য FAO হতে এ কাজে অভিজ্ঞ একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি পরামর্শক সংস্থা Ocean Mind Limited নামক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। খসড়া প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজন সহযোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালে ০৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম কর্মশালা: বিগত ২১/১০/২০১৯ তারিখ মৎস্য ভবন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ব্লু ইকোনমি সেল, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌপুলিশ, বিআইডব্লিউটিএ, বিএফডিসি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, কোস্টট্রাস্ট, FAO, Ocean Mind Limited-এর এক্সপার্টসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, সংরক্ষণ, আহরণ ও ব্যবহার বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা নিয়ে Ocean Mind Limited-এর এক্সপার্টবৃন্দ পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। উপস্থিত বিশেজ্ঞগণ এ বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রদান করেন।

দ্বিতীয় কর্মশালা: বিগত ২২/১০/২০১৯ তারিখ চট্টগ্রামের হোটেল সেন্টমার্টিন, আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌপুলিশ, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ হোয়াইট ফিস ট্রলার ওনার্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম, মেকানাইজড বোট ওনার্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম এবং Ocean Mind Limited-এর এক্সপার্টসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় এবং পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় কর্মশালা: বিগত ২৪/১০/২০১৯ তারিখ মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, কাশীপুর, বরিশালে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌপুলিশ, মেকানাইজড বোট ওনার্স এসোসিয়েশন, স্থানীয় জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, Ocean Mind Limited-এর এক্সপার্টসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ: ০৪/১২/২০১৯ তারিখ মৎস্য ভবন, ঢাকায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল এর উপস্থিতিতে খসড়া NPOA-এর ওপর সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন সহযোগে একটি ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ব্লু ইকোনমি সেল, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌপুলিশ, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, FAO, Ocean Mind Limited-এর এক্সপার্টসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ-এ প্রাপ্ত মতামত সংযোজন করে NPOA-IUU Fishing এর খসড়া FAO দাখিল করে।

খসড়া NPOA-IUU Fishing-এ স্টেট রেসপন্সিবিলিটিস (৩০টি কর্মকৌশল), ফ্ল্যাগ স্টেট রেসপন্সিবিলিটিস (০৫টি কর্মকৌশল), কোস্টাল স্টেট রেসপন্সিবিলিটিস (৩০টি কর্মকৌশল), পোর্ট স্টেটস মেজারস (০৪টি কর্মকৌশল) এবং মার্কেট রিলেটেড মেজারস (০৬টি কর্মকৌশল)- এই পাঁচটি বিষয়ে ৪৫টি কর্মকৌশল (action) নির্ধারণ করা হয় এবং ২০২০ হতে ২০২৪ মোট ৫ বছরের মধ্যে এসব কর্মকৌশল বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রতি চার বছর পরপর এ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদের জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

স্টেট রেসপন্সিবিলিটিস (State Responsibilities)

১. এফএও পোর্ট স্টেটস মেজারস অ্যাগ্রিমেন্ট অনুমোদন;
২. এফএও কম্প্লায়েন্স অ্যাগ্রিমেন্ট অনুমোদন;
৩. ভলান্টারি গাইডলাইন্স ফর ফ্ল্যাগ স্টেট পারফরম্যান্স বাস্তবায়ন;
৪. ভলান্টারি গাইডলাইন্স ফর ক্যাচ ডকুমেন্টেশন স্কীম বাস্তবায়ন;
৫. গাইডলাইন্স টু রিডিউস সী টার্টল মর্টালিটি বাস্তবায়ন;
৬. ভলান্টারি গাইডলাইন্স ফর সিকিউরিং সাসটেইনেবল স্মল স্কেল ফিসারিজ বাস্তবায়ন;
৭. ভলান্টারি গাইডলাইন্স ফর মার্কেটিং অব ফিসিং গিয়ার বাস্তবায়ন;
৮. ভলান্টারি গাইডলাইন্স ফর বাই-ক্যাচ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিডাকশন অব ডিসকার্ডস বাস্তবায়ন;
৯. হালনাগাদকৃত জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতি অনুমোদন;
১০. ফিসিং রেগুলেশনের জন্য IUU এর নির্দিষ্ট পরিবর্তন;
১১. IUU ফিসিং নিয়ন্ত্রনের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPOA) অনুমোদন;
১২. শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত রুলস্ ও রেগুলেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;
১৩. ILO working in fishing convention No. 188 অনুমোদন;
১৪. মৎস্য নৌযানের Area Beyond National Juricrisdiction (ABNJ) এবং অন্যান্য দেশের EEZ এ অপারেশনের জন্য ফিসারিজ রেগুলেশনে সুযোগ রাখা;
১৫. বাংলাদেশের পতাকাবাহী সমস্ত জাহাজের মালিক এবং উপকারভোগী মালিকদের নিবন্ধন;
১৬. আঞ্চলিক অংশীদারদের সাথে IUU ফিসিং সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়ের জন্য বিদ্যমান পদ্ধতি অর্জন বা নতুন পদ্ধতি স্থাপন
১৭. আর্টিশানাল এবং বাণিজ্যিক ফিসিং জাহাজের সেকশনস মূল্যায়ন ও সংশোধন;

চিত্র: ০৪/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত Validation Workshop

১৮. IUU ফিসিং এর জাহাজ, অপারেশন এবং মালিকদের জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান বন্ধ করা;
১৯. ভিএমএস (Vessel Monitoring System) সেন্টার স্থাপন করা;
২০. সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ট্রলার বহরে ভিএমএস স্থাপন করা;
২১. মৎস্য পর্যবেক্ষক প্রোগ্রাম (Observer Scheme) প্রতিষ্ঠা
২২. সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিদর্শন সাইট স্থাপন;
২৩. অফিসিয়াল ল্যান্ডিং সাইট স্থাপন;
২৪. মেকানাইজড আর্টিসানাল বহরে ভিএমএস/এআইএস (Automatic Identification System) স্থাপন;
২৫. ফিসিং ক্যাচ অ্যান্ড ইফোর্টের জন্য ই-রিপোর্টিং সিস্টেম স্থাপন;
২৬. পিএসএমএ (Port State Measures Agreement) প্রশিক্ষণসহ এমসিএস (মনিটরিং, কন্ট্রোলিং এন্ড সার্ভেল্যান্স) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং;
২৭. জেএমসি (Joint Monitoring Center)-এর মাধ্যমে আন্তঃসংগঠন সমন্বয়ের আরও বিকাশ, তথ্য ভাগাভাগির জন্য নেটওয়ার্ক স্থাপন, ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য নিয়মিত কর্মশালা এবং যৌথ প্রশিক্ষণ অধিবেশন আয়োজন;
২৮. দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জন্য RPOA-IUU তৈরি;
২৯. প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ফিসারি ক্লোজারের (fishery closures)/মাছ আহরণ বন্ধ মৌসুমের সিঙ্ক্রোনাইজেশন; এবং
৩০. বাংলাদেশী জাহাজের IUU কালোতালিকা (Blacklist) প্রকাশনা।

ফ্ল্যাগ স্টেট রেসপন্সিবিলিটিস (Flag State Responsibilities)

৩১. ১৫ নেট টনের নিচে ফিসিং জাহাজগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য নিবন্ধকরণ বর্ধিতকরণ [অবশ্য

সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এ ১৫ নেট টন বা এর নিম্নে ফিসিং জাহাজগুলোকে নিবন্ধনের পরিবর্তে মৎস্য অধিদপ্তর হতে অনুমতি পত্রের সংস্থান রাখা হয়েছে;

৩২. আর্টিসানাল ফিসিং বহরের নিবন্ধন;

৩৩. আঞ্চলিক অংশীদার এবং RFMO-এর সাথে ফিসিং জাহাজের নিবন্ধকরণ এবং লাইসেন্স সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়;

৩৪. ফিসিং জাহাজ রেজিস্ট্রি প্রয়োজনীয়তার সাথে কমপ্ল্যায়েন্স বাড়ানো; এবং

৩৫. জাতীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে (outside waters of national jurisdiction) পরিচালিত জাহাজের জন্য IMO Number Scheme বাস্তবায়ন।

কোস্টাল স্টেট রেসপন্সিবিলিটিস (Coastal State Responsibilities)

উপকূলীয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব State Responsibilities এবং Flag State Responsibilities এর মধ্যে চলে এসেছে।

পোর্ট স্টেটস মেজারস (Port States Measures)

৩৬. AREPs (Advance Request to Enter Port) তদন্তে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৩৭. PSMA-এর অধীনে অনুমোদিত বন্দর নির্ধারণ;

৩৮. Port State পরিদর্শন পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

৩৯. Port State Measures ব্যবস্থাতে IOTC Resolution 16/11 বাস্তবায়ন।

মার্কেট রিলেটেড মেজারস (Market related Measures)

৪০. IUU মাছ এবং মাছের পণ্য আমদানি নিষিদ্ধকরণ;

৪১. FAO guidelines for catch documentation schemes বাস্তবায়ন;

৪২. ফিসিং ক্যাচ অ্যান্ড ইফোর্টস (Catch and Effort) জন্য ই-রিপোর্টিং (e-reporting) সিস্টেম স্থাপন;

৪৩. ইইউ বাজারে অ্যাক্সেসের জন্য আর্টিসানাল সেক্টরেরও ক্যাচ সার্টিফিকেট (Catch Certification) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ;

৪৪. রপ্তানি ও আমদানি বাজারের স্বচ্ছতা এবং ট্রেসিবিলিটি (Transparency and Traceability) উন্নয়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন; এবং

৪৫. IUU ফিসিংয়ের সাথে জড়িত বা সহায়তা করে এমন ব্যবসাকে জনসম্মুখে নিয়ে আসা।

বাংলাদেশে আইইউইউ ফিসিং নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ (Major Challenges)

- বিদেশি মৎস্য নৌযানের অনুপ্রবেশ;
- যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের নিবন্ধন ও লাইসেন্স;
- যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে দূর্বল ব্যবস্থাপনা;
- দুর্বল এমসিএস (মনিটরিং, কন্ট্রোলিং এন্ড সার্ভেল্যান্স) কার্যক্রম;
- ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকারক জাল ও সরঞ্জামের ব্যবহার;
- হালনাগাদ মৎস্যসম্পদের তথ্য ও জরিপ;
- নিয়মিত ক্যাচ ডকুমেন্টশন অথবা মাছ আহরণ তথ্য সংগ্রহ;
- মৎস্য অধিদপ্তরের স্বল্প লোকবল ও অপ্রতুল লজিস্টিক সাপোর্ট;
- লোকবল ও সক্ষমতার অভাব;
- অবজারভার স্টীমের অভাব;
- আইইউইউ ফিসিং নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন।

উপসংহার (Conclusion)

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইইউউ ফিসিং নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতিসংঘ ২০১৮ সাল হতে ৫ জুনকে আইইউইউ ফিসিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা করেছে (International Day for the Fight against IUU Fishing)। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অনুমোদিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অনেক অংশই এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। সম্প্রতি Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর IUU তালিকাভুক্ত দুটি ট্রলার এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন এবং পরবর্তীতে এদেশের ট্রলারবহরে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশিষ্টজনেরা ধারণা করছেন। এসব সুপার ট্রলার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মৎস্য আহরণ করলে অতিআহরণসহ মাছের মজুদ বিশেষত ইলিশ মাছের মজুদের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া BBC তাঁদের একটি লিখায় (link: https://www.bbc.com/news/world-asia-522277) আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে IUU তালিকাভুক্ত এসব জাহাজ বাংলাদেশে প্রতিস্থাপনের সুযোগ পেলে বাংলাদেশ পরবর্তীতে এ সকল জাহাজের একটি বাজারে পরিণত হবে। ফলে দেশের উদীয়মান সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বিকাশে শুরুতেই বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই আইইউইউ ফিসিং প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও এখাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা প্রয়োজন।

---

*উপপ্রধান (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর। ইমেইল: tanvir_h1998@yahoo.com)
**উপসচিব, মৎস্য-৪ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
***সহকারী পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাক্তন ফোকাল পয়েন্ট, এফএও টিসিপি আইইউইউ ফিসিং

জলাভূমি সম্পদের সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা
Community Based Co- Management of Wetland Resources

মোঃ আবুল হাসেম সুমন[১] ও মোঃ তৌহিদুর রহমান[২]

Abstract

Bangladesh is endowed with vast water resources. The wetlands or Jalmohals are natural ecosystems and each has multiple ecosystem components that collectively provide various benefits and services for sustaining a soothing natural environment as well as healthy economic, social and cultural environment for human. The seasonal expansions (flooding) and contractions (dry season) of floodplain enhance the productivity and biodiversity of wetlands and offer diverse opportunities for stakeholders to use and receive benefits from both types of production systems (seasonal aquatic and terrestrial systems). Wetlands in Bangladesh are thus not linear and static natural systems rather dynamic and multiple production systems upon which diverse social and occupational groups are directly and indirectly dependent for their wellness and livelihoods. Key conservation interventions at project level include formation of community based organizations (CBOs) comprising of local resourse users and all stakes, establishing wetland sanctuaries, restoring degraded /semi-degraded wetland habitats, swamp forests and riparian vegetations, observing locally accepted biodiversity conservation, proper management, alternative income generation efforts, wareness and capacity building of communities including arrangements for endowment fund at local level.

যে কোন সম্পদ যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার না করলে সময়ের ব্যবধানে তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। খুব সাধারণভাবে জল ধারণ করে যে ভূমি তাই জলাভূমি যা আমাদের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। জমি, জল, জলজ মাছ, অন্যান্য জলজ জীব আমাদের জলাভূমির অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এ সম্পদ জলাভূমির পার্শ্ববর্তী বা তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রকৃতির অকৃপণ দানে আমাদের দেশের জলাভূমি সমৃদ্ধ।

শুধুমাত্র মাছ নয়, জমিকে সুজলা সুফলা বা উর্বর রাখতে, ভূত্বককে ঠাণ্ডা রাখতে, ফসল উৎপাদনে সেচের পানি সরবরাহে, গৃহস্থালী ও শিল্পের কাজে জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকায় জলাভূমির ৩২ প্রকারের অবদান চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু উৎসস্থলের পরিবর্তন, অতিমাত্রায় পলিপতন, নাব্যতা বিনষ্ট, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে নদ নদী সহ সকল জলাভূমি তার বাস্তব অবস্থা হারাতে বসেছে। পাশাপাশি জলাভূমির তীরবর্তী সম্পদ ব্যবহারকারী কর্তৃক অতিআহরণ, ধ্বংসাত্মক আহরণ এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সোনাফলা এই জলাভূমির অপার সম্ভাবনাময় সম্পদ আজ বড়ই হুমকির সম্মুখীন। বাড়তি মানুষের পুষ্টিসহ জীবনের নানা চাহিদা মেটাতে জলাভূমি ও এর সম্পদ রক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন অতীব জরুরি। আবহমানকাল থেকে জনগণ বিনামূল্যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করে আসছে। এছাড়া সরকার রাজস্বের বিনিময়ে সম্পদ আহরণের জন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা দিয়ে থাকে। ইজারা গ্রহিতা তাৎক্ষণিক অতি লাভের আশায় জলাভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে না। এরূপ ব্যবস্থাপনায় জলাভূমি প্রতিবেশ অথবা এর সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত উদ্যোগ দেখা যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয় বহুল। তাৎক্ষণিকভাবে এর সুফল পাওয়া যায় না। অপরদিকে সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারকারীগণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজন বা লাভ-ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করে সম্পদের আংশিক বা সাময়িক উন্নয়ন করে থাকে। কিন্তু টেকসই ও সামগ্রিক উন্নয়নে আগ্রহী হয় না। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সাধিত হয় না। বাস্তবতা হল- সরকারের একার পক্ষে যেমন সম্পদের রক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব হয় না পক্ষান্তরে ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর একক প্রচেষ্টায় তা ভালভাবে সম্ভবও হয় না। প্রচলিত এই সরকারী ব্যবস্থাপনায় জলাভূমি ও এর প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্বশীলতা ও উন্নয়ন ব্যাহত হয়ে আসছে। প্রচলিত ব্যবস্থাপনা জলাভূমির স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য অনুকূল নয়। এ জন্য ভাল এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। দেশে ও বিদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নানা মডেল চর্চা হয়ে আসছে। যেমন-

১. প্রচলিত ব্যবস্থাপনা
২. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
৩. সহ-ব্যবস্থাপনা
৪. সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা

তন্মধ্যে এখন পর্যন্ত সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনন্য ভাল পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই, আমাদের জলাভূমির স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা জরুরি।

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা (Traditional Management)

প্রাকৃতিক সম্পদের শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাপনাই হল প্রচলিত ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাপনায় সম্পদের মালিক হিসেবে মূলত সরকারই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। এক্ষেত্রে সম্পদ ব্যবহারকারী স্থানীয় ব্যক্তি বা সমাজের দায় দায়িত্ব বা কার্যকর অংশগ্রহণ তেমন একটা থাকে না। আমাদের দেশের প্রচলিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Community Based Management)

যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ বা জলাশয় কেন্দ্রিক ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী বা সমাজ দ্বারা যে ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে তাই সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। এখানে সমাজ বলতে সাধারণত: সম্পদ সংলগ্ন এবং সম্পদের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠনকে সমাজভিত্তিক সংগঠন বলা হয়। এতুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটিকে ব্যবস্থাপনা কমিটি বলা হয়। সত্যিকারের সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সম্পদ কেন্দ্রিক সমাজের লোকেরাই ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পুঁজি সংগ্রহ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সমাজভিত্তিক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনার সুফল বা কুফল অথবা লাভ বা ক্ষতি তারাই সুষমভাবে বন্টন ও ভোগ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠনের উচ্চকণ্ঠ থাকে। সাধারণত: কমন প্রপার্টি বা কোন সুনির্দ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্ধারিত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বেশ সফল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে সরকার অথবা অন্যান্য অংশীজনের কোন মুখ্য ভূমিকা থাকে না।

সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-Management)

সম্পদ ব্যবহারকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা হল সহ-ব্যবস্থাপনা। অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা/ স্বত্ব প্রধানত সরকারের কিন্তু সম্পদ ব্যবহার বা ভোগ করে স্থানীয় জনগণ। তাই সরকারের একার পক্ষে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার জন্য রাজনৈতিক ও স্থানীয় নেতৃত্বের প্রভাব বলয়কে উপেক্ষা করা যুক্তিসংগত নয়। তাই, টেকসই ও সফল ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও সমন্বয় জরুরি। এক্ষেত্রে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করলে সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও উন্নয়ন সম্ভব হয়। অতএব, সংক্ষেপে সরকার ও সম্পদ ব্যবহাকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগিই হল সহ-ব্যবস্থাপনা। বিস্তারিতভাবে সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি বিভাগ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত ব্যবস্থাপনাকে সহ-ব্যবস্থাপনা বলা হয়। এককেন্দ্রিক সরকারি ব্যবস্থাপনা ও সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার দুর্বল দিকগুলি উত্তরণের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্ভব। সহ-ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত সংস্করণ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। অতএব, সহ-ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সকলেই জড়িত থাকে। এক কথায় সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত প্রয়াস। তবে, ব্যবস্থাপনার প্রত্যক্ষ সুফল সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীরাই সুষমভাবে ভোগ করে থাকে। ইদানিং গবেষক ও উন্নয়ন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে জলাভূমির টেকসই উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিই অত্যন্তনীয় ও সম্ভাবনাময় হিসেবে পরিগণিত।

সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা (Community Based Co-Management)

সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও সহ-ব্যবস্থাপনার মধ্যে নানা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। যখন সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সহ-ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে তখন তাকে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা বলে। সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সাধারণত: ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ, আয়োজন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর বা সমাজভিত্তিক সংগঠন দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পদ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভাগ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের সহযোগিতার বিষয়টি খুবই জরুরি। সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্ভব। এটি মূলত সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পদ সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি বিভাগ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও অন্যান্য অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে যে ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে তার নাম সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা।

চিত্র: সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের অংশগ্রহণে জলাশয় উন্নয়ন

চিত্র: সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার জলাশয়ে বিশ্ব প্রজাতির মাছ অবমুক্তকরণ

সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ (Major Steps of Community Based Co-Management System)

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, দপ্তর সহযোগী সংগঠনসমূহ সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করবে। এ জন্য ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ,তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রথম কাজ। অতঃপর জনগোষ্ঠীর সংগঠন/সিবিও গঠন। সিবিও এর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সামর্থ্য ও দক্ষতা উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সিবিও সদস্য ও তহবিল সংগ্রহ করবে, নিয়মিত সভা ও আর্থিক রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে সাংগঠনিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে। অতঃপর সিবিও জলাশয়ের অবস্থা ও সমস্যা চিহ্নিত করবে। অতঃপর জলাশয়ের অবস্থানুযায়ী অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহ-ব্যবস্থাপনার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ পর্যায়ে সরকারী আইনের পাশাপাশি সিবিও স্থানীয় রীতিনীতি, প্রথা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে। সরকার ও সহযোগী সংস্থা এ সব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রকৃতপক্ষে সিবিও সামর্থ্য উন্নয়নের ওপরই সহ-ব্যবস্থাপনার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

চিত্র: সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার ধাপ ও পদ্ধতি

সমাজভিত্তিক সংগঠন, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন (Community Based Organization, Skill Development and Empowerment)

সমাজভিত্তিক সংগঠন: একটি নির্দিষ্ট জলাশয়কেন্দ্রিক সমাজভিত্তিক সংগঠন সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সহ-ব্যবস্থপনার সফলতার জন্য একটি কার্যকর ও গতিশীল সমাজভিত্তিক সংগঠনের কোন বিকল্প নেই। অনেক শ্রেণি ও পেশার জনগোষ্ঠী জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও এর সুফল ভোগ করে। ফলে এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠন ও সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা যায়। সমাজভিত্তিক সংগঠন বলতে অতীতে একটি নির্দিষ্ট পেশা/শ্রেণি বা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে ধারণা করা হলেও বর্তমানে এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট সম্পদকে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ এবং ঐ সম্পদের ওপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল নানা পেশা, শ্রেণি, বয়স ও লিঙ্গভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমন্বিত সংগঠনকে সমাজভিত্তিক সংগঠন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন: যে কোন কাজে সফলতা লাভ করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন পূর্বশর্ত। সফল ব্যবস্থাপনার জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠনের আর্থিক ও জলাশয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। এ জন্য সহ-ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণ এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা জরুরি। সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা ও যোগ্যতা উন্নয়নের ওপরই এ ব্যবস্থাপনার সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার জনগণের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

ক্ষমতায়ন (Empowerment)

ক্ষমতা বলতে কোন কাজ করার আইনগত কর্তৃত্ব এবং অধিকার বুঝায়। সাধারণ ব্যবস্থাপনায় সকল আইনগত কর্তৃত্ব সরকার বা তার প্রতিনিধিদের নিকট ন্যস্ত থাকায় উন্নয়ন সহযোগী ও সুফলভোগী উন্নয়ন কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। কাজেই সফলভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতায়ন অপরিহার্য উপাদান। মূলত জলাভূমি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের ওপর সহ-ব্যবস্থাপনার সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা দলের সক্রিয় সদস্য হতে পারে। আর অধিকার সচেতন হলে অধিকতর দায়িত্বশীল হতে পারে। এর ফলে সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়ন হয় এবং জলসম্পদের টেকসই উৎপাদন ও উন্নয়ন সম্ভব হয়।

মহিলাদের অংশগ্রহণ: দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। তাই তাদের বাদ দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই কাংখিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

চিত্র: সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনায় জলাশয় উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা, প্রশাসনিক কার্যক্রম, বিচার, আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষা, ব্যবসা, সামরিক, শিল্প ও কল-কারখানা, কৃষি, চিকিৎসা, অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই কৃতকার্যতার সাথে মহিলাদের অংশগ্রহণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন প্রকল্প বা সংগঠনে মহিলা সদস্যভুক্তি ও কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান জরুরি। তাই সংগঠনের কার্যকরী কমিটিসহ সকল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

নেতৃত্বের বিকাশ ও দ্বন্দ্ব নিরসন: নেতা বিহীন সমাজ হাল ছাড়া নৌকার মত উন্নয়নের বেড়াজালে ক্রমাগতভাবে আবর্তিত হয়ে থাকে। ভাল সংগঠন এবং ভাল নেতৃত্ব ছাড়া সহ-ব্যবস্থাপনা সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব বিকাশের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের সুফল একাধিক শ্রেণি, পেশার জনগোষ্ঠী ভোগ করে থাকে। ফলে প্রত্যেক শ্রেণি, পেশার মানুষের মধ্যে সুফল লাভের দ্বন্দ্ব সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে প্রতিহত করে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের প্রত্যেক শ্রেণি ও পেশার মানুষের সর্বোচ্চ সুফল লাভের জন্য শ্রেণি স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। সিবিও কে দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধান ও তা নিরসন কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

চিত্র: সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনায় গ্রুপ মোবিলাইজেশন

সিবিও নেটওয়ার্কিং: জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন অত্যন্ত কার্যকর। অন্য কোথাও এ ধরনের সিবিও থাকলে তথ্য, মতামত ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সিবিও সমূহ উদ্বুদ্ধ ও সুসংগঠিত হতে পারে। পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে সিবিওসমূহের ফেডারেশন গঠিত হতে পারে। ফেডারেশন কমুনিটি, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সামাজিক সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অন্তরায় ও উত্তরণের উপায় (Obstacles to Community Based Co-Management Implementation and Ways to Overcome)

সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অন্তরায় ও উত্তরণের উপায় নিম্নের ছকে দেখানো হলো-

ক্রমিক	অন্তরায়	উপায়
১.	সরকারী জলাশয়ের মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের এবং কর্তৃপক্ষের প্রচলিত ইজারা প্রথা ও ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী।	জলমহাল ইজারা নীতিমালা জৈব ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
২.	স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাব/দৃষ্টিভঙ্গী সহ-ব্যবস্থাপনা অনুকূল নয়।	স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়ন।
৩.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সেক্টরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।	আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ ও সম্পর্কোন্নয়ন, নিয়মিত সভা এবং সমন্বয়োতা আরক।
৪.	সংশ্লিষ্ট দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব।	সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে যোগাযোগ ও সম্পর্কোন্নয়ন সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অবহিতকরণ।
৫.	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নতার কারণে প্রকৃত ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী উপেক্ষিত হয়।	পুঁজি, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সুসংহতকরণ, যোগাযোগ ও সম্পর্কোন্নয়ন।
৬.	জলাভূমি ব্যবহার ও ফসল অধিকারের কারণে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সহ-ব্যবস্থাপনা সফলতার অন্যতম প্রধান অন্তরায়।	সহ-ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
৭.	পরিবেশ, প্রতিবেশ, সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

উপসংহার (Conclusion)

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা অনন্য সম্ভাবনাময় মডেল। এটি চাপিয়ে দেয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষ, স্টেকহোল্ডার ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দায়িত্বশীল আচরণ ও দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে জলাভূমির টেকসই উৎপাদন ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, জলাভূমি/সম্পদের উপকার সুষম বন্টন, সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয়। তাত্ত্বিকভাবে এ ব্যবস্থাপনা চমৎকার হলেও আমাদের দেশের আবহমান কালের প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও ব্যবস্থাপনার বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে সহ-ব্যবস্থাপনায় সফল হওয়া অত্যন্ত দুরুহ কাজ। তদুপরি, আমাদের দেশে কোথাও কোথাও এ উদ্যোগ সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের বিশাল জলাভূমির ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন সুফল বয়ে আনতে পারে। এ জন্য জলাভূমির ওপর প্রকৃত নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার ও সত্যিকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। এ জন্য সরকারের সকল প্রকার ও সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

[১]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর এবং Adjunct Faculty, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (ইমেইল: hashemsumon@yahoo.com)
[২]উপপ্রধান (অবসরপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর এবং Adjunct Faculty, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ক্ষুদ্রচাষি ক্লাস্টার : নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে টেকসই উদ্যোগ

Small-Scale Farmer's Cluster : Transitioning to Safe and Sustainable Shrimp Production

সরোজ কুমার মিস্ত্রী[১] ও মনিষ কুমার মণ্ডল[২]

Abstract

The soil, water and weather of the south and southwest coastal areas of Bangladesh are very suitable for shrimp production and have vast potentiality. About 0.5 million people of coastal area are directly engaged in shrimp farming for their livelihood. The contribution of shrimp farming to the agricultural economy is very important. Despite the immense potentiality, the sub sector could not expand as it's expectation due to the infrastructure, quality seed and feed, appropriate technology and skilled manpower, disease outbreak, climate change etc. Through expansion of modern eco-friendly technology and development of necessary infrastructure and creation of facilities, it is possible to earn more than Tk hundred billion foreign exchange by increasing the production. Long experience at the field level has shown that small-scale farmers cluster farming could double the production of shrimp. Not only that, the shrimp produced in this practice is safe and healthy as it is free from biological and chemical pollution. The implementation of the technology could increase the income of farmers, reduced the cost of production and incidence of diseases risk. The technology is capable of increasing eco-friendly, sustainable and safe shrimp production. If the technology is widely expanded in the shrimp farming areas of the country, it can solve the existing problem of shrimp farming and possibly double the production.

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত রয়েছে। এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে চিংড়ির অবদান অন্যতম। অমিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ, দুর্বল অবকাঠামো, বিভিন্ন রোগবালাইয়ের সংক্রমণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে বিগত এক দশক ধরে চিংড়ি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। অথচ উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি, পানি ও আবহাওয়া চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় আধুনিক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সেক্টরের উৎপাদন বাড়িয়ে ১০ হাজার কোটি টাকারও অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চিংড়িচাষিদের নিয়ে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করে উৎপাদন দ্বিগুনেরও বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয় এ প্রযুক্তিতে উৎপাদিত চিংড়ি জৈবিক ও রাসায়নিক দূষণমুক্ত হওয়ায় শতভাগ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে চাষির আয় বেড়েছে, উৎপাদন খরচ কমেছে, রোগ বালাইয়ের সংক্রমণ হ্রাস ও চাষের ঝুঁকি কমেছে। চাষিরা দলগতভাবে কাজ করায় নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, চাষির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তিটি পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম। প্রযুক্তিটি দেশের চিংড়ি চাষ অঞ্চলে ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হলে বর্তমান উৎপাদন দ্বিগুন করা সম্ভব হবে।

ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ধারণা (The concept of shrimp farming in cluster)

ক্লাস্টার ভিত্তিক চিংড়ি চাষ: এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি চিংড়িচাষিদের সংগঠিত করে একই অঞ্চল ও পরিবেশে পরস্পর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অভিন্ন স্বার্থে যৌথ উদ্যোগে সমষ্টিগতভাবে চিংড়ি চাষ। ক্লাস্টারের খামারসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য:

- একই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ বা অবকাঠামোর ব্যবহার, যেমন- পানির উৎস, বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা ইত্যাদি;
- একই বা কাছাকাছি চিংড়ি চাষ বিশেষত পোনা মজুদ, পরিচর্যা, আহরণ ও বিপণনে একই পদ্ধতির অনুসরণ;
- একই প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি চাষ বা মিশ্রচাষ; এবং
- উদ্যোগী বা অভিন্ন স্বার্থে সংগঠিত দল।

ক্লাস্টার এমন একটি সংগঠন যা একটি নির্দিষ্ট এলাকার চিংড়ি/মাছ চাষিদের নিয়ে গঠিত হয় এবং সদস্যগণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমন্বিত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করে। ক্লাস্টার পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি চাষের জলাশয় অবশ্যই পাশাপাশি অবস্থিত হতে হবে।

ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের সুবিধা (Advantages of shrimp farming in cluster)

- বর্তমান চাষ পদ্ধতিতে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা থেকে সম্মিলিতভাবে উত্তরণের উপায় বের করা যায়;
- চিংড়ি চাষে পানির উৎস ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সহজতর ও সাশ্রয়ী হয়;
- কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়;
- জৈব নিরাপত্তা প্রতিপালনের মাধ্যমে রোগবালাই প্রতিরোধ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়;
- সম্মিলিতভাবে গুণগত মানসম্পন্ন উৎপাদন সামগ্রী সংগ্রহ করা যায় এবং উৎপাদন খরচ কমানো যায়;

- উৎপাদিত পণ্যের গুণমান নিশ্চিতকরণ সহজতর হয়;
- উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে অধিক সুবিধার পাশাপাশি যথার্থ মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়;
- ক্লাস্টার ফার্মিং এর আওতায় সংগঠিত চাষি দলের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়;
- ক্লাস্টারভিত্তিক সার্টিফিকেশনের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে পণ্যের উচ্চ মূল্য নিশ্চিত হয়; এবং
- সর্বোপরি সফল চাষি হিসেবে নিজেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্রমবিকাশ (Development of shrimp farming in cluster)

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ২০০০ সালের পর হতে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ক্লাস্টার পদ্ধতি নিয়ে কাজ করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের এসটিডিএফ (এফএও এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এবং ওয়ার্ল্ডফিস ও বাংলাদেশ শ্রিম্প অ্যান্ড ফিস ফাউন্ডেশনের সহায়তায়) প্রকল্পের মাধ্যমে। এছাড়া পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ শ্রিম্প অ্যান্ড ফিস ফাউন্ডেশন, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া, উইনরক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের ডিজাইন অনুযায়ী বেশ কিছু ক্লাস্টার বাস্তবায়ন করছে। এসটিডিএফ পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার ১০০০ জন চাষিকে ৪০টি ক্লাস্টারে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভ্যালু চেইন

চিত্র: ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে মজুদকরণ

সংক্ষিপ্তকরণ বিষয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন উদ্যোগের আওতায় বেশ কিছু ক্লাস্টার গঠন করা হয়। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের বড়ভাঙ্গা মডেল সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার বারুইকাঠি গ্রামে সৃষ্টি হয়েছে আরো একটি ক্লাস্টার। ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পে আওতায় ৩০০টি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে।

চিত্র: ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ

ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ফলাফল (Results of shrimp farming in cluster)

এসটিডিএফ পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০টি ক্লাস্টার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষিদের একত্রিত করে গুড অ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস ও ফুড সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদনের কলাকৌশল শেখানো হয়। ঘেরের জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখতে চারপাশে ঘন নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। গরু-ছাগলসহ অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণীর প্রবেশ বন্ধ করা হয়। ঘেরে গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করা হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ও নিবিড় তদারকির ফলে ১ম বছর শেষে উৎপাদন ৭২% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন উদ্যোগে বাস্তবায়িত বড়ভাঙ্গা মডেল ক্লাস্টারের ফলাফল আরও আশাব্যঞ্জক। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বড়ভাঙ্গা গ্রামের চাষিরা বিগত ১০-১২ বছর যাবৎ চিংড়ি চাষ করে আসছেন। প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে তাঁদের উৎপাদন ছিল একেবারেই কম। হেক্টর প্রতি গড়ে গলদা চিংড়ি ৪৬০ কেজি, বাগদা চিংড়ি ২৫০ কেজি এবং কার্প জাতীয় মাছ ৬৩০ কেজি। রোগবালাইয়ের সংক্রমণের কারণে প্রতিবছর ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো। ফলে উৎপাদন খরচ হতো বেশি, লাভ কম (হেক্টর প্রতি ২.০-২.৫ লক্ষ টাকা)। অনেক সময়

চিত্র: ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে উত্তম অনুশীলন

চিত্র: চিংড়ি আহরণ

লোকসানও হতো। ফলে অনেক চাষিরা চিংড়ি চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। চিংড়ি চাষের এ সংকটময় মুহূর্তে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ডুমুরিয়া উপজেলা মৎস্য দপ্তর একটি ইনোভেশন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বড়ডাঙ্গা গ্রামের চিংড়ি চাষি সুজিত মণ্ডলসহ আরও ৫ জন চাষির ৫টি ঘের (আয়তন ১.২ হেক্টর) নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠন করে এবং উন্নত সনাতন পদ্ধতির চিংড়ি চাষ শুরু করা হয়। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে চারটি মৌলিক বিষয় অনুসরণ করা হয়: (ক) ঘেরের পানির গভীরতা বাড়িয়ে কমপক্ষে ৩ ফুট রাখা; (খ) ঘেরে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পিএল মজুদ; (গ) ঘেরে পরিকল্পিত নার্সারি স্থাপন এবং (ঘ) নিয়মিতভাবে গুণগত মানসম্পন্ন সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়। চাষিদের গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস (জিএপি) ও ফুড সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ফলে তাঁদের উৎপাদন বেড়ে যায় দ্বিগুণেরও বেশি। ফলে এ পদ্ধতির চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে ঐ অঞ্চলের চাষিদের। এ সময় ২৫ জন চাষি নিয়ে আরো একটি ক্লাস্টার গঠন করা হয়। পরবর্তীতে চাষির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে এসটিডিএফ প্রকল্পের সহায়তায় ২টি ক্লাস্টারে ৫০জন চাষিকে দলগত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায় করা হয়। জিএপি, ফুড সেফটি বাস্তবায়ন, পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিবিড় তদারকি, যথাযথ পরামর্শ প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নিয়মিত মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, গুণগতমান সম্পন্ন উপকরণ ব্যবহারে সহায়তা, তথ্য সংরক্ষণ, ট্রেসিবিলিটি মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এসব ঘেরে গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা বা কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার বন্ধ করা হয়। চাষিরা স্বউদ্যোগে গুণগত মানসম্মত সম্পূরক খাদ্য উৎপাদন করে তাঁদের ঘেরে ব্যবহার করেন। মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির এ পদ্ধতিও চাষিদের হাতে-কলমে শেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে উৎপাদিত গুণগত মানসম্মত সম্পূরক খাদ্য চাষিরা নিজেদের খামারে ব্যবহারের পাশাপাশি আশেপাশের চাষিদের সরবরাহ করছেন। এতে করে একদিকে আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং অন্যদিকে খাদ্যের গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব হয়। এছাড়া কোনো ধরনের কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদনের পাশাপাশি ঘেরের পাড়ে লাউ, কুমড়া, টমেটো, সিম, বেগুন, আলু, ঢেড়স ইত্যাদি সবজিও উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ঐ ক্লাস্টারের ২২৮ জন চাষি (তন্মধ্যে ৬০ জন মহিলা) ৩৭৮টি ঘেরের ৭৫ হেক্টর জলাশয়ে এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে লাভবান হচ্ছেন। প্রযুক্তিটি অনুসরণের ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষুদ্র চাষিদের গলদা চিংড়ি উৎপাদন হেক্টর প্রতি গড়ে ৪৬০ থেকে ৯৮০ কেজি, বাগদা চিংড়ি ২৫০ থেকে ৫৩২ কেজি এবং কার্প জাতীয় মাছ ৬৩০ থেকে ৯৭০ কেজিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। চাষির জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে। প্রযুক্তিটি অনুসরণের ফলে ২২৮ জন চাষি স্বাবলম্বী হয়েছে। চাষির ঘেরে জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখা ও দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। উৎপাদিত চিংড়ি মৎস্য অধিদপ্তরের খুলনাস্থ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে কোন ধরণের দূষণ পাওয়া যায়নি। ফলে এখানে উৎপাদিত চিংড়ি শতভাগ নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। দলগত সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করায় স্থায়িত্বশীল সামাজিক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে (বড়ডাঙ্গা চিংড়ি চাষ সমবায় সমিতি লি.) এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। এ মডেলের অনুসরণে উপজেলার বারুইকাঠি গ্রামে গড়ে উঠেছে আরো একটি মডেল ক্লাস্টার। শুধু তাই নয় ডুমুরিয়া উপজেলার আরো ৮০০ জন চাষি এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেছেন।

ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future prospects of shrimp farming in cluster)

দেশের চিংড়ি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বিগত এক দশক ধরে চিংড়ি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে কাঁচামাল সংকট অনুভূত হচ্ছে। বর্তমানে যে চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে তা দিয়ে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোর ১৫-২০% কাঁচামালের যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে। চিংড়ি শিল্পের এই সংকটময় অবস্থা কাটিয়ে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর ধরে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হেক্টর প্রতি গড়ে ১২০০-১৫০০ কেজি উৎপাদন পাওয়া গেছে। প্রযুক্তিটি চাষিরা সহজে গ্রহণ করতে পেরেছে এবং এটি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব। বর্তমানে চাষ এলাকা না বাড়িয়ে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন মাঠ পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ যা চাষিরা সহজে গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র চাষি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নন। তাঁদের কথা চিন্তা করে চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ধীরে ধীরে চিংড়ি সেক্টরে চাষিবান্ধব

চিংড়ি চাষের প্রস্তাবিত অবস্থা

প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হলে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লাভ করা যাবে। বর্তমানে আমাদের দেশে ১৯১৯৬৪ হেক্টর জমিতে বাগদা এবং ৭১০৬২ হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ ঘের (৯৯.৭%) উন্নত সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ অনুসরণ করায় হেক্টর প্রতি বাগদা চিংড়ির গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি সেক্টরের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে বিদ্যমান চাষ এলাকার মাত্র ২০% ক্লাস্টার পদ্ধতিতে এবং মাত্র ১০% আধা-নিবিড় প্রযুক্তির চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হলে চিংড়ি উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে প্রচলিত উন্নত সনাতন পদ্ধতির ১৯১১৩৯ হেক্টর জমিতে (গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩২৫ কেজি হিসেবে) ৬২১২০ মে.টন এবং ৮২৫ হেক্টর জমিতে আধা-নিবিড় পদ্ধতির (গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪.০০ মে.টন হিসেবে) চাষাবাদে ৩৩০০ মে.টন সর্বমোট ৬৫৪২০ মে.টন বাগদা চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে। চিংড়ি চাষের স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যদি ২০% এলাকা অর্থাৎ ৩৮৩৯৩ হেক্টর জমিতে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় তাহলে উৎপাদন দাঁড়াবে (গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১২০০ কেজি হিসেবে) ৪৬০৭১ মে.টন। ১০% এলাকা

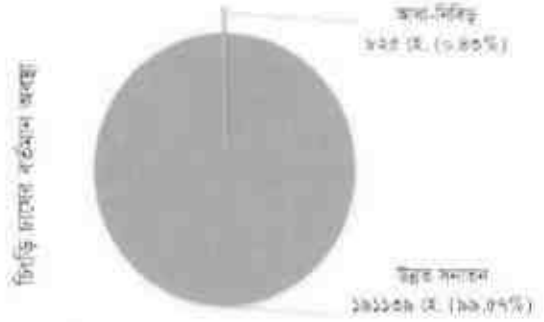

অর্থাৎ ১৯১৯৬ হেক্টর জমিতে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে উন্নীত করতে পারলে উৎপাদন হবে (গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫.০ মে.টন হিসেবে) ৯৫৯৮২ মে.টন এবং অবশিষ্ট ৭০% এলাকা অর্থাৎ ১৩৪৩৭৫ হেক্টর জমিতে প্রচলিত উন্নত সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদে উৎপাদন (গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩৫০ কেজি হিসেবে) দাঁড়াবে ৪৭০৩১ মে.টন। সর্বমোট বাগদা চিংড়ি উৎপাদন হবে ১৮৯০৮৪ মে.টন এবং গলদাসহ চিংড়ি মোট উৎপাদন হবে ২৪১২৮১ মে.টন যা বর্তমান উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ।

শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, চিংড়ি রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে হলে ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি সরবরাহ, ব্রান্ডিং, ই-ট্রেসিবিলিটি, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি বাস্তবায়নে ক্লাস্টার ফার্মিং একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি ক্লাস্টার গঠন ও ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব ক্লাস্টারের ফলাফল দেখে অন্য চাষিরাও স্বউদ্যোগে ক্লাস্টার গঠনে উৎসাহিত হবেন এবং চিংড়ি সেক্টরে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, এটাই প্রত্যাশা।

ক্লাস্টার বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges in cluster implementation)

ক্লাস্টার নির্বাচন: ক্লাস্টারের সফলতা ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ক্লাস্টার নির্বাচনের ওপর। ক্লাস্টার নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্লাস্টার চাষি। সমস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমমনা ও উদ্যোমী চাষি নির্বাচন খুবই জরুরি। চাষি নির্বাচনে ভুল হলে ক্লাস্টার বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন চাষি ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত থাকলে ক্লাস্টারের সকল কার্যক্রমকে নষ্ট করে দিতে পারে। এছাড়া ঘেরের অবস্থান, চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগিতা, ঘেরের আয়তন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ এসকল বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। পানির উৎস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্লাস্টার ঘেরে পানি উঠানো ও নামানোর জন্য উপযুক্ত পানির উৎস খাল/নদী থাকতে হবে।

চিত্র: ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ি প্রদর্শন

ক্লাস্টার পরিচালনা: ক্লাস্টার গঠনের পরবর্তী ধাপ হলো সঠিক নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে ক্লাস্টার পরিচালনা করা। নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি না হলে সংগঠন স্থায়িত্বশীল হতে পারে না। এজন্য যিনি ক্লাস্টারে নেতৃত্ব দিবেন তিনি সৎ, যোগ্য, দায়িত্বপরায়ণ এবং সকলের প্রতি সমআচরণশীল হবেন। অন্যান্য সদস্যগণও নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হবেন। ক্লাস্টার পরিচালনায় চাষিদের আন্তরিক আগ্রহ থাকতে হবে।

প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী করা: চাষিরা নিজস্ব ধারণা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায় নতুন প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবেও চাষিরা সঠিক নিয়মে চাষাবাদ করতে পারেন না।

নিরাপদ মৎস্য খাদ্য উৎপাদন: বর্তমান সময়ে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেমন একটি চ্যালেঞ্জ তার চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অনেক সময় চাষি বুঝে না বুঝে অধিক উৎপাদনের লোভে প্ররোচিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধপত্র ঘেরে ব্যবহার হয়ে থাকেন যা রাসায়নিক দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া খাদ্য দূষণ সম্পর্কে চাষিদের পরিষ্কার ধারণা না থাকায় নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ঘেরে পানি সরবরাহ: আমাদের দেশের অধিকাংশ ঘেরগুলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি হওয়ায় সময়মতো ঘেরে পানি ওঠানো ও নামানো যায় না। ফলে পানির অভাবে সময়মতো পিএল মজুদ করা যায় না এবং বৃষ্টি বা জোয়ারের সময় অতিবৃষ্টিতে ঘেরগুলো তলিয়ে যেতে দেখা যায়। প্রতিটি ঘেরে পানি ওঠানো এবং নামানোর জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা না থাকায় ইউনিট প্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। এজন্য নির্দিষ্ট এলাকাকে চিংড়ি চাষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় খাল খনন, রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে চাষিদের চিংড়ি চাষে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

রোগমুক্ত পোনা ও অন্যান্য উপকরণ: বর্তমানে এসপিএফ পিএল উৎপাদনের লক্ষ্যে আমাদের দেশে তিনটি হ্যাচারি কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে এসসিএমএফপি প্রকল্পের সহায়তায় এসপিএফ হ্যাচারির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। ভালো উৎপাদন পেতে হলে সময়মতো এসপিএফ পিএল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া খাদ্য, প্রোবায়োটিকসহ চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক চাষি চিংড়ি চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা: আমাদের দেশে দীর্ঘ ভ্যালু চেইন এবং অপরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থার কারণে চিংড়ির গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে চাষিগণ তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ট্রেসিবিলিটি বাস্তবায়ন: আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে হলে ট্রেসিবিলিটি আধুনিকায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। তাছাড়া ক্রেতার চাহিদানুযায়ী পণ্যের ব্রান্ডিং সৃষ্টি, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হলেও তা অতীব জরুরি।

ক্লাস্টার কার্যক্রম টেকসইকরণ: ক্লাস্টার কার্যক্রম টেকসই করা খুবই কঠিন কাজ। এজন্য ক্লাস্টারকে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ক্লাস্টারের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বাবলম্বী ও আর্থিকভাবে লাভবান হতে না পারলে ক্লাস্টারের প্রতি চাষিদের আগ্রহ কমে যাবে। সর্বোপরি স্টেকহোল্ডারগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল মৎস্য সম্পদে ভরপুর ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এ অঞ্চলের লবণ পানিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অর্থনীতিতে নতুনমাত্রা যোগ হতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় আমাদের দেশের উৎপাদনশীলতা অনেক কম। আমাদের সম্পদ আছে, প্রযুক্তি আছে। প্রয়োজন সেটি প্রয়োগ করা। ক্লাস্টার গঠনের মাধ্যমে প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষিদের একত্রিত ও সংগঠিত করে প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদে আগ্রহী করতে পারলে জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। চাষির উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। চিংড়ি চাষে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে চিংড়ি চাষের টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সেই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র চাষি ক্লাস্টার উদ্যোগটি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

[১]উপপ্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর (ইমেইল: dpdscmfpkln@gmail.com)
[২]উপপ্রকল্প পরিচালক (ফিন্যান্স), সাসটেইনেবল কোস্টাল এ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর

মেটাজিনোমিক্স : অ্যাকুয়াকালচার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি উদীয়মান প্রযুক্তি

Metagenomics : An Emerging Tool for Health Management in Aquaculture

নুসরাত জাহান পুনম[১], শাওন আহম্মেদ[২] ও ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান[৩]

Abstract

Metagenomics is a promising scientific tool that contributes to the understanding of complex genomics of the microbial community. In the last decade, the use of metagenomics in aquaculture to analyze the microbial diversity, functions and contributions in disease formation in the culture system was not usual. Recently, the potential use of metagenomics has been increased in aquaculture. Information on the microbial community and their role in the aquatic system, novel antibiotic-resistant genes in microbes, the disease-causing organism could play a vital role to resolve the health issues in aquaculture. Newly introduced bioinformatics tools on metagenomic analysis could make it easier to collect novel information from the genome of targeted microbes. Aquatic Animal Health Group of the Department of Fisheries, University of Dhaka took some steps to gather knowledge on the gut and gill microbial community of farmed tilapia (*Oreochromis niloticus*) through a metagenomics approach. Finally, the fast-growing application of metagenomics in the pathogen identification of an aquaculture system may be able to answer the questions of proper health management.

আমাদের পরিবেশের সর্বত্র অণুজীবের (microbs) অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে অনেকেই কার্বন চক্র (carbon cycling), নাইট্রোজেন চক্র (nitrogen cycling) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক বিষয়াদির সাথে জড়িত থাকা ছাড়াও বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। মেটাজিনোমিক্স হল এমন একটি আধুনিক শক্তিশালী কৌশল (tool) যার সাহায্যে সামগ্রিকভাবে কোন নমুনাতে থাকা অণুজীবের সমগ্র সম্প্রদায়ের ডিএনএ (DNA) এর উপর ভিত্তি করে ঐ নমুনাতে উপস্থিত অণুজীবের প্রজাতির সনাক্তকরণ, তাদের কার্যকারী ভূমিকা এবং মেটাবলিক ক্রিয়ার উপর আলোকপাত করা যায়। ইংরেজীতে মেটাজিনোমিক্স (Metagenomics) শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো Meta means beyond, that actually defines 'beyond the simple genome study'. এই প্রযুক্তিটির আবির্ভাব গত দশকে এবং অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল একটি প্রযুক্তি হিসেবে এরই মধ্যে অ্যাকোয়াকালচারে বিভিন্ন জটিল হোস্ট (host) - মাইক্রোবায়োটা (microbiota) - প্যাথোজেন (pathogen) – পরিবেশ (environment) সম্পর্কিত রোগের প্রাদুর্ভাব বিশ্লেষণে, চাষকৃত প্রাণীদের মধ্যে অণুজীবের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণে, বিভিন্ন পরিবেশগত পরিবর্তনে অণুজীবদের বৈচিত্র্যের গতিবিধি অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

মেটাজিনোমিক্স নির্ভর গবেষণার ক্ষেত্র সমূহ (Research areas of metagenomics)

মেটাজিনোমিক্স এর গবেষণাকে দুইটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায় : প্রথমটি পরিবেশগত একক জিন জরিপ (Environmental single-gene survey) এবং দ্বিতীয়টি রেনডম শটগান অধ্যয়ন (Random shotgun study)। প্রথমক্ষেত্রে, কোন একটি নির্দিষ্ট একক জীনের উপর ভিত্তি করে অণুজীবের বৈচিত্র্যের উপর অধ্যয়ন করা হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, রেনডম শটগানে সমস্ত জীনের উপর ভিত্তি করে অণুজীবের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট নমুনাতে থাকা সমস্ত অণুজীবের সমস্ত জীনের বা ডিএনএ (DNA) এর তথ্য অধ্যয়নের সুযোগ থাকে। প্রকৃতপক্ষে, পর্যাপ্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট নমুনাতে থাকা হাজারো বৈচিত্র্যপূর্ণ অণুজীবদের সম্পূর্ণ জিনোমের তথ্য বিশ্লেষণ এবং গবেষণা এখনো সীমাবদ্ধ। মেটাজিনোমিক্স-এর গবেষণায় আরো একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এই প্রযুক্তিটি একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, যদিও বর্তমানে সিকুয়েন্সিং এর খরচ কমে আসায় এখন নিজস্ব গবেষণাগারে এধরনের গবেষণা অনেকটাই সুলভ।

অ্যাকোয়াকালচার এর বিভিন্ন শাখায় মেটাজিনোমিক্স-এর ব্যবহার (Application of metagenomics in aquaculture)

অ্যাকোয়াকালচারকে সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয় একটি কৃত্রিম আদর্শ মিডিয়া হিসেবে যেখানে অণুজীবেরা অনায়াসে বিস্তার লাভ করে। যেমন: ০১ মিলি. সমুদ্রের পানিতে ১০ লক্ষ (1 million) ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে (Gilbert & Dupont, 2011)। এই পরিস্থিতিতে, বিপুল সংখ্যক unculturable অণুজীবের সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যতা এবং অ্যাকোয়াকালচারে তাদের অবদান জানতে মেটাজিনোমিক্স এর কোন বিকল্প নেই। নতুন নতুন সিকুয়েন্সিং এবং বায়োইনফরমেটিক্স এর কৌশলগুলো ব্যাকটেরিয়ার বৈচিত্র্যতা খুঁজে বের করা ছাড়াও জিনোমিক তথ্য উন্মোচনকে সহজতর করেছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে মেটাজিনোমিক্সের ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. অণুজীবের বৈচিত্র্যতা সনাক্তকরণ: অ্যাকোয়াকালচার ফ্যাসিলিটি (facility) তে থাকা অণুজীব সম্প্রদায়ের গুণগত (Qualitative) ও সংখ্যাগত (Quantitative) বৈচিত্র্যতা নিরুপণে মেটাজিনোমিক্সের ব্যবহার লক্ষণীয়। এধরনের বিশ্লেষণে প্রোক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের 16S rDNA hyper variable অঞ্চলকে; অন্যদিকে ইউক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে 18S অঞ্চলকে লক্ষ্য করে অসংখ্য জানা-অজানা অণুজীবদের

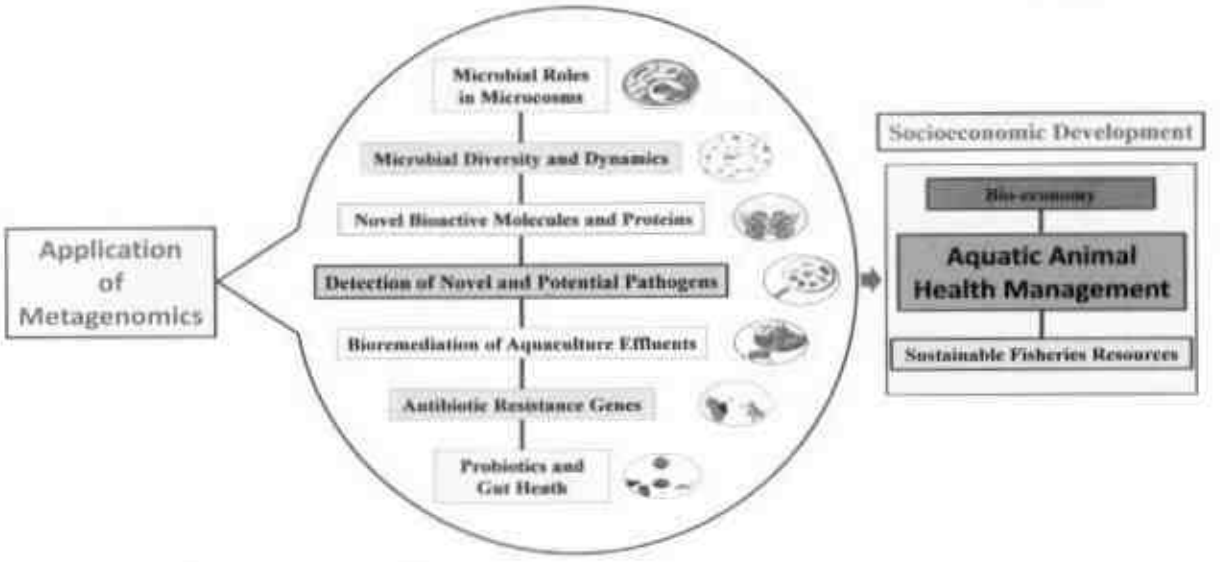

চিত্র- অ্যাকোয়াকালচার এর বিভিন্ন শাখায় মেটাজিনোমিক্স-এর ব্যবহার (Modified from Datta et al., 2020)

বৈচিত্র্যতা উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রোক্যারিয়টদের সনাক্তকরণে 16S rDNA primer এর ব্যবহার বিশ্বাসযোগ্য হলেও ইউক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে 18S rDNA এর কার্যকারীতা এখনও প্রশ্নবিদ্ধ। তবে কিছু গবেষণায় গবেষকরা 18S rDNA এর V4 এবং V5 অঞ্চলকে লক্ষ্য করে যে primers তৈরী করা হয় তাকে অধিক কার্যকর ও তথ্যবহুল এলাকা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই দুই এলাকার জীনই Next Generation Sequencing (NGS) platforms (Illumina or Ion-torrent) এর সাহায্যে অণুজীব সম্প্রদায়ের সনাক্তকরণে কার্যকরী। যে কোন high-throughput sequencing এর প্রাপ্ত বিশাল উপাত্ত (data) ভান্ডারকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য তথ্যাদি বের করে আনাই বায়োইনফরমেটিক্স/কম্পিউটেশনাল গবেষকদের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, অণুজীব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাইরাসের জন্য নির্দিষ্ট shared সর্বজনীন (universal) phylogenetic marker এর অপ্রাপ্তি থাকায় এদের বৈচিত্র্যতা অধ্যয়নে শটগান সিকুয়েন্সিং এর ব্যবহার করা হচ্ছে। মেটাজিনোমিক্সের এই অংশটিকে ভাইরাল মেটাজিনোমিক্স (viral metagenomics) বলা হয়। এক্ষেত্রে ভাইরাল মেটাজিনোম বা ভাইরাসের তথ্য বিশ্লেষণে ভাইরাসের বৈচিত্র্যতা সম্পর্কে জান লাভ করা সম্ভবপর হয়।

২. বিপাক প্রক্রিয়ায় অণুজীবের ভূমিকা: অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমে থাকা অণুজীবদের বিপাক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা অনুধাবনে মেটাজিনোমিক অধ্যয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বিপাক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকৃত অণুজীবদের তথ্যাদির সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ দ্বারা কোন পুকুরের পুষ্টির জৈব-রাসায়নিক চক্রের পরিবর্তন আনায়ন, অণুজীব সম্প্রদায়ের সংশোধন এবং রোগ সৃষ্টিকারী মূল প্রক্রিয়াগুলোর অনুধাবন মেটাজিনোমিক অধ্যয়নে সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন অণুজীবের জীনে লুকিয়ে থাকা বিপাকীয় তথ্যগুলোর সঠিক সমন্বয়ে বায়োইনফরমেটিক্স এর উল্লেখযোগ্য কিছু সরঞ্জামের (tools) ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন- কোস্টাল অ্যাকোয়াকালচার -এ সালফারের জারনের উপর ভিত্তি করে যে chemo-citoautotrophy ঘটে, তার পেছনে কাজ করে সালফার oxidizer গ্রুপের অনুজীবরা।

৩. অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক জীন সনাক্তকরণ: নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং -এর ব্যবহার জিনোমিক তথ্যাদির ভিতর থেকে যেকোন একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক জীনকে খুঁজে পেতে সাহায্য করছে। এক্ষেত্রে মেটাজিনোমিক অ্যাপ্রোচ এধরনের প্রতিরোধক জীনের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি বা সংশোধন থাকলে সেটাও বের করতে সক্ষম। সাধারনত ব্যাকটেরিয়াল সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধকতা জানতে দুই ধরনের মেটাজিনোমিক্স ব্যবহৃত হয়। প্রথম ধরনকে বলা হয়, Functional metagenomics আর দ্বিতীয় ধরনকে Sequence-based metagenomics (shot-gun type) নাম দেয়া হয়েছে। ফাংশনাল মেটাজিনোমিক্স এর ক্ষেত্রে নমুনা থেকে প্রাপ্ত DNA- কে ব্যাকটেরিয়াল শোষক (Host) এর মধ্যে ক্লোনিং (cloning) করে তার expression লক্ষ্য করা হয় এবং ঐ targeted জীনের ক্রিয়াকলাপ সনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে কোন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক জীনকে খুঁজে বের করার জন্য নিম্নোক্ত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা হয়-

অন্যদিকে, সিকুয়েন্স-বেইসড মেটাজিনোমিক্স -এর ক্ষেত্রে নমুনা থেকে প্রাপ্ত DNA এর random shotgun sequencing করা হয়। সিকুয়েন্সে থাকা তথ্যাদি database এর সাথে তুলনা করার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট জীনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধকতা বা মিউটেশন খুঁজে বের করার কাজটি করা হয়। এক্ষেত্রে কার্যপ্রণালিটি হলো-

চিত্র: সুস্থ এবং আক্রান্ত চিংড়ির (16S rRNA amplicon Sequencing) অন্ত্রে অণুজীবের পরিলেখ।

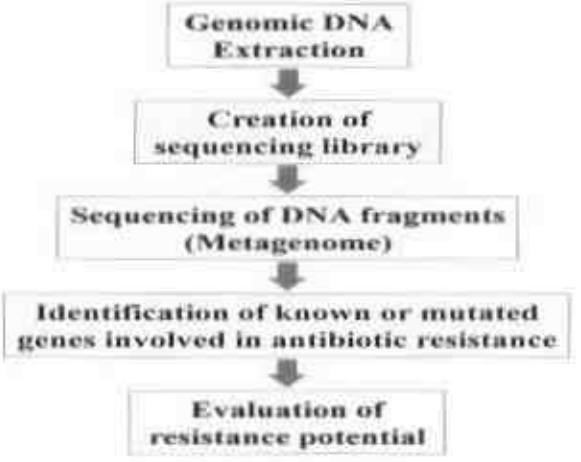

অ্যাকোয়াকালচার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মেটাজিনোমিক্সের প্রয়োগ (Uses of Metagenomics in Aquaculture Health Management)

১. রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু সনাক্তকরণ: অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল এবং ভাইরাল রোগের জন্য দায়ী নতুন (novel) অণুজীবদের সনাক্তকরণে মেটাজিনোমিক্সের random shotgun sequencing এক ধরনের আশার সঞ্চার করেছে। উদাহরনস্বরূপ, Ng et al. (2013) এ ১২টি সুস্থ চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াজ নিয়ে shotgun sequencing করেন এবং তিনি nodavirus (*Farfantepenaeus duorarum* nodavirus) নামে একটি এবং আরো একটি circular single-stranded DNA (ssDNA) জিনোম খুঁজে পান। এই nodavirus টি মূলত *Macrobrachium rosenbergii* প্রজাতির চিংড়ির white tail disease এবং *Litopenaeus vannamei* প্রজাতির চিংড়ির muscle necrosis রোগের জন্য দায়ী।

২. প্রোবায়োটিক্স: মেটাজিনোমিক্সের ব্যবহার আজকাল অণুজীব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নতুন ধরনের প্রোবায়োটিক্সের সন্ধান পেতে সাহায্য করছে। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট অণুজীব সম্প্রদায় যারা কিনা সুস্থতাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে, এমনকি প্রোবায়োটিক্স ব্যবহারের ফলে কোন অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেমের অণুজীব সম্প্রদায়ের বিবর্তনও (evolution) নিরীক্ষণ করে।

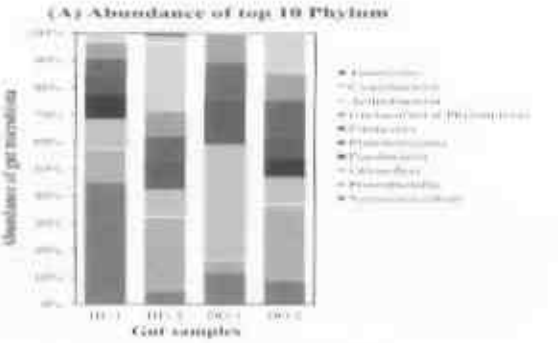

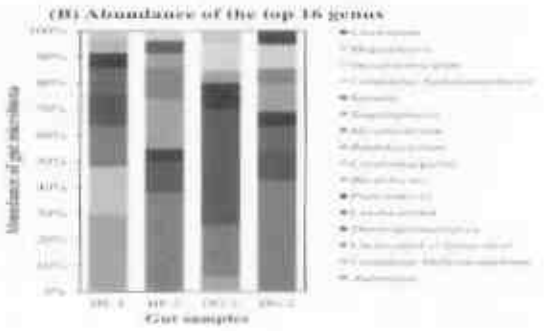

৩. অন্ত্রের স্বাস্থ্য: জলজ প্রাণীর অন্ত্রে থাকা অণুজীব সম্প্রদায়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় ঐ প্রাণীর বা হোস্টের শরীরবৃত্তিতে (physiology)। তাই আজকাল অন্ত্রে থাকা এসব অণুজীব সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণায় মেটাজিনোমিক্স এর ব্যবহার বিশেষ স্থান দখল করেছে।

উপসংহার (Conclusions)

বৈজ্ঞানিক মহলে এরই মধ্যে মেটাজিনোমিক্স একটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশাল অণুজীব সম্প্রদায়ের জটিল সব জিনোমের তথ্য উপাত্ত উদ্ধারে এর ব্যবহার প্রতিনিয়ত সম্ভাবনার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করছে। যদিও অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল (Agro-Industrial) সেক্টরগুলোর মধ্যে অ্যাকুয়াকালচারের বিভিন্ন শাখায়, গত দশকের অগ্রগতি বিবেচনা করলে, এই নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিটির ব্যবহারে শিথিলতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে, জলজপ্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় এখনও মেটাজিনোমিক্সের ব্যবহার সীমিত। এমতাবস্থায়, মেটাজিনোমিক্সের ব্যাপক ব্যবহারই নতুন নতুন রোগের কারণ নির্ণয় এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ এর পথ খুঁজে বের করা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রভাষক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ (অ্যাকোয়াটিক এনিমেল হেলথ গ্রুপ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইমেইল: nusrat.jahan@du.ac.bd)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা
অধ্যাপক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ (অ্যাকোয়াটিক এনিমেল হেলথ গ্রুপ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাছচাষে ভারীধাতু দূষণ এবং জলজ পরিবেশ, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব

Heavy metal contamination in aquaculture and it's toxic effect on aquatic environment, organisms and human health

মোঃ শাফিউজ্জামান[১], আনোয়ার হোসেন[২] ও শংকর চন্দ্র মন্ডল[৩]

Abstract

Aquaculture is one of the fastest growing industries in the world particularly in Bangladesh. However, pollution is likely the greatest threat for the sustainable aquaculture production. Heavy metal pollution in aquaculture is one of the major concerns for environmental as well as aquatic animal and human health. In fish, these harmful heavy metals induce a variety of ailments. Because fish is consumed by humans, it has an indirect impact on human health. The contamination of heavy metals into water bodies and aquatic ecosystems has a significant impact on the food chain. These heavy metals have a wider environmental impact since they remain for extended periods of time and have bioaccumulative capacities, degrading water quality. Hence, heavy metals and their detrimental effects on the environment must be taught in academic settings. Responsible authorities must conduct regular monitoring of heavy metals in aquatic environment using advanced techniques and stringent policy should be applied for the mitigation of heavy metal pollution in aquatic environment.

জলজ পরিবেশে দূষিত পদার্থের মধ্যে ভারী ধাতুর সার্বজনীন উপস্থিতি, পরিবেশে এদের দীর্ঘ সময় ধরে অপরিবর্তিত ও জমা হওয়ার ক্ষমতা থাকায় মাছচাষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ভারী ধাতু জলজ জীবনের জন্য খুব বিপজ্জনক এবং এদের বিষাক্ততা, জৈব-সঞ্চয়ন এবং নন-বায়োডিগ্রেডেবিলিটির কারণে বর্তমান সময়ে এরা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু কিছু ভারী ধাতু অত্যন্ত বিষাক্ত এবং সমস্ত জলজ পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী হয়, ফলে তারা জলজ জীবনের পাশাপাশি মানুষ এবং পরিবেশের জন্যেও বিপজ্জনক। তাই জলজ পরিবেশে এদের উপস্থিতি সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার ও কঠোর পলিসি প্রয়োগের মাধ্যমে ভারী ধাতুর দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারী ধাতু এবং এর শ্রেণিবিভাগ (Heavy metal and it's calssification)

ভারী ধাতুর জন্য নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না থাকলেও যে সকল উপাদানের ঘনত্ব > ৫ গ্রাম/ঘন সেমি তাদের ভারী ধাতু হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। ভারী ধাতুসমূহের মধ্যে সীসা (Pb), আর্সেনিক (As), পারদ (Hg), ক্যাডমিয়াম (Cd), ক্রোমিয়াম (Cr), কোবাল্ট (Co), তামা (Cu), দস্তা (Zn), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), লোহা (Fe) এবং নিকেল (Ni)- এগুলোকে অ্যাকোয়াকালচার পণ্য দূষণের সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও এই ধাতুগুলির মধ্যে কিছু আছে যারা প্রাণিদেহের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় অপরিহার্য উপাদান এবং অন্যরা অপ্রয়োজনীয়। অপরিহার্য উপাদান জীবের বিপাক ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (micronutrient) হিসেবে কাজ করে। অপ্রয়োজনীয় ধাতুসমূহ সর্বদা উপলব্ধ এনজাইম সাইটের জন্য অপরিহার্য ধাতুগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং একটি নির্দিষ্ট সীমার ওপরে বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

সাধারণ মাছচাষে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় ধাতুর তালিকা এবং WHO (২০১১) নির্দিষ্ট পানিতে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা

প্রয়োজনীয় ধাতু	পানিতে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা (µg/L)	অপ্রয়োজনীয় ধাতু	পানিতে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা (µg/L)
দস্তা	৫০০০	ক্রোমিয়াম	৫০
তামা	২০০০	আর্সেনিক	১০
নিকেল	৭০	সীসা	১০
ম্যাঙ্গানিজ	-	পারদ	৬
লোহা	-	ক্যাডমিয়াম	৩
কোবাল্ট	-	-	-

অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমে ভারী ধাতুর উৎস (Sources of heavy metals in aquaculture)

অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমে ভারী ধাতু ভূতাত্ত্বিক বা প্রাকৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক বা মানব সৃষ্ট উৎস থেকে আসতে পারে। পরিবেশে ভারী ধাতুর প্রাকৃতিক উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে শিলার ক্ষয়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং শিলা পরিবর্তন। অন্যদিকে খননকাজ, কৃষিকাজে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, শহরের পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিল্প-বর্জ্য ইত্যাদি জলজ পরিবেশে ভারী ধাতুর মানব সৃষ্ট কিছু সাধারণ উৎস। নদী-নালার অপরিশোধিত পানির ব্যবহার অ্যাকোয়াকালচারে ভারী ধাতু দূষণের আরেকটি উৎস। এছাড়াও অনেক সময় মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদানগুলি প্রায়শই ভারী ধাতু দ্বারা দূষিত হয়। ফলে মাছের খাদ্য ভারী ধাতু দ্বারা দূষিত হয় এবং দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে মাছে ভারী ধাতু জমা হতে পারে।

ভারী ধাতুর প্রভাব (Effects of Heavy metals)

জলজ পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ওপর ভারী ধাতুর প্রভাব :

আশেপাশের পরিবেশ থেকে ভারী ধাতু প্রাণীর শরীরে জমা হয়। পানিতে ভারী ধাতুর উপস্থিতি এবং মাত্রা বেশি থাকলে তা প্রাণীতে জমা হওয়ার হারও দ্রুত হয়। পানির চেয়ে জলজ

প্রাণীতে অধিক হারে ভারী ধাতু জমা হয়; একে বলা হয় "জৈবঘনত্ব" (bioconcentration)। অন্যদিকে, জৈব-সঞ্চয়ন (bioaccumulation) হলো জীবের মধ্যে ধীরে ধীরে কোন পদার্থ যেমন ভারী ধাতু বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের জমা হওয়া। জৈব-সঞ্চয়ন ঘটে যখন কোন পদার্থ জীবদেহে প্রবেশের হার দেহ থেকে ক্যাটাবলিজম (catabolism) ও রেচন (excretion) প্রক্রিয়ায় বের হয়ে যাওয়ার হারের থেকে বেশি হয়। জৈব-বিবর্ধন (biomagnification) হলো খাদ্য শৃঙ্খলে পর্যায়ক্রমে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে জীবের টিস্যুতে ভারী ধাতুর মতো কোন বিষাক্ত পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া। মাছ ভারী ধাতুর জৈব-বিবর্ধনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ কারণ তারা খাদ্য শৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থান করে এবং মানুষ মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করায় ধাতুগুলো মানুষের দেহে স্থানান্তরিত হয়।

চিত্র: জলজ জীবে ভারী ধাতুর জৈব-সঞ্চয়নের পথ এবং মানবদেহে ভারী ধাতু স্থানান্তর

জলজ প্রাণীর উপর ভারী ধাতুর প্রভাব : ভারী ধাতু তিনটি সম্ভাব্য উপায়ে মাছের দেহে প্রবেশ করে যথা: ফুলকা দ্বারা, শরীরের ত্বক দ্বারা এবং পরিপাকতন্ত্র দ্বারা। ভারী ধাতু মূলত মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর টিস্যুতে বিভিন্ন এনজাইম এবং বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন করার মাধ্যমে প্রাণীদেহে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক এবং হিস্টোলজিক্যাল (histological) পরিবর্তন ঘটায়। মাছের দেহে অধিক মাত্রায় ভারী ধাতু নিম্নোক্ত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

- সীসা, ক্যাডমিয়াম মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে;
- দস্তা, ক্রোমিয়াম ফুলকা ও শ্বাসতন্ত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে;
- সীসা, ক্যাডমিয়াম প্রজননতন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে; ভ্রূণের স্বাভাবিক গঠন ব্যাহত করে ফলে মাছ বিকলাঙ্গ হয়;
- পারদ স্নায়ুতন্ত্রে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি সাধন করে;
- নিকেল, ক্রোমিয়াম রক্ত ও সংবহনতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে এবং রক্ত-স্বল্পতা (anemia) ও লিম্ফোসাইটোসিসের (lymphocytosis) মত জটিলতা সৃষ্টি করে;
- আর্সেনিক জিনোটক্সিসিটির মাধ্যমে DNA মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম।

মানব স্বাস্থ্যের ওপর ভারী ধাতুর প্রভাব : ভারী ধাতু সক্রিয়ভাবে মানবদেহে অসংখ্য রোগের উত্থানের সাথে জড়িত। এ সব রোগের কোনোটা হতে পারে তীব্র (acute), দীর্ঘস্থায়ী (chronic), মিউটাজেনিক (mutagenic), নিউরোটক্সিক (neurotoxic) বা কার্সিনোজেনিক (carcinogenic)।

সীসা	ক্যান্সার ঝুঁকি, উচ্চ রক্তচাপ, স্মৃতিলোপ, শ্রবণ সমস্যা, হজম সমস্যা
পারদ	ক্যান্সার ঝুঁকি, মস্তিষ্ক বিকৃতি, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল অসুস্থতা, গর্ভপাত
আর্সেনিক	ক্যান্সার ঝুঁকি, হৃদ্‌ রোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, পেশী দুর্বলতা, কোষীয় শ্বসনে ত্রুটি
নিকেল	ক্যান্সার ঝুঁকি, ওজন হ্রাস, চর্ম রোগ, ত্বক জ্বালাপোড়া, চুল পড়া
ক্যাডমিয়াম	ক্যান্সার ঝুঁকি, হাড় নরম হয়ে যাওয়া, কিডনি সমস্যা, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া
দস্তা	স্নায়বিক সমস্যা, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, বমি বমি ভাব, শ্বাসনালের সমস্যা
ক্রোমিয়াম	বৃক্কের কার্যকারিতা হ্রাস, কিডনি সমস্যা, স্নায়বিক সমস্যা, এলার্জি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

চিত্র: মানব স্বাস্থ্যের ওপর ভারী ধাতুর বিরূপ প্রভাব

অ্যাকোয়াকালচারে ভারী ধাতু দূষণের জৈব-সূচক হিসাবে মাছ (Fish as a biomarker of heavy metal pollution in aquaculture)

জৈব-সূচক (biomarker) হলো পরিমাপযোগ্য জৈবিক স্থিতিমাপ (parameter) যা একটি নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় অবস্থার নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। জলজ পরিবেশে ভারী ধাতু নিরীক্ষণে মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব-সূচক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মাছের শরীরে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ওপরে ভারী ধাতু জমা হলে তা মাছে পীড়নের (stress) সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জৈব-সূচক এই পরিবর্তনগুলি অধ্যয়ন ও পরিমাপ করার পাশাপাশি ভারী ধাতু দূষণের তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী হাতিয়ার।

উপসংহার (Conclusion)

মাছচাষে অতিরিক্ত পরিমাণে ভারী ধাতুর উপস্থিতি বিশ্বব্যাপী একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। এজন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের দ্বারা অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমের পানি উন্নত কৌশলের মাধ্যমে নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। একই সাথে ভারী ধাতু এবং পরিবেশের ওপর তাদের বিষাক্ত প্রভাব বিবেচনায় অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম থেকে ভারী ধাতুর অপসারণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[1]শিক্ষার্থী, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইমেইল: zwittershah@gmail.com)
[2]সহযোগী অধ্যাপক, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[3]সহযোগী অধ্যাপক, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০২০-২১)
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য সেক্টর		জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদনের শতকরা অংশ (%)	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়					
(১) মুক্ত জলাশয়					
১.	নদী ও মোহনা	৮,৫৩,৮৬৩	৩,৩৭,০৫১	৭.২৯	৩৯৫
২.	সুন্দরবন	১,৭৭,৭০০	২১,৫৪৪	০.৪৭	১২১
৩.	বিল	১,১৪,১৬১	১,০৪,৮৭১	২.২৭	৯১৯
৪.	কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	১২,৩৪৫	০.২৭	১৭৯
৫.	প্লাবন ভূমি	২৬,৪৫,৯৪২	৮,২৫,৪৩৩	১৭.৮৬	৩১২
উপমোট ঃ		৩৮,৬০,৪৬৬	১৩,০১,২৪৪	২৮.১৬	-
(২) বদ্ধ জলাশয়					
৬.	পুকুর	৪,০৭,৬২৫	২০,৯০,৭৮৭	৪৫.২৪	৫১২৯
৭.	মৌসুমি চাষ জলাশয়	১,৫০,৪৯২	২,২৬,৬০৮	৪.৯০	১৫০৬
৮.	বাওড়	৫,৬৭১	১১,৩১৯	০.২৫	১৯৯৬
৯.	চিংড়ি খামার	২,৬৩,০২৫	২,৭৮,৪১৭	৬.০২	১০৫৯
১০.	কাঁকড়া	৯,৬০২	১২,৩৩৭	০.২৭	১২৮৫
১১.	পেন কালচার	৭,৩১৪	১৪,২৮২	০.৩১	১৯৫৩
১২.	খাঁচায় মাছ চাষ*	১.৭৯ লক্ষ কিউবিক মিটার	৪,৯৯৫	০.১১	২৮ কেজি/কিউবিক মিটার
	উপমোট ঃ	৮,৪৩,৭২৯	২৬,৩৮,৭৪৫	৫৭.১০	--
অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট)		৪৭,০৪,১৯৫	৩৯,৩৯,৯৮৯	৮৫.২৬	--
খ. সামুদ্রিক জলাশয়					
১৩.	ট্রলার		১,১৯,১২১	২.৫৮	--
১৪.	আর্টিসেনাল		৫,৬২,১১৮	১২.১৬	--
সামুদ্রিক জলাশয় (মোট)			৬,৮১,২৩৯	১৪.৭৪	--
সর্বমোট ঃ			৪৬,২১,২২৮	১০০.০০	--

* খাঁচায় মাছ চাষের জলায়তন নদী ও বিলের জলাতয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বছরভিত্তিক চিংড়ি উৎপাদন

বছর	চিংড়ি উৎপাদন (মে. টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসনাল	মোট		
১৯৮৬-৮৭	৪২৮৮২	১৪৭৭৩	৫৭৬৫৫	৪৪৮৮	১০৬৬৬	১৫১৫৪	৭২৮০৯	২০.২৯
১৯৮৭-৮৮	৩৬৩৮৬	১৭৮৮৯	৫৪২৭৫	৩৫৪৫	১১৫৩৫	১৫০৮০	৬৯৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪২৮২৪	১৮২৩৫	৬১০৫৯	৪৮৯৩	১২২১১	১৭১০৪	৭৮১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-৯০	৩৬২৮৪	১৮৬২৪	৫৪৯০৮	৩১১৭	১২৭৫১	১৫৮৬৮	৭০৭৭৬	২৬.৩১
১৯৯০-৯১	৪৩২৬২	১৯৪৮৯	৬২৭৫১	৩৬৯৬	১৩৯৩৭	১৭৬৩৩	৮০৩৮৪	২৪.২৪
১৯৯১-৯২	৬১০৪২	২০৩৩৫	৮১৩৭৭	২৯০২	১৭১৪০	২০০৪২	১০১৪১৯	২০.০৫
১৯৯২-৯৩	৭৮২২৬	২৩৫৩০	১০১৭৫৬	৪১৮৮	১৯৭৮৭	২৩৯৭৫	১২৫৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-৯৪	৫০৭২১	২৮৩০২	৭৯০২৩	৩৪৭৯	১৮০৪০	২১৫১৯	১০০৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-৯৫	৫৮৯৭৩	৩৪০৩০	৯৩০০৩	১৪১৬	১৭৯৪৭	২০৩৬৩	১১৩৩৬৬	৩০.০২
১৯৯৫-৯৬	৪৪০৭৯	৪৬২২৩	৯০৩০২	৩৫৮৮	২২৭৬৫	২৬৩৫৩	১১৬৬৫৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-৯৭	৪১৮৬৮	৫২২৭২	৯৪১৪০	৩৫৩৭	২১২৮১	২৪৮১৮	১১৮৯৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৪৬৬৩৫	৬২১৬৭	১০৮৮০২	১৪৪৪	২২৩৪৬	২৪৭৯০	১৩৩৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৪	১১২৪৬০	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০২	৪৩.৮০
১৯৯৯-০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২০০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২১১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	৪৬৩৮৮	৮৭৯৭২	১৩৪৩০০	২৪৯৬	৫০০৯৬	৫২৫৯২	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭
২০১০-১১	৫৭৯২২	১২৪৬৪৮	১৮২৫৭০	২৭৮৫	৫৪২০৪	৫৬৯৭৯	২৩৯৪৬০	৫২.০৫
২০১১-১২	৫৭৬৮৮	১৩৭১৭৫	১৯৪৮৬৩	২২১২	৫৫৪৪৮	৫৭৬৬০	২৫২৫২৩	৫৪.৩২
২০১২-১৩	৪৫০১৩	১৪০২৬১	১৮৫২৭৪	৩০৮৩	৪৩৪৮৫	৪৬৫৬৮	২৩১৮৪২	৬০.৫০
২০১৩-১৪	৪৭৮০৭	১২৮৩১৩	১৭৬১২০	৩৭৯৯	৪৩৮৬৯	৪৭৬৬৮	২২৩৭৮৮	৫৭.৩৪
২০১৪-১৫	৫১৭১৭	১৩২৭৯৪	১৮৪৫১১	৩৪৪৩	৪২২৯০	৪৫৭৩৩	২৩০২৪৪	৫৭.৬৮
২০১৫-১৬	৫৩৮৭৫	১৩২৭৩০	১৮৬৬০৫	২৫৮৩	৪৫০০০	৪৭৫৮৩	২৩৪১৮৮	৫৬.৬৭
২০১৬-১৭	৫৮০০২	১৩৭৪৯৬	১৯৫৪৯৮	৩২১৯	৪৬৪০০	৪৯৬১৯	২৪৫১১৭	৫৬.০৯
২০১৭-১৮	৬৭৪৪৫	১৩০৯২১	১৯৮৩৬৬	৩৬৮২	৪৫১৬৫	৪৮৮৪৭	২৪৭২১৩	৫২.৯৬
২০১৮-১৯	৬৩৩৫৮	১৩৩৭৪৮	১৯৭১০৬	২৭৩৩	৪০০১৬	৪২৭৪৯	২৩৯৮৫৫	৫৫.৭৬
২০১৯-২০	৬৩২৮০	১৩৫১৮৫	১৯৮৪৬৫	২৪৩৬	৪০৩৮০	৪২৮১৬	২৪১২৮১	৫৬.০৩
২০২০-২১	৬৬২২৮	১৩৯৪৩৯	২০৫৬৬৭	৩০৬৯	৪৩২২৮	৪৬২৯৭	২৫১৯৬৪	৫৫.৩৪

- উন্মুক্ত জলাশয় ঃ নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমি
- চাষকৃত জলাশয় ঃ পুকুর, মৌসুমী জলাশয়, বাওড়, চিংড়ি খামার ও পেন কালচার।

বছরভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন

বৎসর	ইলিশের উৎপাদন (মে. টন)			বৃদ্ধির হার (%)
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট	
১৯৮৭-৮৮	৭৮৫৫১	১০৪৯৫০	১৮৩৫০১	৩.৭৩
১৯৮৮-৮৯	৮১৬৪১	১১০৩১১	১৯১৯৫২	৪.৬১
১৯৮৯-৯০	১১২৪০৮	১১৩৯৪৩	২২৬৩৫১	১৭.৯২
১৯৯০-৯১	৬৬৮০৯	১১৫৩৫৮	১৮২১৬৭	-১৯.৫২
১৯৯১-৯২	৬৮৩৫৬	১২০১০৬	১৮৮৪৬২	৩.৪৬
১৯৯২-৯৩	৭৪৭১৫	১২৩১১৫	১৯৭৮৩০	৪.৯৭
১৯৯৩-৯৪	৭১৩৭০	১২১১৬১	১৯২৫৩১	-২.৬৮
১৯৯৪-৯৫	৮৪৪২০	১২৯১১৫	২১৩৫৩৫	১০.৯১
১৯৯৫-৯৬	৮০৬২৫	১২৬৬৬০	২০৭২৮৫	-২.৯৩
১৯৯৬-৯৭	৮৩২৩০	১৩১২০৪	২১৪৪৩৪	৩.৪৫
১৯৯৭-৯৮	৮১৬৩৪	১২৪১০৫	২০৫৭৩৯	-৪.০৫
১৯৯৮-৯৯	৭৩৮০৯	১৪০৭১০	২১৪৫১৯	৪.২৭
১৯৯৯-২০০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২	২.৩৪
২০০০-০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪	৪.৬৪
২০০১-০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩	-৩.৯৭
২০০২-০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২	-৯.৭৭
২০০৩-০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯	২৮.৫৪
২০০৪-০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২	৭.৮৩
২০০৫-০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩	০.৪৬
২০০৬-০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯	০.৭৫
২০০৭-০৮	৮৯৯০০	২০০১০০	২৯০০০০	৩.৮৭
২০০৮-০৯	৯৫৯৭০	২০২,৯৫১	২৯৮৯২১	৩.০৮
২০০৯-১০	১১৫১৭৯	১৯৮৫৭৪	৩১৩৭৫৩	৪.৮২
২০১০-১১	১১৪৫২০	২২৫৩২৫	৩৩৯৮৪৫	৮.৪৬
২০১১-১২	১১৪৪৭৫	২৩২০৩৭	৩৪৬৫১২	১.৯৬
২০১২-১৩	৯৮৬৪৮	২৫২৫৭৫	৩৫১২২৩	১.৩৬
২০১৩-১৪	১২৭৫১৪	২৫৭৬২৬	৩৮৫১৪০	৯.৬৬
২০১৪-১৫	১৩৫৩৯৬	২৫১৮১৫	৩৮৭২১১	০.৫৪
২০১৫-১৬	১৪০৭৫৬	২৫৪১৯৫	৩৯৪৯৫১	২.০১
২০১৬-১৭	২১৭৪৬৯	২৭৮৯৪৮	৪৯৬৪১৭	২৫.৬৯
২০১৭-১৮	২৩২৬৯৮	২৮৪৫০০	৫১৭১৯৮	৪.১৯
২০১৮-১৯	২৪২৪৭৯	২৯০৩১৬	৫৩২৭৯৫	৩.০২
২০১৯-২০	২৪৫৮৬২	৩০৪৫৬৬	৫৫০৪২৮	৩.৩১
২০২০-২১	২৫১৫৯০	৩১৩৫৯৩	৫৬৫১৮৩	২.৬৮

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

মূল্য : কোটি টাকা

পরিমাণ : মে. টন

বছর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ (ইল ফিশ)		হিমায়িত মাছ		শুঁটকি মাছ		লবণাক্ত ও পানি শুন্য মাছ		কাঁকড়া		হাঙরের পাখনা এবং মাছের ফোটকা		অন্যান্য		সর্বমোট		মোট রপ্তানি আয়ের হার
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	%
১৯৯২-৯৩	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৯৩-৯৪	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৯৪-৯৫	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৯৫-৯৬	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৯৬-৯৭	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৯৭-৯৮	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৯৮-৯৯	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৯৯-০০	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০০-০১	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০১-০২	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০২-০৩	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০৩-০৪	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০৪-০৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০৫-০৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০৬-০৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০৭-০৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০৮-০৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০০৯-১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১০-১১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১১-১২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১২-১৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১৩-১৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১৪-১৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১৫-১৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১৬-১৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১৭-১৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১৮-১৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০১৯-২০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০২০-২১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*[illegible], **রপ্তানি মূল্য [illegible] কোটি টাকা (ইপিবি অনুযায়ী)

এক নজরে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০২০-২১)

১.	**অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ**		**৪৭০৪১৯৫ হে.**
	(ক) **বদ্ধ জলাশয়**	ঃ	**৮৪৩৭২৯ হে.**
	▪ পুকুর	ঃ	৪০৭৬২৫ হে.
	▪ অক্সবো লেক (বাওড়)	ঃ	৫৬৭১ হে.
	▪ চিংড়ি খামার	ঃ	২৬৩০২৫ হে.
	▪ কাঁকড়া	ঃ	৯৬০২ হে.
	▪ পেন কালচার		৭৩১৪ হে.
	▪ খাঁচায় মাছচাষ		১.৭৯ লক্ষ কিউবিক মিটার
	▪ মৌসুমী জলাশয়		১৫০৪৯২ হে.
	(খ) **উন্মুক্ত জলাশয়**	ঃ	**৩৮৬০৪৬৬ হে.**
	▪ নদী ও মোহনা	ঃ	৮৫৩৮৬৩ হে.
	▪ সুন্দরবন	ঃ	১৭৭৭০০ হে.
	▪ বিল	ঃ	১১৪১৬১ হে.
	▪ কাপ্তাই লেক	ঃ	৬৮৮০০ হে.
	▪ প্লাবন ভূমি	ঃ	২৬৪৫৯৪২ হে.
২.	**সামুদ্রিক জলসীমা**		
	▪ সামুদ্রিক জলসীমার পরিমান	ঃ	১১৮৮১৩ বর্গ কিলোমিটার
	▪ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	ঃ	৭১০ কিলোমিটার
৩.	▪ জেলের সংখ্যা	ঃ	১৬.৮০ লক্ষ
	▪ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	ঃ	১০.৯২ লক্ষ
	▪ সামুদ্রিক জেলে	ঃ	৫.৮৮ লক্ষ
৪.	**মৎস্য উৎপাদন**		**৪৬২১২২৮ মে.টন**
	▪ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	ঃ	৩৯৩৯৯৮৯ মে.টন
	(ক) উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	ঃ	১৩০১২৪৪ মে.টন
	(খ) বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	ঃ	২৬৩৮৭৪৫ মে.টন
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য	ঃ	৬৮১২৩৯ মে.টন
	(ক) ট্রলার দ্বারা আহরণ	ঃ	১১৯১২১ মে.টন
	(খ) ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	ঃ	৫৬২১১৮ মে.টন
৫.	**মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি**		
	▪ পরিমাণ	ঃ	৭৬৫৯১.৬৯ মে.টন
	▪ মূল্য	ঃ	৪০৮৮.৯৬ কোটি টাকা
	▪ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	ঃ	মোট ১০৭ টি (ই ইউ অনুমোদিত ৭৭টি)
	▪ জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	ঃ	১.২৪%
৬.	**জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান**		
	▪ GDP তে অবদান ২০২০-২১	ঃ	৩.৫৭%
	▪ কৃষিখাতে অবদান ২০২০-২১	ঃ	২৬.৫০%
৭.	**মাছ গ্রহণ ও চাহিদা**		
	▪ জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ	ঃ	২৩ কেজি
	▪ মাছের বাৎসরিক চাহিদা	ঃ	৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন
	▪ জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা	ঃ	২১.৯০ কেজি
	▪ জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা		৬০ গ্রাম
	▪ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান	ঃ	৬০%

বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (২০০৫-০৬ হতে ২০২০-২১)

(একক : মে. টন)

মৎস্য সেক্টর	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১৮৪৮৭৩৫	১৯৫৩২৯৬	২০৬৫৭২৩	২১৮৬৭২৬	২৩৮১৯১৬	২৫১৫৩৫৪	২৬৮৩১৪২	২৮২১২৬৬
মুক্ত জলাশয়	৯৫৬৬৮৬	১০০৭৪৮৪	১০৬০১৮১	১১২৩৯২৫	১০২৯৯৩৭	১০৫৪৫৮৫	৯৫৭০৯৫	৯৬১৪৫৮
১. নদী ও মোহনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২. সুন্দরবন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩. বিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪. কাপ্তাই লেক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫. প্লাবনভূমি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বদ্ধ জলাশয়	৮৯২০৪৯	৯৪৫৮১২	১০০৫৫৪২	১০৬২৮০১	১৩৫১৯৭৯	১৪৬০৭৬৯	১৭২৬০৬৬	১৮৫৯৮০৮
১. পুকুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২. মৌসুমী চাষকৃত জলাশয়	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩. বাঁওড়	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪. চিংড়ি খামার	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫. পেন কালচার	-	-	-	-	-	-	-	-
৬. খাঁচায় মাছ চাষ	-	-	-	-	-	-	-	-
৭. কাঁকড়া	-	-	-	-	-	-	-	-
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	৪৭৯৮১০	৪৮৬৭১৫	৪৯৭৫৭৩	৫১৪৬৪৪	৫১৭২৮২	৫৪৬৩৩৩	৫৭৮৬২০	৫৮৮৯৮৮
১. ট্রলার	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২. আর্টিসেনাল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সর্বমোট :	২৩২৮৫৪৫	২৪৪০০১১	২৫৬৩২৯৬	২৭০১৩৭০	২৮৯৯১৯৮	৩০৬১৬৮৭	৩২৬১৭৬২	৩৪১০২৫৪
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%)	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯	৭.৩২	৫.৬০	৬.৫৪	৪.৫৫

মৎস্য সেক্টর	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	২৯৫২৭৩০	৩০৮৪৩৯৯	৩২৫১৭৯৬	৩৪৯৬৯৫৮	৩৬২১৫৫৪	৩৭২৪৩১০	৩৮৩২২৮৮	৩৯৩৯৭০০
মুক্ত জলাশয়	৯৯৫৮০৫	১০২৩৯৯১	১০৪৮২৪২	১১৬৩৬০৬	১২১৬১৩৯	১২৩৫৭০৯	১২৪৮৪২২	১৩০১২৪৬
১. নদী ও মোহনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২. সুন্দরবন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩. বিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪. কাপ্তাই লেক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫. প্লাবনভূমি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বদ্ধ জলাশয়	১৯৫৬৯২৫	২০৬০৪০৮	২২০৩৫৫৪	২৩৩৩৩৫২	২৪০৫৪১৫	২৪৮৮৬০১	২৫৮৩৮৬৬	২৬৩৮৪৫৪
১. পুকুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২. মৌসুমী চাষকৃত জলাশয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩. বাঁওড়	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪. চিংড়ি খামার	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫. পেন কালচার	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৬. খাঁচায় মাছ চাষ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৭. কাঁকড়া	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	৫৯৫৩৮৫	৫৯৯৮৪৬	৬২৬৫২৮	৬৩৭৪৭৬	৬৫৫০৮৭	৬৫৯৯১১	৬৭১০৬০	৬৮১৫২৮
১. ট্রলার	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২. আর্টিসেনাল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সর্বমোট :	৩৫৪৮১১৫	৩৬৮৪২৪৫	৩৮৭৮৩২৪	৪১৩৪৪৩৪	৪২৭৬৬৪১	৪৩৮৪২২১	৪৫০৩৩৪৮	৪৬২১২২৮
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%)	৪.০৪	৩.৮৪	৫.২৭	৬.৬০	৩.৪৪	২.৫১	২.৭২	২.৬২

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	৫৫১০০৪৩০ (অ) ৫৫১০০১৮২ (ফ্যা) minister@mofl.gov.bd
ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুর মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব(যুগ্ম সচিব)	৯৫৪০৯৩০ (অ) ৯৫৪০১৮২ (ফ্যা) ০১৭১১৩৬৭৪৪৮ ps_minister@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ ইফতেখার হোসেন জনসংযোগ অফিসার	৫৫১০০৭০০ (অ) ৯৫৪০১৮২ (ফ্যা) ০১৭৭৫২২৫৬৯০ pro@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ জুয়েল আহমেদ মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫৭৪৮১২(অ) ৯৫৪০১৮২ (ফ্যা) ০১৯১১৭৭৭৭৭৭ aps_minister@mofl.gov.bd
ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী সচিব	৫৫১০০৮৩১ (অ) ০১৭২৫৫১১৫০৩ ৯৫১২২২০ (ফ্যাক্স) secretary@mofl.gov.bd
জনাব গোলাম মাঈনউদ্দিন হাসান সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)	৯৫১৫৭৯৯ (অ) ০১৮১২২৮০৫২৫ ৯৫১২২২০ (ফ্যাক্স) ps_secretary@mofl.gov.bd
জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ)	৯৫১৪২০১ (অ) ০১৭১৭৯২২৩৬৭ addlsec_admin@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য অনুবিভাগ)	৫৫১০০৫৫৯ ০১৭১১৮৪৯৮৫১ addlsec_fisheries@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ)	৫৫১০০৭৪৩ (অ) ০১৭১১৬৪৩৮১৩ addlsec_planning@mofl.gov.bd
জনাব এ.টি.এম.মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অনুবিভাগ)	৯৫১৪৬৪৫(অ) ০১৫৫৮৩০৮৮৪৮ addlsec_livestock-2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান যুগ্ম সচিব (আইন অধিশাখা)	২২২৩৩৫৬৩৫৭ (অ) ০১৭১২১১৫২১৮ ds_law@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান যুগ্ম সচিব (ব্লু-ইকোনমি অনুবিভাগ)	২২৩৩৫৪৪৯৫ (অ) ০১৭১২১১৫২১৮ js_be@mofl.gov.bd
জনাব হাফছা বেগম যুগ্ম সচিব (মৎস্য-১)	৯৫৪৫৮১৯ (অ) ০১৭১১৩১০০৭৭ fisheries-1@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা)	৯৫৪০৪০৭ ০১৭১২৭২১০৭৫ administration-3@mofl.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান যুগ্ম সচিব(মৎস্য-৫ অধিশাখা)	৫৫১০১২২৪ (অ) ০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ fisheries-5@mofl.gov.bd
জনাব শাহীনা ফেরদৌসী যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা)	৫৫১০০৮১৮ ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ livestock-1@mofl.gov.bd
ড. মোঃ মশিউর রহমান যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১ অধিশাখা)	২২৩৩৯০৬৫৪ ০১৭২৪৪১০৬২২ js_planning1@mofl.gov.bd
জনাব দিলরুবা আক্তার যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা-২ অধিশাখা,মৎস্য পরিকল্পনা-১ ও ৩ শাখা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৯৫৪৬১২৮ ০১৫৫২৪৯৮৬৬৯ js_planning2@mofl.gov.bd
জনাব আবুল কালাম আজাদ উপসচিব(প্রশাসন-২ অধিশাখা)	৫৫১০১০৪০(অ) ০১৭১১২৮৮৯৭১ administration-2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুর রহমান উপসচিব (প্রশাসন-১অধিশাখা)	০২৫৫১০০৪৩৮ (অ) ০১৭১২৫৮২৩২৩ administration-1@mofl.gov.bd
ড. অমিতাভ চক্রবর্তী উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা)	২২৩৩৮১১৭ (অ) ০১৭১২২০৬৬৪৪ livestock-2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আরমান হায়দার উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪)	৫৫১০০২৫০ ০১৯১১২৮৮৩৩১ livestock-4@mofl.gov.bd
ডাঃ আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩)	৯৫৬১১১৭ ০১৭১১১৮১৯৪৬ livestock-3@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)	২২৩৩৮১০০৭ (অ) ০১৭১৮৬৪৭৫৮০ ds_budget@mofl.gov.bd
জনাব আ.ন.ম. নাজিম উদ্দীন উপ সচিব (মৎস্য-৪)	৫৫১০০০৮০ (অ) ০১৭১৮২০৭০৬৫ fisheries-4@mofl.gov.bd
ড.এস এম রোকনুজ্জামান কবির উপ সচিব (মৎস্য-২ অধিশাখা)	৫৫১০০০৮১ (অ) ০১৭১৫২৭৯৩৮১ fisheries-2@mofl.gov.bd
জনাব পুলকেশ মন্ডল উপসচিব মৎস্য পরিকল্পনা-২ শাখা	২২২৩৩৮১৬৭৭ ০১৭১১০৪৭০৬৮ fisheriesplanning-2@mofl.gov.bd
জনাব মোহাঃ মোজাম্মেল হক উপসচিব (মনিটরিং-২ শাখা)	২২৩৩৫৭৩৩৯ ০১৭১১০১৩৭৮৬ monitoring-2@mofl.gov.bd
ড. মোঃ আবদুল লতিফ উপসচিব (মনিটরিং-১ শাখা)	২২৩৩৫৪৮১৭ ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ monitoring-1@mofl.gov.bd
জনাব মাহমুদা সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা- ১ শাখা)	২২৩৩৮০৩৭১ (অ) ০১৭০৩৮৯০৩০৭ livestockplanning-1@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব	২২৩৩৫৬৩৩৬ (অ) ০১৯৮২৬২৪৬১২ fisheries-3@mofl.gov.bd
জনাব মল্লিকা রানী মন্ডল সহকারী সচিব (হিসাব রক্ষণ কমকর্তা/ডিডিও)	৯৫৪৫০২০ ০১৫৫২৩১৬৬৮০ accountofficer@mofl.gov.bd
জনাব মল্লিকা রানী মন্ডল সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪ শাখা)	২২৩৩৫১৬২৮ ০১৫৫২৩১৬৬৮০ administration-4@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	৯৫১০০৪৩৯ (অ) ০১৫১৭২৬৮২৭৩ sa@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ নাদিম হায়দার চৌধুরী সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১৬১৮০০৯৯০৮ ame@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মেহেদী হাসান সহকারী প্রোগ্রামার	০১৮৮৬৩৩২২৩৫ ap@mofl.gov.bd
জনাব জেবুন নেছা হাওলাদার চীফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার	৫৮৩১৬২৭৪ (অ) ০১৭১১৯৭৯৬৭৭ zebun502@yahoo.com

৮.	**মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি**		
	▪ মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	ঃ	১০৫৬টি
	▪ সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা (BFRI সহ)	ঃ	১০৩টি
	▪ বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	ঃ	৯৫৩টি
	▪ হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	ঃ	৬৬৮৮০১ কেজি
	▪ সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (জানুয়ারি-জুন ২০২১)	ঃ	১২১৯৩ কেজি
	▪ বেসরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০২০-২১)	ঃ	৬৫৬৬০৮ কেজি
	▪ গলদা হ্যাচারি (সরকারি ২৭টি সহ)	ঃ	৩৩টি
	▪ বাগদা হ্যাচারি	ঃ	৪৪টি
	▪ গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	ঃ	২.৩৭ কোটি
	▪ বাগদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন	ঃ	৭২১.০৪ কোটি
	▪ প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	ঃ	২১৫২ কেজি
৯.	**সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)**		
	▪ বানিজ্যিক ট্রলার	ঃ	২৩৪টি
	▪ মোট নৌযানের সংখ্যা	ঃ	৬৭৬৬৯টি
	▪ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	ঃ	৩২৮৫৯টি
	▪ ইঞ্জিন বিহীন নৌকা	ঃ	৩৪৮১০টি
	▪ জাল ও অন্যান্য	ঃ	১৮৮৭০৭টি
১০.	**মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)**		
	▪ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	ঃ	২৬০টি
	▪ বিদেশী মৎস্য প্রজাতি	ঃ	১২টি
	▪ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	ঃ	২৪ টি
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	ঃ	৪৭৫টি
	▪ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	ঃ	৩৬টি
১১.	**মানব সম্পদ উন্নয়ন - সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো**		
	▪ মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী	ঃ	০১টি
	▪ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট	ঃ	০৪টি
	▪ মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ঃ	০৬টি
	▪ চিংড়ির প্রদর্শনী খামার		০৪টি
	▪ চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র		২০টি
১২.	**মৎস্য সেক্টরের অনুমোদিত জনবল**		
	▪ মৎস্য অধিদপ্তর	ঃ	১ম শ্রেণি - ১৬৩৯ জন
		ঃ	২য় শ্রেণি - ৬৬৫ জন
		ঃ	৩য় শ্রেণি - ২১১৮ জন
		ঃ	৪র্থ শ্রেণি - ১৫৩৮ জন
		ঃ	সর্বমোট - ৫৯৬০ জন

সংকলিত : মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব নাসরিন জাহান সহকারী পরিচালক	০১৭৫৩০৮৫২৯৫ nasrinj12@yahoo.com
জনাব মুহাঃ নওশের আলী সহকারী পরিচালক (মৎস্যচাষ)	০১৭১৬৩৩৫০১০ mnali28bcs@yahoo.com adaqua@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জুয়েল শেখ প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) ০১৭১৩৪০৫১৩৫ Jewel_shaik@yahoo.com
জনাব আকলিমা আক্তার সহকারী পরিচালক	০১৬৬৮৫৭৫৬০২৮ lima.bau2007@gmail.com
জনাব ইসফাত আরা মিতু সহকারী পরিচালক	০১৭১৮০৮০৯৩৪ isfataramishu@yahoo.com
জনাব শামীমা আকতার সহকারী পরিচালক	০১৭২৩২২২৮৯৪ shamimapiya79@gmail.com
জনাব ইরিনা মৌসুমী সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৫৪৯০৮৯ irina31th@gmail.com
জনাব মোছাঃ ছালমা আক্তার সহকারী পরিচালক	০১৭১১১৪২০১০ salmafish@gmail.com
জনাব রুবানা ফেরদৌসী সহকারী পরিচালক	০১৭১১২০৯৫২৪ fruhanafbau@yahoo.com
জনাব সালমা নূর-ই-ইসলামী সহকারী পরিচালক	০১৭১৯৩৭৯০২৬ salamanoorbau@gmail.com
জনাব তন্ময় কুমার দাশ সহকারী পরিচালক	০১৭৭৭৯৫৮৪৪০ tanmay_m07@yahoo.com
জনাব তাসলিমা আক্তার সহকারী পরিচালক	০১৭২৩০০৭৪৫৪ rekha.bau2@gmail.com
জনাব মোছাঃ আক্তামুন শিল্লাহ সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৫৮৪৮৬৯ linnasufo@gmail.com
জনাব প্লাবন সরকার মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	০১৯১৭২৮৩৬৬৫ plabon.sarkerbau@gmail.com
জনাব আইরিন সিদ্দীকা সহকারী পরিচালক	০১৭৬৪৯৪৫৮৬৪ siddikairin@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন প্রোগ্রামার	০১৯১৩৮৫৮২৯০ iqbal@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুস ছালাম প্রাং উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৭৬৪৮৩৫২৫২ asalampkdof@gmail.com
জনাব মনোয়ারা বেগম উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৭১২৫১৭৬২২ monowara23@yahoo.com
জনাব এ বি এম শাব্বীর সহকারী প্রধান	০১৭১৭২৩৭৫১৩ shabbirabm@gmail.com
জনাব সরকার তারিকুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭৬৯৪৫৯০৬০ alamst@live.com
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭১২৫২০৭৯৬ aminul0796@gmail.com
জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৩০২৬৮৭৪৮৩ enggshahidul1965@gmail.com
জনাব হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭১২৯২৮৪১৪ eng.helalahmad@yahoo.com
জনাব মোঃ সামসুল আলম সহকারী প্রকৌশলী	০১৭১১১৬৩২৯১ samisamanta1971@yahoo.com
জনাব আবুল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী	০১৭১১১৮৫০৬৩ hossainabul1964@yahoo.com
মোঃ শাহজাহান আলী সহকারী প্রকৌশলী	০১৫৫২৪০০৯৯২ dofshahjahan@gmail.com
জনাব নাজমুন নাহার সহকারী প্রধান (কল্যাণ কর্মকর্তা)	০১৭১১১৭৭৬১৮ nnahar66@gmail.com
জনাব এস এম হাসান আলী সহকারী পরিচালক	০১৯১০৫৩৮০১৯ hasandof@gmail.com
জনাব জিন্নাত জাহান বর্ণালী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৬৪৭৪০৪৩৩ bornali.dof@gmail.com
জনাব ফারহানা জাহান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিজার্ভ)	০১৭৩৮২১১৩১১ evafi77@gmail.com
জনাব উজ্জল কুমার রায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৩১৪৫২৬৫৭ ০১৮৫৭০৬৯৮৯৯ puspauzzal@gmail.com
জনাব ফাতেমা আক্তার পান্না উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৯২৯৭০৩১১ i.m.fatema35@gmail.com
জনাব মার্জিয়া কবীর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৬১০৩৩৭৭০ marzia37.dad@gmail.com
জনাব মোঃ ইউসুফ আলী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭২১৫১২৫৪০ baugousuf@gmail.com
জনাব মোঃ ওয়াহেদ আল মাসুদ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৩৪৩৭৪৯৯১ opu_wahed@yahoo.com
জনাব সুদীপ্ত মিত্র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৩৭০৭৬৫১২ sudipto.i.r.08@gmail.com
জনাব মোঃ নূরুল আকতার বাজেট ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৯১১৩৪২২০৭ mdnurulakter@yahoo.com
জনাব ওয়ারেসা চৌধুরী বাজেট কর্মকর্তা	০১৭১২২২৭১১১ rusha_chowdhury@yahoo.com
জনাব আফসা নূর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৫৫২৫৪৭১৮৭ afshannoordof@gmail.com
জনাব দেবাশীষ দাস ভান্ডার ও সংগ্রহ কর্মকর্তা	০১৯১৩২০০৫১১ ddebashish46@yahoo.com
জনাব মোসাঃ শামসুননাহার গবেষণা কর্মকর্তা	০১৭১৬৪১৬২৯০ snahardof@gmail.com
জনাব মেরিনা পারভীন পরিদর্শক	০১৭১৮২৮১৮৮২ marina.parveen@yahoo.com
জনাব তানিয়া নূর পরিদর্শক	০১৭২২৪৮৩৬৯৮ tania-nita@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ আলমগীর পরিদর্শক	০১৭১৭১৭৯২১০ alamgirfiqc@gmail.com
জনাব নিলুফা সুলতানা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১২৩৮৩০০০ nilufa-s@yahoo.com
জনাব কামরুন্নাহার পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৯৩০২১৭২৬২ 123nayan.kn@gmail.com
জনাব মোছাঃ উম্মে-উন আরিফা সহকারী কার্টোগ্রাফার	০১৭১১৬৬৪৮৯৭ umaunarifa1973@gmail.com
জনাব রাজিয়া সুলতানা গবেষণা কর্মকর্তা	০১৭৮০২৯৭৬১৩ begumrajiasultana@gmail.com

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা www.fisheries.gov.bd	
নাম ও পদবী	**ফোন নম্বর**
জনাব খঃ মাহবুবুল হক মহাপরিচালক	০২২২৩৩৮২৮৬১ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যাক্স) ০১৭১২৫৬৬৯৫৯ ০১৭৬৯৪৫৯০০০ dg@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাফায়েত আলম সহকারী পরিচালক ও স্টাফ অফিসার	০২২২৩৩৮৯৯৩৪ (অ) ০১৭১৮৬৮৭০৬৩, ০১৭৬৯৪৫৯০০১ shafaet.alam@gmail.com
জনাব মোহাঃ আতিয়ার রহমান অতিরিক্ত মহাপরিচালক	০২৪৭৭১১০৪১০ (অ) ০১৭১১৫৭৭৯৮০৬ atiar_dof@yahoo.com
জনাব নারায়ন চন্দ্র দাস পরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৬৭১১৯ (অ) ০১৭০৩৫৬৬৬২৮ narayandasbd1963@gmail.com
জনাব শামীম আরা বেগম পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)	০১৭১২১৭১৭০৮ sumirahman1991@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ)	৯০৬৯৯৪৩ (অ) ০১৭১২২৯৫৩৩৯ piofiqc@fisheries.gov.bd habib.iet94@yahoo.com
জনাব মোঃ আতাউর রহমান খান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ)	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ০১৭১২৮৪১০৯১ mark_196403@yahoo.com
সৈয়দ মোঃ আলমগীর উপপরিচালক (প্রশাসন)	২২৩৩৮৯৩৫৫ ০১৭৩২৫০৬৮৫৮ ddadmin@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া উপপরিচালক (রিজার্ভ)	০১৭১৫৬৬০৩১৯ sakawat1956@gmail.com
জনাব মাসুদা খানম উপপরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস)	০১৭১১৪৫২১৮৪ masuda1966@yahoo.com
ড. মোঃ খালেদ কনক উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)	০২২২৩৩৮১৫৯২ (অ) ০১৭৬৩৫০৭৬৪০ ddaqua@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাহেদ আলী উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	০২২২৩৩৮৯৯৮৮ (অ) ০১৭১২৮০৩০১২ ddfinance@fisheries.gov.bd
জনাব অলক কুমার সাহা উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৬১৭১৫ (অ) ০১৭১১৯৫৫৭৩৮, ০১৭৬৯৪৫৯০২৭ ddshrimp@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯৫৬০৪৫৭ (অ) ০১৭১১১৭১৯৯৯ alimuzzamanc@gmail.com
জনাব প্রীতি কণা পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭১৯৯৮৫৮৭৫ preetum93@yahoo.com
জনাব শিল্পী দে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সমন্বয় শাখা	৯৫৬৯০৪১ (অ) ০১৭১১১৫৬৫২১, ০১৭৬৯৪৫৯০২৫ shilpiplus@yahoo.com
জনাব অজিত কুমার পাল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২২৫৭২০৬ akp589@hotmail.com
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৯১৭৯৯১৮৯৯ faruk.dof@gmail.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭১১০৭১৮৮৮ mukhlesdof@gmail.com
জনাব মাসুদ আরা মমি উপপ্রধান	৯৫১৩৮৫৫ (অ) ০১৭১১১৩৬৮৪৫ masudara_momi@yahoo.co.uk
জনাব সুজিত কুমার চাটার্জী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৬৩৬৭৪ (অ) ০১৭১১১৯৯০১৪ sujit_11ac24@yahoo.com
সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম উপপ্রধান	০১৯৮১২৩২৬৬১ sarkeripon@gmail.com
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১১২০৩৯৬ serajbau@gmail.com
জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৬৭২১৮ (অ) ০১৭১১৪৮৭২৯১ khdmamun_1974@yahool.com
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন উপপ্রধান (সামুদ্রিক)	৯৫৬২৩৩৪ (অ) ০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h1998@yahoo.com
জনাব উম্মে কুলসুম ফেরদৌসী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জলমহাল শাখা	০২২২৩৩৮০৬৫৩ (অ) ০১৭৩৬২৭০২০৮ jalmahaldof@gmail.com
জনাব এলিজ ফারজানা সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সমন্বয় শাখা)	০১৭১৫৩০২৯৩৮ alizefarzana@yahoo.com
ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ শাখা)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ০১৭১৮২৬২৪৯১ maqueshudul_bau@yahoo.com
জনাব শাহলা আকতার সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১৪৫৮০০১ yshila@yahoo.com
জনাব শবনম মোস্তারী সিনিয়র সহকারী পরিচালক	৯৫৫৪৯৬২ (অ) ০১৭১২২৪৬৬৬৪ smjdof@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ আজিবুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭২৭৫৭০২৬০ azibur77@yahoo.com
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৩৬৫০৯২ mijan1976@gmail.com
জনাব মোঃ মাহবুব উল হক সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	০১৭১৪৮৭৩৪৯৭ mahbub_dof@yahoo.com
জনাব শওকত কবির চৌধুরী সহকারী পরিচালক	০১৮১৫৮৪২৯৫০ shouket2014@gmail.com
জনাব সাধন চন্দ্র সরকার সহকারী পরিচালক	০১৭১৮০০৫১৭৫ sarkersc04@gmail.com
জনাব এস এম আবুল বাসার সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	০১৭১৭৭১৫৮২৪ smabulbashar@gmail.com
জনাব মোঃ মাগফুর রহমান সহকারী পরিচালক	০১৯২৪০৯১৩০৬ maghur7@gmail.com
জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান সরকার সহকারী পরিচালক	০১৭১২৮৬৪৬৬১ mksarker@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সহকারী পরিচালক	০১৮১৬৯৪৫৫০৪ pintuzaman08@gmail.com
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০১৯১২৪২০৬৫৫ saifulbau_85@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা	০১৯৩৭৫০৯২৯৫ tajulislam50dof@gmail.com
জনাব আবুল কাশেম মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা	০১৯১২৩৪৬৬৬৭ kashem300667@gmail.com
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ গবেষণা কর্মকর্তা (চ. দা)	০১৯১৫৫৬৩৩১২ mdakalam@gmail.com
জনাব মোঃ তোফায়েল আলম লস্কর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১১২২০২০০ ktofail@gmail.com
জনাব সনজিত বাড়ৈ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১১১৭৩৬৩৭ sanjit_barai@yahoo.com

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	
নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব ড.মোঃ আব্দুল আলীম প্রকল্প পরিচালক, Sustainable Coastal and Marine Fisheries (SCMF) প্রকল্প	০১৭১৮১৫৭৭৫০ pdscmfpdof@fisheries.gov.bd
জনাব বিপ্লব দাস উপপ্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১১২৭৯৬৪৭ biplab022000@yahoo.com
জনাব মনিষ কুমার মণ্ডল উপপ্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১৫৩৪৬৬২৯ monishmdl@yahoo.co.uk
ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম উপপ্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১১২৪১২০৩ azam_dof@yahoo.com
জনাব মোসাম্মত রাশিদা আক্তার সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১৬৩২৭৮২৭ pollyrashida7@gmail.com
জনাব মনিকা দাস সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১৬৬০৩৫২৫ monika_afd@yahoo.com
জনাব তাসলিমা আক্তার সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৬৮৫২৪৫০৪৪ Lima08du@gmail.com
জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৯২৪২২৪৩৪৩ nohar_bau08@yahoo.com
জনাব হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ নির্বাহী প্রকৌশলী, (SCMF) প্রকল্প	০১৭১২৯২৮৪১৪ eng.helalahmad@yahoo.com
জনাব তাপসী মরিয়ম বেগম হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১১১৯১৩৯৫ taposhi24@yahoo.com
জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দিন শেখ প্রকল্প পরিচালক বাঁওড় প্রকল্প বাজার, আরনপুর, যশোর	০১৭৯৫১২৬০৫১ alfaztuhin@gmail.com
জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামান পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	৯৫৬১৬৮৫ ০১৭১৫৩৬৮৪৮৬১ monidof@gmail.com
জনাব মোঃ মহসিন সি. সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭১২২৩৩৪০৭ mdmahoshin@yahoo.com
শেখ মনিরুল ইসলাম সি. সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭১৮৪২১১২৯ sheikh_monir2000@yahoo.com
ড. রাজু আহমেদ সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭৯৫৯৭৯৫২৩ rajuahmeddof@gmail.com
জনাব মোঃ মকছেদুর রহমান সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭৪৮৩৮৫৬৪৭ anik871980@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ড. সুবর্ণা ফেরদৌস সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭১৮১২৪০১০ ferdous3176@gmail.com
ইব্রাহিম হামিদ শাহিন সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭১২৭১১৪৪৪ ibrahambd786@gmail.com
জনাব শিলা রায় সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৯৫৯৭৯৩০৯৬ shilaroy735@yahoo.com
জনাব মোঃ কামরুল হাসান প্রকল্প পরিচালক, রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	০১৫৫৮৩০৮৫৪৮ khmanju_70@yahoo.com
জনাব মোঃ সেলিম আকতার উপ-প্রকল্প পরিচালক রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	০১৯১১৯০৭৬৬৮ akterselim7@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	০১৭১২৫৪৮১৯ eyasinfmc@gmail.com
জনাব মোঃ আবদুল্লা আল হাসান উপপ্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	০১৯১৩৪৪৪০০২ maahasan2021@gmail.com
ড. মোঃ জুবায়দুল আলম প্রকল্প পরিচালক গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প	০১৭১২০১৬৬৩০ jobaidul_dof@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ রাশেদ পারভেজ সহকারী পরিচালক গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প	০১৭২৪৩৪৮৭৯৮ rashed_parvej@yahoo.com
জনাব মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১১৪৬৬১৫২ pdilishproject@gmail.com zhc_farid67@yahoo.com
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান উপ- প্রকল্প পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১১-৭৮৪৮৪০ ০১৭৬৯৪৫৯১০৫ mahbub.swapon@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ চৌধুরী উপ- প্রকল্প পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭৫৪৫৯৫১২১ ০১৭৬৯৪৫৯১০৬ mamunc2010@gmail.com
জনাব মোছাঃ শিরিন শীলা সহকারী প্রকল্প পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১৮৮৫৮৭২১ shirin.dof@gmail.com
জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ সহকারী প্রকল্প পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭২২৩৮৬৬৩০ sultanfbau@gmail.com
জনাব সন্ধ্যা দেবনাথ সহকারী প্রকল্প পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৮৩৬১৬৮২১৭ sdnath_3009@yahoo.com
জনাব মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী সহকারী পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭২২০৩৪৭৯২ raselnotu@gmail.com
জনাব মোঃ রাকিব হাসান সহকারী পরিচালক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১১১২৬৫৯৪ rakibdof@gmail.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব এস এম আশিকুর রহমান প্রকল্প পরিচালক, দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	০১৭১৭৮২২৬১৪ ashiktanu@gmail.com
জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সহকারী প্রকল্প পরিচালক দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	০১৭৮০১৬৮৮৮৫ munirdof1000@gmail.com
জনাব আসলাম হোসেন শেখ মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন কর্মকর্তা দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	০১৭৩৬১১১৫৩৪ aslamdof34@gmail.com
জনাব সমীর কুমার সরকার প্রকল্প পরিচালক কমিউনিটি বেজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ এন্ড একুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট	০১৭১৭৩৪০৪৫০ samir21bau@gmail.com
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রকল্প পরিচালক ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট	০১৭১৫৮৪৫৩২৮ zalom08@yahoo.com
জনাব মোঃ বাবুল হোসেন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট	০১৭৩৫৯৪৬৪৫১ babuldo1991@gmail.com

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	
ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন পরিচালক (সামুদ্রিক)	০৩১-৭২১৭৩১ (অ) ০১৭১১৯৮৫০৭২ shariffuddin_15@yahoo.com
জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯১(অ) ০১৭১৬৫৬৬৭৫২ nazim.iu94@yahoo.com
ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট	০৩১-২৫২৯৮০০(অ) ০১৭১১৯৮৫০৭২ bmfchp@yahoo.com

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	
ড. মোহাঃ সাইনার আলম পরিচালক মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা	০১৭১৬৭৩০৮৮৬ sainardof@yahoo.com
ড.মোঃ মোতালেব হোসেন উপপরিচালক মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা	০১৭১৬৯৯১২১৬ motalebofi@yahoo.com
জনাব মোঃ আসাদুল বাকী অধ্যক্ষ,এফটিআই, চাঁদপুর	০২-৭৭৪৭৫১৮ (অ) ০১৭১১০০২৩২৫ baqui7000@gmail.com
জনাব বিচিত্র কুমার সরকার অধ্যক্ষ, এফটিইসি, ফরিদপুর	০১৭১৭২৩৬১৬৩ bichitrakumarsarker@gmail.com
জনাব মোঃ লুৎফর রহমান অধ্যক্ষ, এফটিইসি, রায়পুর, লক্ষীপুর	০১৭১২৬২৫২৫৩ lutfur20@gmail.com
জনাব মোঃ মুসা কলিমুল্লা খামার ব্যবস্থাপক এফটিইসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৪০২ (অ) ০১৭১৮১৪২১৮৬ musaklmillah65@gmail.com

মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট	
ড. মোঃ মনিরুজ্জামান প্রিন্সিপাল মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, কিশোরগঞ্জ	০৯৪১-৬১০৭০ (অ) ০১৭১৮৪৮৯৬৬৯ drmunir1956@gmail.com
জনাব অনিল কুমার সাহা প্রিন্সিপাল মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৬১০২ (অ) ০১৭১১২৬২১৪১ anilsaha24@yahoo.com
জনাব শাহীনুর রহমান(অ:দা:) প্রিন্সিপাল মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, সিরাজগঞ্জ	০২৪৭-৩১৮১৫৫ (অ) ০১৭১২৭১৩১৬০ fdisirajganj@gmail.com
জনাব মোঃ সাজদার রহমান প্রিন্সিপাল মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, গোপালগঞ্জ	০২৬৬৮১৩৫২০ (অ) ০১৭১৫৩৫১২৬৯ sazderrahmansuf@gmail.com

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ	
ড. মুহঃ নিয়াজউদ্দিন উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), ঢাকা	০২২২৩৩৫২১৫৩ (অ) ০১৭১২০৩৭৭১৮ neaz04dof@gmail.com
জনাব মোঃ আবু ছাইদ উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), খুলনা	০৪১-৭৬০৪৯০ (অ) ০১৭১২৬৬১৬১৬ ddfiqckhulna@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শাহজাদা খসরু উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), চট্টগ্রাম	০৩১৬৮২৬০৩(অ) ০১৭১৮১৭৪১৮০ fiqcctg@fisheries.gov.bd

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ	
জনাব মোঃ মানিক মিয়া কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, ঢাকা	০১৭১২২৬০৩১৯ manikfiqc.gov1@yahoo.com
ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান তালুকদার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, চট্টগ্রাম	০২৪১-৩৮০৩৮৫ (অ) ০১৭১২২০২৪৩৩ qamctg@fisheries.gov.bd
জনাব এস, এম, রেজাউল করিম কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, খুলনা	০৪১-৭৬২৩২৭ (অ) ০১৭১১০০৬৯৫০ rezaul1970@fisheries.gov.bd

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা	
ড. সুরজিত সাহা রায় পরিচালক	৯১১২২৬০ (অ) ০১৭১৯৬৯৩১৮ cio@ais.gov.bd
ড. সুরজিত সাহা রায় প্রধান তথ্য অফিসার	৫৫০২৮৩৭২ (অ) ০১৭১৯৬৯৩১৮ cio@ais.gov.bd

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
কৃষিবিদ মোঃ বেনজির আলম মহাপরিচালক	+৮৮০২৫৫০২৮০৬৯ (অ) ০১৭০০৭১৫০০০ dg@dae.gov.bd
কৃষিবিদ আরিফ মোহাম্মদ মোজাক্কের অতিরিক্ত উপ পরিচালক (পিএস টু ডিজি)	৫৫০২৮৩৬৪ (অ) ০১৭০০৭১৫১০১ arif_moj@gmail.com

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
ডঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা মহাপরিচালক	৯১০১৯৩২ (অ) ০১৭১৫৫০৮১৬৫ dg@dls.gov.bd
ড. মোঃ আবু সুফিয়ান পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০২৮৭৩৬ ০১৭১২০২৪৬৫০ sufian04@gmail.com

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	
ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন মহাপরিচালক	২২৪৪৯১৬৭০৭২

পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
ড. মোঃ কাউসার আহাম্মদ সদস্য (সচিব) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	০১৭১১৯৫১৭১০ member.ged@plancomm.gov.bd
জনাব শরিফা খান সদস্য (সচিব) কৃষি প্রাণিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৯১৮০৭৯৯ (অ) ০১৭১৩০৪৪৩৮৮ member.agri@plancomm.gov.bd

আইএমইডি, শেরে-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান সচিব	৯১৮০৭৬১ (অ) secretary@imed.gov.bd
জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী মহাপরিচালক, সিপিটিইউ	৪৮১১৯৩৯৮ cptudg@cptu.gov.bd
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪)	০১৭৯৮৭৫৩৯৫৬ dgsector4@imed.gov.bd

ইআরডি, শেরে-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন সচিব	৪৮১১৭৬৩৬ secretary@erd.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	
ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার নির্বাহী চেয়ারম্যান	৪৮১১৭৯৩৫ ec-barc@barc.gov.bd
ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৫৮১৫৫০০১ dir-nutrition@barc.gov.bd

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা	
ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স মহাসচিব	৯১১১৪৩২ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	
মোঃ হেমায়েৎ হুসেন চেয়ারম্যান	৫৫০১২৫৪৬
জনাব মনজুর হাসান ভূঁইয়া পরিচালক (অর্থ)	৫৫০১২৫৪৮
জনাব মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ যুগ্ম পরিচালক	৫৫০১২৫৪১

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর মহাপরিচালক	৪৯২৭২০৪০

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. দেবাশীষ সরকার মহাপরিচালক	৪৯২৭০০০০

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ চেয়ারম্যান	২২৩৩৮৪৩৫৮(অ)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা	
জনাব মোঃ শেফাউল করিম উপপরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	৫৫০১২৮০৬
জনাব সাজ্জাদ হোসেন তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৫৫৫০১২৮০৫ ০১৭১৫১৯৪৯৯৮

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ মহাপরিচালক	০৯১-৬৫৮৭৪ (অ) ফ্যাক্স: ০৯১-৬৬৫৫৯ ০১৭১২৫৬৬১৩৪ dgbfri@gmail.com
ড. মোঃ খলিলুর রহমান পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)	৮৮০৯১৬২৭১০ ০১৭১১৭২৬০৯৩ krahman2863@yahoo.com
ড. মোঃ আনিসুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০১৭১১৪৫৮৫২০ anisur2002@yahoo.com
ড. ডুরিন আখতার জাহান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	০৯১৫১২২১(অ) ০১৭১২-৬১১১৮৫ durin_bfri@yahoo.com
ড. খোন্দকার রশীদুল হাসান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০৭ (অ) ০১৭১৪-৩৩৭৫০২ rashidulbfri@yahoo.com
ড. মোঃ হারুনর রশিদ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট	০৪৬৮-৬২২৯১(অ) ০১৭১১০০৩৩৬৮ harunur_rashid21@yahoo.com
ড. শফিকুর রহমান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৮৫৫ (অ) ০১৮২০-৫৭৬০৬৭ shafiqbfri@yahoo.com
ড. মোঃ লতিফুল ইসলাম সিএসও, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা	০৪০২৭-৫৬০৩০ (অ) ০১৭১৫৬৪৫২৬০ latiful.bfri@gmail.com
ড. মোঃ রবিউল আউয়াল হোসেইন এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২১৫৯ (অ) ০১৭১২৫৬৯৯২৯ awalbfri@yahoo.com
মোঃ আশরাফুল হক এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১-৬৮৯৮২ (অ) ০১৭১২-৭৮১৩৫৭ ashraf.bfri@gmail.com
ড. ডেভিড রিন্টু দাস এসএসও, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া	০৭৪১-৫৫৩১২(অ) ০১৭১১-৪২২১১৭ drd4272@yahoo.com

ড. আজহার আলী পিএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৪(অ) ০১৭০৭০৭৭১৩৬ azhar1983bfri@yahoo.com
জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম পিএসও, নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী	০৪৪২৫-৫৬০০২(অ) ০১৭১৬-৫৮১৫৩২ amirulbfribs@yahoo.com

মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৪০১০৬ ফ্যাক্স: ৬১৫১০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২৪২৬০ ফ্যাক্স: ৭৩১২৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯৬৬১৯০০-১৯ ফ্যাক্স: ৯৬৬৭২২২
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৫০২৪৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১৪৯৪৯
মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৩৪৩৭৫
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৫৪২৯
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১-৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭৯১০৪৫-৫১
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	০৮২১-৭৬০৯৩০
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৪৪২৭-৫৬০১৪
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিসারিজ বিশ্ববিদ্যালয়, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১ (অধ্যক্ষ)
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর	০৪২১-৬২০২০

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
অ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	৯৫৬২৮৬৮ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	৭৭৪৫০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (সি. জেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	০৮১-৬৩৬০০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, ঢাকা	৮৩১৬৮৮২: ৮৩১৭৫৩১
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, খুলনা অঞ্চল	০৪১-৮১৩২৯২ (অ) ০৪১-৮১১৯২৫ (ফ্যা)
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, চট্টগ্রাম অঞ্চল	০৩১-৭২৪৯৪৫ (অ) ০৩১-২৫১১৮৮৭ (ফ্যা)
বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন, ঢাকা	৮৪১৭৭৩১ (অ) ৮৪১২৭০৯ (ফ্যা)
প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার এলায়েন্স	৮৩৯১৫৯৪ (অ)
সমন্বয়ক ফিসারিজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল	৯৫১৪৪৩৪ (অ)

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	৮১৫৯০০১
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৮১৫৬০০০-৮
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফএও	৮১১৮০১৫-৮
ইউএনডিপি	৮১৫০০৮৮
ওয়ার্ল্ডফিস	৮৮১১১৫১
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আইইউসিএন	৯৮৯০৪২৩
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আইএমএফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৮৮৫২২৬৬
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮
জিআইজেড	৯৬৬৬৭০১০০০

ঢাকা বিভাগ	
জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান উপপরিচালক	৮৯৯১৩২৭ ০১৭১২৫৭০৬৬২ ০১৭৬৯৪৫৯১৫০ dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৫২১৩৭৫ mdhjamil@gmail.com
জনাব শহিদুল ইসলাম ভুঞা সহকারী পরিচালক	৯৫১১১৫০(অ) ০১৭৬৯৪৫৯১৫২ tirmijstt@gmail.com

ঢাকা জেলা	
জনাব বি.এম.মোস্তফা কামাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৮৯৯১১৬০ (অ) ০১৮১৬০২০৬৪১ dfodhaka@fisheries.gov.bd
জনাব আয়েশা সিদ্দিকা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৬৫৬১২৯৮ asiddiqa16@gmail.com

মানিকগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ সাইফুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৭১০৩৯১(অ) ০১৭৬৯৪৫৯১৬৮ sayfurdof@gmail.com

মুন্সিগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শামসুল করিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬১১৫৩১ (অ) ০১৭১৬৫৩৫৫০৫ dfomunshiganj@fisheries.gov.bd

গাজীপুর জেলা	
ড.কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯২৬১২৮৩ (অ) ০১৭১২৬২০৮৯০ dfo.gazipur@fisheries.gov.bd

নরসিংদী জেলা	
জনাব মোঃ বেলাল হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯৪৬২৪১০ (অ) ০১৭১৫৬০৫০৩৫ dfo.narsingdi@fisheries.gov.bd

নারায়ণগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ আয়নাল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৭৬৩০৬২৫ (অ) ০১৩০৩১৭৭২৪৫ dfonarayanganj@fisheries.gov.bd

ফরিদপুর জেলা	
জনাব প্রশান্ত কুমার সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৩১-৬৩২২৩ (অ) ০১৭১২৭৩২১৮৩ dfofaridpur@fisheries.gov.bd
জনাব বিজন কুমার নন্দী সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৪৩০৩৯০৯ bijannandi9@gmail.com

রাজবাড়ী জেলা	
জনাব মোঃ মশিউর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৪১-৬৫৫৮৩ (অ) ০১৭১২৭৩৯০২৩ dforajbari@fisheries.gov.bd

মাদারীপুর জেলা	
জনাব বাবুল কৃষ্ণ ওঝা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৬১-৬১৪৪২ (অ) ০১৭১২৬৩৩৩৭৫ dfomadarpur@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৮৪১৩৫০০০ nosegayanis@gmail.com

গোপালগঞ্জ জেলা	
জনাব বিশ্বজিৎ বৈরাগী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৬৬৮৫৪৫৪ (অ) ০১৭১১০৬৮০৬৯ dfogopalgonj@fisheries.gov.bd
জনাব এ.টি.এম তৌফিক মাহমুদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৫৮৩২০৯ toufiq.mahmud@yahoo.com

শরীয়তপুর জেলা	
জনাব প্রনব কুমার কর্মকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬০১-৬১৬৫৬ (অ) ০১৭১১০৬২৫৭৭ dfoshariatpur@fisheries.gov.bd

কিশোরগঞ্জ জেলা	
জনাব রিপন কুমার পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৪১-৬১৯২৭ (অ) ০১৭১২২১৭৯৮৪ dfokishorgonj@fisheries.gov.bd
জনাব নাসিস সুলতানা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৫৮০৩৬০৯৪ mahfuzalhamid@gmail.com

টাঙ্গাইল জেলা	
জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯২১-৬৩৬৭৮ (অ) ০১৭১৬২৫৫১৪৮ dfotangail@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাশেদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭০৫৪৮৫০৮৭ rashedufo2006@gmail.com

ময়মনসিংহ বিভাগ	
ড. মোঃ আফতাব হোসেন উপপরিচালক	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) ০৯১৬৬৭৪৮ ddmymensingh@fisheries.gov.bd
জনাব মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন কবির সহকারী পরিচালক	০১৮৮৬৩৭৮১৬৭ kabirdof2006@gmail.com

ময়মনসিংহ জেলা	
জনাব দিলীপ কুমার সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) ০১৭১২২৪৩১৯১ dfomymensingh@fisheries.gov.bd
ড.ফজলুল কাবীর সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৬৮৮২৪২৭ fazlulkabeer@gmail.com

নেত্রকোণা জেলা	
জনাব মোহাম্মদ শাহজান কবীর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৫১-৬১৪০৪ (অ) ০১৭১২০৪৩২৭৩ dfonetrokona@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২২২১৬০৯ tuborna@gmail.com

জামালপুর জেলা	
জনাব এস এম খালেকুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৮১-৬৩৬২০ (অ) ০১৭৭৯৫৭২৮৮৭ dfojamalpur@fisheries.gov.bd
জনাব মিজানুর রহমান সহকারী পরিচালক	০১৭১৮১৬৯৫৯৭ mizan.baufs@gmail.com

শেরপুর জেলা	
জনাব মোঃ আমিনুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১-৬১৪৪৭ (অ) ০১৭১২৮২৮৬৫০ dfosherpur@fisheries.gov.bd
জনাব সুলতানা লায়লা তাসনীম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৪৮৬০৪৮৫ sultana.sufo@gmail.com

খুলনা বিভাগ	
জনাব মোঃ তোফাজউদ্দিন আহমেদ উপপরিচালক	০৪১-৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১-৭৬৩৩৪৫ (ফ্যা) ০১৯৮৮১১০২৪২ ddkhulna@fisheries.gov.bd
জনাব জি এম সেলিম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২১৯৯২১৫ salimfi@gmail.com
জনাব রাজ কুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক	০৪১৭৬১০১৯(অ) ০১৭৪০৫৭৮১০২ adkhulna21@gmail.com

খুলনা জেলা	
জনাব জয়দেব পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১-৭৬৩০১৬ (অ) ০৪১-৭৬১৬৭৬ (ফ্যা) ০১৭২৭৪২৯৩৫৪ dfokhulna@fisheries.gov.bd

সাতক্ষীরা জেলা	
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১-৬৩৩১৮ (অ) ০১৭১৬১১৩৬৭৩ dfosatkhira@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ হাদিউজ্জামান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ hadi06dof@gmail.com

বাগেরহাট জেলা	
জনাব এ এস এম রাসেল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৮-৬২৪৪৫ (অ) ০১৭১২৫১৫৭৬১ dfobagerhat@fisheries.gov.bd

যশোর জেলা	
জনাব ফিরোজ আহাম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১-৬৫৭৫২ (অ) ০৪২১-৬০৭৫১(ফ্যা) ০১৭১১৪১৮৫১৫ dfojessore@fisheries.gov.bd

ঝিনাইদহ জেলা	
জনাব মোঃ ফরহাদুর রেজা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১-৬২৮৫৭ (অ) ০১৯১৫০৬৮৩৮৭০ ০৪৫১-৬২৯৫৭(ফ্যা) dfojhenaidah@fisheries.gov.bd 98forhad.dof@gmail.com

নড়াইল জেলা	
জনাব এইচ. এম. বদরুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১-৬২০৩৩ (অ) ০১৭১২০০২৫৬৩ dfonarail@fisheries.gov.bd
জনাব হোসনে আরা হ্যাপি সহকারী পরিচালক	০১৭১২৮৯৫৪৪৬ happy.dof1974@gmail.com

মাগুরা জেলা	
জনাব মোঃ আনোয়ার কবীর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮-৬২৩৪১ (অ) ০১৭১২৬১২৭২৪ dfomagura@fisheries.gov.bd

কুষ্টিয়া জেলা	
জনাব নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১-৬২১৮৯ (অ) ০১৭১২২৭৮৭৩৮ dfokushtia@fisheries.gov.bd

মেহেরপুর জেলা	
জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১-৬২০৪৩ (অ) ০১৭১২০৫৫৫৮৩ dfomeherpur@fisheries.gov.bd

চুয়াডাঙ্গা জেলা	
জনাব দীপক কুমার পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১-৬২৩৮৮ (অ) ০১৯৮৪৬৭৯৭০৬ dfochuadanga@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৯১৭৭১৮৩৩৯ robiuldof@gmail.com

রাজশাহী বিভাগ	
জনাব মোঃ আব্দুর রউফ উপপরিচালক	০৭২১-৭৬০১৮৪ (অ) ০১৭১২২০৪৭৬৪ ddrajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৪৭৮৮৬০২০২ (অ) ০১৭১১১২৪৫০১ mozammeldof@gmail.com
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০২৪৭৮৮৬০২০২ (অ) ০১৭১২২৭৮৩০১ maislam.bau81@gmail.com

রাজশাহী জেলা	
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১-৭৬০২৪৫ (অ) ০১৭১২৮৭৯০০০ dforajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ মন্ডল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৮২৮৬৩৬ maislam.bau81@gmail.com

নাটোর জেলা	
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১-৬২৫৮০ (অ) ০১৭১১১৫১৮৭৯ dfonatore@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৬৩৫৮১৩৩

নওগাঁ জেলা	
ড. মোঃ আমিমুল এহসান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১-৬২৫৬৫ (অ) ০১৭১২২৫০১২২ dfonaogaon@fisheries.gov.bd
জনাব ফারহানা তাসলিমা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৬৩৫২১৩৪ farhanadof@gmail.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১-৫২৪৮২ (অ) ০১৭১১৯৬৮৬৭৮ dfonawabganj@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১০৮৩৯৯৭১ azaddof@gmail.com

পাবনা জেলা	
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০১৭১৮০১৭৪৭২ dfo.pabna@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ওমর আলী সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৪৬০২৩৪৬ omardof06@gmail.com

সিরাজগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১-৬২১৩৭ (অ) ০৭৫১-৬২০০৫ (ফ্যা) ০১৭৬৯৪৫৯৭০০ dfosirajganj@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আলমগীর কবির সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১৯৩০৯৭২ makabir23@yahoo.com

জয়পুরহাট জেলা	
জনাব সরদার মহীউদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১-৬২২২৪ (অ) ০১৭১২৬৯৪১৭৩ dfojaipurhat@fisheries.gov.bd

বগুড়া জেলা	
জনাব সরকার আনোয়ারুল কবীর আহম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১-৬০৫৭০ (অ) ০১৭১২৫০২২১৩ dfobogra@fisheries.gov.bd

রংপুর বিভাগ	
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম উপপরিচালক	০১৭১১৪৫২৬৬৩ ddrangpur@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০১৭২২৬৭৭১১৮ adrangpur2018@gmail.com

রংপুর জেলা	
জনাব বদরুজ্জামান মানিক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১-৬২৯২৯ (অ) ০১৭১২০৩১৯১০ dforangpur@fisheries.gov.bd

কুড়িগ্রাম জেলা	
জনাব কালিপদ রায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৮১-৬১৫০১ (অ) ০৫৮১-৬১০২৪ (ফ্যা) ০১৭১৭৮৪৯৭০৯ dfo.kurigram@fisheries.gov.bd

নীলফামারী জেলা	
জনাব বরুন চন্দ্র বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১-৬১৫৭০ (অ) ০১৭১৫৫৭৬৮৯১ dfonilphamari@fisheries.gov.bd

ঠাকুরগাঁও জেলা	
জনাব মোঃ খলিদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১-৫৩৪৬৩ (অ) ০১৭৮৬২৬৯৫৯ dfothakurgaon@fisheries.gov.bd

দিনাজপুর জেলা	
জনাব মোঃ মুক্তাদির খান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১-৬৪৪৮৬ (অ) ০১৭৪১৭২৩২৩৩ dfodinajpur@fisheries.gov.bd

লালমনিরহাট জেলা	
জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১-৬১৩৪৬ (অ) ০১৭২২০৯৪৮২ ০৫৯১-৬১১৩৭(বা) dfo.lalmonirhat@fisheries.gov.bd

গাইবান্ধা জেলা	
জনাব মোঃ ফয়সাল আযম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১-৫১৬৪৩ (অ) ০১৭১০৮৭৭৫৯১ dfogaibandha@fisheries.gov.bd

পঞ্চগড় জেলা	
জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ সিরাজী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৮৮-৬১৩৬৯ (অ) ০১৭১৮২৭৯৬৫৭ dfopanchagarh@fisheries.gov.bd

চট্টগ্রাম বিভাগ	
জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৬১-৭৬১২৭ (অ) ০১৭২৭-১৫৫৯৬১ ddchittagong@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবু সাইদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৬১-৭৬৫১১ (অ) ০১৯৪৩-৫৮১৭৮৬ sayedabubakder1971@gmail.com

চট্টগ্রাম জেলা	
জনাব ফারহানা পারভীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) ০১৮১৯৮৭৩২২৬ dfochittagong@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান মজুমদার সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২১৪৪৯৯২ wahid1981bd@gmail.com

কক্সবাজার জেলা	
জনাব মোঃ বদরুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৫২৬৮ (অ) ০১৭১২৯৯২৭৮ dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd

ফেনী জেলা	
জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১-৭৪০৪৬ (অ) ০৩৩১-৬১২৮৭ (বা) ০১৮১৮৮৬৩৩৮ dfo.feni@fisheries.gov.bd

চাঁদপুর জেলা	
জনাব মোঃ গোলাম মেহেদী হাসান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১-৬৩১৬৫ (অ) ০১৭১৬১০৩৭৮৬ dfochad@fisheries.gov.bd

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	
জনাব তাজমহল বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৫১-৫৮৫০১ (অ) ০৮৫১-৫৯৭৮৫ (বা) ০১৯১৭৬৭৭৪১৯ dfo.brahmanbaria@fisheries.gov.bd

কুমিল্লা জেলা	
জনাব শরীফ উদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৮১৩ (অ) ০১৭১৬৪৮২১৪৮ dfocomilla@fisheries.gov.bd

রাঙ্গামাটি জেলা	
জনাব শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৫১-৬২৩২৭(অ) ০৩৫১-৬১৩৩৪ (ফ্যা) ০১৭২০৪২৫৭০ dfo.rangamati@fisheries.gov.bd

বান্দরবান জেলা	
জনাব অভিজিৎ শীল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ) ০১৭১৪৩৩৫৮২ dfobandarban@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রহমান উপসহকারী পরিচালক	০১৯৭৬৪০৩০৮৫ mamunbd22@gmail.com

খাগড়াছড়ি জেলা	
জনাব ড. মঈন উদ্দিন আহমদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১-৬১৭২৬ (অ) ০১৫৪৩১৩১৭৫ dfokhagrachari@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১৫১৯৭২ akazad393@gmail.com

লক্ষ্মীপুর জেলা	
জনাব আমিনুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৮১-৬১৪৬৫ (অ) ০১৭১০৪৬৮-৬৪৭ dfolakshmipur@fisheries.gov.bd

নোয়াখালী জেলা	
জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩২১-৬১৬৮১ (অ) ০১৮১৮২৯৬৮৪ dfonoakhali@fisheries.gov.bd

সিলেট বিভাগ	
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন উপপরিচালক	০৮২১-৭২৬১৩০ (অ) ০১৭১২৯১২৩৮৭ ddsylhet@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আহসান হাসিব খান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৮২১-৭২৩২৫৭ (অ) ০১৯৩৭৭৭৩৩০ sadsylhetdiv@fisheries.gov.bd
জনাব আল মিনার নূর সহকারী পরিচালক	০১৭১৬১৫১২৪৯ minarnoor80@gmail.com

সিলেট জেলা	
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১-৭১৬২৪১ (অ) ০১৭১২৫৭৮৬৪৪ dfo.sylhet@fisheries.gov.bd

সুনামগঞ্জ জেলা	
জনাব সুনীল মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১-৬১৪৯৭ (অ) ০১৭১২২০৪৭১৯ dfosunamganj@fisheries.gov.bd

হবিগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১-৬৩৩৫০ (অ) ০১৭১৫ ৬১৫ ৩৯৮ dfohabiganj@fisheries.gov.bd

মৌলভীবাজার জেলা	
জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৯১৩(অ) ০১৯২০০৩৪৭৭৪ dfomoulvibazar@fisheries.gov.bd

বরিশাল বিভাগ	
জনাব আনিছুর রহমান তালুকদার উপপরিচালক	০৪৩১-৬৪৮২৭ (অ) ০১৯৭০৪০০২০৩ ০৪৩১-২১৭৫২৭৭ (ফ্যা) ddbarishal@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন সহকারী পরিচালক	০১৭১৩০৫৮০৬৭৬ [illegible]@gmail.com

বরিশাল জেলা	
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১-৬৪০১৮ (অ) ০১৯৪৩৫৮১৭৮৬ dfobarisal@fisheries.gov.bd
জনাব নির্ঝর অজুরা উপ- সহকারীপরিচালক	০১৭৪৯৩৭০৩৬৮ [illegible]@gmail.com
জনাব বিমল চন্দ্র দাস মৎস্য কর্মকর্তা (হিলসা)	০১৭১১৭১১৭৬৯ bimal.das1749@gmail.com

ভোলা জেলা	
জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১-৬২৪০৭ (অ) ০১৭২১৩৩০০৩০ dfobhola@fisheries.gov.bd

ঝালকাঠী জেলা	
জনাব রিপন কান্তি ঘোষ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮-৬৩২৫৮ (অ) ০১৭১৭৪৮৮৩৭৮ dfojhalakati@fisheries.gov.bd

বরগুনা জেলা	
জনাব বিশ্বজিৎ কুমার দেব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪৮-৬২৩৯৬ (অ) ০১৭৭৭৪০৩৩২৩ dfobarguna@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সহকারী পরিচালক	০১৭১১১৭৭৫১৭ [illegible]@gmail.com

পটুয়াখালী জেলা	
জনাব এস এম আজহারুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১-৬২৫০১ (অ) ০১৭১৬৯৩৭৬৯২ dfopatuakhali@fisheries.gov.bd

পিরোজপুর জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল বারী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১-৬২২৯৭ (অ) ০১৭১৬৭০৪৯১৪ dfopirojpur@fisheries.gov.bd

ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিস	
জনাব হারুন-অর-রশিদ ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বিমানবন্দর থানা, ঢাকা	০১৭১৬-৮৭৮৬৪৯, ০১৭৬৯-৪৫৯২৭৯ (অ) fqodhakaairport@fisheries.gov.bd
জনাব ছাবরা নাহিন ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম	০১৭১৯-৩৪০৬৭৯ ০১৭৬৯-৪৫৯৪০১ (অ) fqoseaportctg@gmail.com
জনাব আল-মামুন ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম	০১৭৬৪-১১৮০০০ ০১৭৬৯-৪৫৯৪৫০ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব রওনক জাহান ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার (অ.দা.) আখাউড়া স্থলবন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭৩৭-২৪৫৫৮৩ ০১৭৬৯-৪৫৯৪৫২ (অ) rownokj@gmail.com
জনাব রওনক জাহান ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার (অ.দা.) কসবা স্থলবন্দর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭৩৭-২৪৫৫৮৩ ০১৭৬৯-৪৫৯৪৫৩ (অ) rownokj@gmail.com
জনাব দেলোয়ার হোসেন ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার (অ.দা.) টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার	০১৮১৯-৯৪৫৭৮৫ ০১৭৬৯-৪৫৯৪৫৪ (অ) delwar.hossen@gmail.com
জনাব ফিরোজ বখত ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার (অ.দা.) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট	০১৭২২-১০৫৯৪৪ ০১৭৬৯-৪৫৯৮৬১ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব মোঃ হাসিবুল হাসান ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার (অ.দা.) সুতারকান্দি স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট	০১৭৪৫-৬৫০১৮৬ ০১৭৬৯-৪৫৯৮৬৩ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব মোঃ ওয়ালী উল্লাহ সরকার ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার তামাবিল স্থলবন্দর, গোয়াইনঘাট, সিলেট	০১৯১৩-৭৫৯০৪৯ ০১৭৬৯-৪৫৯৮৬২ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব ড. মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার সোনা মসজিদ স্থলবন্দর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১৭১৭-৬৭০৪১৪ ০১৭৬৯-৪৫৯৭৫৭ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার হিলি স্থলবন্দর, হাকিমপুর, দিনাজপুর	০১৭১৬-৩০৩৬৪২ ০১৭৬৯-৪৫৯৮৩৩ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব মীর মোঃ আসাদুল্লাহ ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার (অ.দা.) বুড়িমারী স্থলবন্দর, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	০১৭১৮-০৫৩২৭০ ০১৭৬৯-৪৫৯৮৬২ (অ) [illegible]@yahoo.com
জনাব আংগুরী বেগম ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার চিলাহাটি স্থলবন্দর, চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী	০১৭২১-৭১৪৭৫৮ ০১৭৬৯-৪৫৯৮৫৪ (অ) [illegible]@yahoo.com
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, শার্শা, যশোর	০১৭১২-১৯২৭৮০ ০১৭৬৯-৪৫৯০৫৮ (অ) mamunbin2008@gmail.com
জনাব শাহী ইমরান হোসেন ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	০১৭১২-১০১০২১ ০১৭৬৯-৪৫৯০৪৬ (অ) [illegible]@fisheries.gov.bd
জনাব এ বি এম জাকারিয়া ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার মংলা সমুদ্রবন্দর, মংলা, বাগেরহাট	০১৭১৭-০৪৬৯৩৬ ০১৭৬৯-৪৫৯০৪৭ (অ) fqomonglaseaport@fisheries.gov.bd
জনাব খালেকুজ্জামান সরকার ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার নাকুগাঁও স্থলবন্দর, নালিতাবাড়ী, শেরপুর	০১৭১২-৮১৪৬৬১ ০১৭৬৯-৪৫৯৪৫৩ (অ) [illegible]@yahoo.com

সংকলনে
শিলা রায়
সহকারী পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

USAID Disclaimer: "This publication is made through support provided by the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."

www.fisheries.gov.bd